অধ্যায় - ০৫

মনসামঙ্গল কাব্যে নারী চরিত্রগুলির অবস্থান বিশ্লেষণ

ক) মুখ্য নারী চরিত্র

মনসা : বাংলার ঘরোয়া কাব্য মনসামঙ্গল। বাংলা সাহিত্যের যতগুলো কাব্য শাখা রয়েছে তার মধ্যে মনসামঙ্গল চিরায়ত কাব্য-কাহিনি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এ কাব্যখানি বাংলার সোঁদা মাটির গন্ধে ভরপুর। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে বাংলা-সমাজের খেটে খাওয়া মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, লৌকিক-অলৌকিক কাহিনির সংমিশ্রণ প্রতিফলিত। মঙ্গলকাব্যের পাতায় পাতায় নারীর ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে। কিন্তু এও ঠিক প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে তার সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের পথ অন্তরায় হয়ে উঠেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ছয়শত বছর ধরে বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যগুলির ধারা প্রবাহিত। পৌরাণিক মাহাত্ম্য প্রচার এ কাব্যের আপাত উদ্দেশ্য। কিন্তু-

> ''মনে রাখা দরকার মধ্যযুগের কাব্য, অর্থাৎ আধুনিক 'নবজাগরণের' পূর্বে, অন্যান্য ভাষার কাব্য-সাহিত্যের মত বাংলা কাব্যও ছিল ধর্মাশ্রয়ী, বা ধর্ম-কেন্দ্রিক। কিন্তু ধর্মীয় আবরণের বা রূপকের মাধ্যমে বাস্তব সমাজের রক্তমাংসের মানুষের সুখ-দুঃখ, ধ্যান-ধারণা প্রতিফলিত হতে থাকে। মানুষের মনে ঈশ্বর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র চিন্তভাবনা, চেতনা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে থাকে। তাই পৌরাণিক বা সাবেকী ধ্যান-ধারণাও মূলতঃ একই মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যেও পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীর ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ লক্ষ্য করা যায়। পারিপার্শ্বিক বেড়াজাল আঘাত করতে থাকে। যদিও সে আঘাত সাধারণতঃ অন্ধ আবেগ-সঞ্জাত, কোন স্পষ্ট সামাজিক লক্ষ্য তার সামনে নেই।''[১]

গ্রাম্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য উপলক্ষ্যে প্রাচীন কাব্য-কাহিনি ও রূপকথা একত্রে মিলিত হয়ে যে কাব্য-ফসল ফলে উঠেছে তাকে ঐতিহাসিকেরা ব্রতগীত-পঞ্চালী বলে থাকেন। তিন দেবতাকে নিয়ে এই কাব্যগুলি লেখা হয়েছে, মনসাকে নিয়ে মনসা-মঙ্গল, চণ্ডীকে নিয়ে চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মকে নিয়ে ধর্মমঙ্গল।[২] আবার শিবকে নিয়ে শিবায়ন বা অন্নপূর্ণাকে নিয়ে অন্নদামঙ্গল, ইত্যাদি। বাংলা তথা বাংলাদেশে মনসা কাব্যের কেন উৎপত্তি হয়েছে তার সুন্দর বর্ণনা পেয়ে যাই ড. শহীদুল্লাহের মতানুসরণ করলে-

> ''আদিম মানুষ নিত্য চোখের সামনে দেখিত, কত সুস্থ বলিষ্ঠ লোক যমদূতের ন্যায় সাপের করাল দংশনে অকালে ধরাধাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। বাপ-মায়ের শত মমতা, সতীর সহস্র ভালবাসা, চিকিৎসকের অজস্র চেষ্টা তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তখন সে বড় নিঃসহায়

> হইয়া নিষ্ঠুর দৈবকে প্রসন্ন করিতে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সাপের দেবী মনসার পূজার আরম্ভ। সংস্কৃত সাহিত্যে পদ্মা কমলা লক্ষ্মীর প্রতিশব্দ। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় পদ্মা হইতেছেন মনসার নামান্তর। প্রায়ই পূর্ববঙ্গের কবিরা তাঁহাদের কাব্যকে মনসামঙ্গল না বলিয়া পদ্মা পুরাণ বলিয়াছেন। খুব সম্ভব প্রাচীনকালে পূর্ববঙ্গে সাপের দেবীকে পদ্মা নদীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হইয়াছিল।''[৩]

মনসামঙ্গলের কাহিনিটি আমাদের বাঙালি ঘরের বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এখানে দেবতা ও মানুষের বৃত্তান্তের আড়ালে রয়েছে নারী স্বাধীনতা-স্বাধিকারের চুল-চেরা বিশ্লেষণ। আবার রয়েছে স্নেহ-বাৎসল্যের করুণ-বিবরণ। এখানে দুই বিবাদমান চাঁদ ও মনসা। চাঁদ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কর্ণধার আর মনসা দেবাদিদেব মহাদেবের কন্যা হলেও অপাংক্তেয় সর্বহারা নারী সমাজের প্রতিনিধি। এখানে রয়েছে দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব, হিংসা-প্রতিহিংসা, ঈর্ষা-চক্রান্তের জ্বালাময়ী বিবরণ। এ কাব্য-কাহিনি মনে হয় একটি পরিবারাশ্রিত কাহিনি। কারণ চাঁদ শিবের ভক্ত, মনসা দেবাদিদেব মহাদেবেরই আত্মজা, আর দেবী চণ্ডী তো শিবের ঘরণী। চাঁদের ঘরণী সনকা তিনি মনসার পূজারিণী। স্বামী সামন্ততান্ত্রিক সমাজ প্রতিনিধি চাঁদের সঙ্গে মনসার বিরোধের ফলে সনকার পুত্রবিনাশ। আবার এই মনসার আশীর্বাদে সনকার পুত্রলাভ। সনকা-চাঁদের পুত্রবধূ বেহুলা এসে স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছে। তাই তো দেখি রূপে-গুণে-নৃত্য-গীতে পারদর্শিনী বেহুলাকে কাব্যমধ্যে হাজির করেছেন মঙ্গলকাব্যের কবিগণ। যার ফলে আমরা দেখি বেহুলার নৃত্যগীতে মহাদেব-তুষ্টির ফলে মহাদেবেরই আদেশে মনসার আশীষে মৃত স্বামীসহ ছয়-ভাসুরের প্রাণ এবং শ্বশুরের হারানো সম্পদ ফিরে পেয়েছে। চাঁদ সদাগরের ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক মনসার পূজার মাধ্যমে এ কাহিনির সমাপ্তি এবং দুই বিবাদমান শক্তির মীমাংসা। তাই বলা ভালো-

> ''মুখ্যত শিবপরিবারকে কেন্দ্র করে বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের টানাপোড়েন-চিত্রই মনসামঙ্গল কাব্যের বর্ণিত বিষয়।''[৪]

মনসামঙ্গলের কাহিনির লোকপ্রিয়তা বাংলাদেশে সর্বাধিক। সনকার মাতৃত্ব, বেহুলার সতীত্ব, চাঁদ সদাগরের পৌরুষ, সনকা-বেহুলা-চাঁদের সকরুণ রসের প্রস্রবণ গিরি এবং অলৌকিক কাহিনির সঙ্গে ঐশী শক্তির অন্তরালে বাঙালির চিরন্তন বেদনার মূল খুঁজে পাওয়া যায় এ কাহিনিতে। তাই মনসামঙ্গলের কাহিনি বাঙালির নিকট আত্মার-আত্মীয় এবং আজও আকর্ষণীয়। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এখানে সর্পভয়ে ভীত বাঙালি। তাই সর্পদংশনের ভয়ে ভীত বাঙালি রক্ষাকবচ হিসেবে মনসামঙ্গল কাহিনিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে, করছে এবং করবে। বাঙালির মানস সরোবর থেকে এই গ্রাম্য সাহিত্য ধারার উদ্ভব।

> ‘‘রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ নিরপেক্ষ একটি স্বাধীন লৌকিক কাহিনী। মনসামঙ্গলই ইহার মূল উৎস। ভাস্কর্যে মনসামুর্ত্তি ক্ষোদিত হইবার পূর্ব হইতেই মনসার এই লৌকিক কাহিনী সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।’’[৫]

মনসামঙ্গলের কোন কবি রাজসভাশ্রিত নন। এ কাব্যের কবিরা জনসাধারণের কবি। এ কাব্য জনসাধারণের কাব্য। জনসাধারণের কথাকে মাথায় রেখে এ কাব্যের কবিরা কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন।

> ‘‘মনসাকে কেন্দ্র করিয়া সর্পপূজক ‘কাল্ট’ বা উপধর্ম বাংলাদেশে হাজার খানেক বৎসর জাঁকাইয়া বসিয়াছে। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ- বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেই মনসামঙ্গল কাব্য প্রচারিত হইয়াছে, মনসাপূজক সম্প্রদায় গোটা বাংলাদেশেই ছড়াইয়া আছে। সুতরাং মনসামঙ্গল কাব্যকেই বাংলার জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে।’’[৬]

মনসা উৎপাদিকার শক্তি হিসেবেও বাংলাদেশে আজও প্রচলিত। আজও বাংলার মায়েরা বিশ্বাস করেন যে, সাপের স্বপ্ন দেখলে বংশ বৃদ্ধি হয়। বিপ্রদাস পিপলাই তাঁর কাব্যমধ্যে বলেছেন মনসা দেবীর পূজা করলে ‘অপুত্রার পুত্র হয়’। যদি কোন নারী বা পুরুষ নিঃসন্তান হন তবে সেই নারী বা পুরুষ যদি মনসা পূজা করেন, তাহলে সেই পুরুষ বা নারী সন্তান লাভে সমর্থ হন বলে প্রায় প্রত্যেক কবি তাঁদের কাব্য মধ্যে এই বর্ণনা দিয়েছেন।

> ‘‘পশ্চিম বাংলার মালদা, হুগলী, বীরভূম প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় এবং আসামে মনসাকে সন্তানলাভের জন্য পূজা করা হয়।’’[৭]

কিন্তু শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলা বা আসামের মধ্যেই এই রীতি সীমবদ্ধ নয়। এমনকি পশ্চিম বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলার এবং বাংলাদেশের লোকাচারের মধ্যে মনসাকে উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে সেকালে কেন একালেও পূজা করা হয়। উড়িষ্যা বা ত্রিপুরাতেও এই একই লোকাচারের সন্ধান মেলে।

মনসামঙ্গলের মনসা নাম নিয়ে নানামুনি নানা মত পোষণ করেছেন। সে দিকে দৃকপাত না করে আমরা বলতে পারি-

> ‘‘মনসা: সর্পকুলের অধীশ্বরী দেবী। নামান্তর পদ্মা, পদ্মাবতী, জগৎগৌরী, গজৎকাল। কথিত আছে শিবের তেজে পদ্মবনে এঁর জন্ম। ইনি বাসুকি নাগের ভগিনী এবং আস্তিক মুনির জননী। এই দেবীকে নিয়ে অজস্র লৌকিক ও আঞ্চলিক কাহিনী প্রচলিত আছে। এঁর গুণগান এবং গৌরব বর্ণনা করে কিছু মঙ্গলকাব্যও রচিত হয়েছে, সর্প পূজা সারা পৃথিবীতেই বিভিন্ন নামে ও প্রকারে প্রচলিত রয়েছে। দেশে দেশে মনসা পর্যায়ের সর্পদেবীদের নাম রূপ এবং পূজা প্রক্রিয়াও ভিন্ন। আমাদের দেশেও বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে নানা নামে এই দেবীর পূজার প্রচলন রয়েছে। অনেকে মনে করেন মনসা অনার্য জনগোষ্ঠীর দেবী। দক্ষিন ভারতে মঞ্চাম্মা

> নামক যে সর্পদেবীর অপরিসীম প্রভাব রয়েছে, অনেক পন্ডিত ভাষাগত সাদৃশ্যের প্রেক্ষিতে মনসাকে তাঁর অভিন্ন বলে মনে করেন। তাঁদের মতে মঞ্চাম্মা (মনচা + আম্মা = মনচা মাতা = মনসা মাতা)ই এই দেবী মনসাতে রূপান্তরিত হয়েছেন।''[৮]

এ সম্পর্কে আরও একটু বলা আবশ্যক- মনসা পূজা বা সর্পপূজা সারা বিশ্ব জুড়ে রয়েছে। সাপ সকল দেশের মত আমাদের দেশেও আশ্চর্য জীব। এর অদ্ভুত আকৃতি, তীব্র বিষ, আলোর ঝলকানির মত তীব্র গতি, ছয়মাস না খেয়ে অন্ধকারে ডুব দিয়ে থাকে, খোলস ছেড়ে আবার নতুন জীবন লাভ করে, জিহ্বা দু'ভাগে বিভক্ত হলেও তার লক্‌লকানি দেখে এদেশ কেন সারা পৃথিবীতে এ পূজা আদায় করে নিয়েছে। তাই-

> ''কাজেই দেখিতে পাই আফ্রিকার আদিম জাতিদের মধ্যে, আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের কাছে, মেলানেসিয়ায়, মেক্সিকোতে, চিনে, জাপানে, ক্রিটে, মিশরে, বাবিলোনিয়ায় হিব্রুভাষী জাতিদের মধ্যে, ফিনিসিয়ায়, গ্রিসে, রোম দেশে, কেল্‌টিক বাল্টো-স্লাভিক ও টিউটন জাতিদের মধ্যে সর্বত্রই কোনো না কোনো যুগে, কোনো না কোনো আকারে সর্পজাতি পূজা পাইয়াছে এবং বহুস্থানে নানা আকারে এখনও পাইতেছে। মিশর ও দ্রাবিড় জাতির ঐক্য যাঁরা মানেন তাঁরা ভারতের দক্ষিণে দ্রাবিড় দেশে সর্পপূজার বাহুল্যে বিচারের একটি নূতন ক্ষেত্র পাইবেন।''[৯]

সাপের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি বা পূজার প্রকরণ সব দেশে সমান নয়। কোন কোন দেশে সাপ মৃত্যুলোকবাসী পিতৃগণের প্রতিনিধি, কারণ সর্প খোলস ছেড়ে মৃত্যুকে জয় করে আবার নতুন জীবন লাভ করে। আবার কোন কোন দেশে সাপ হল ভবিষ্যৎ বংশ ও সন্তান বৃদ্ধির ধারক ও বাহক। আমাদের বাংলাদেশের মানুষের আজও বিশ্বাস আছে সাপের স্বপ্ন দেখলে বংশ বিস্তার হয়।

> ''পৃথিবীর বহুস্থানে সন্তানকামনায় সর্পপূজার পদ্ধতি আছে। গুজরাত, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমে এই উদ্দেশ্যে কুমারীরা সর্পপূজা করে। কাজেই সন্তানকামনায় শিবপূজায় যাঁহারা লিঙ্গপূজা অনুষ্ঠানের পরিচয় পাইয়াছেন, সর্প ও শিবের একত্র পূজায় তাঁহাদের বিস্মিত হইবার হেতু নাই।''[১০]

আবার নারীধর্ম, সন্তান-সন্ততিলাভ এবং ইন্দ্রিয়সম্ভোগের সঙ্গে আমাদের দেশের মত নানা দেশে জড়িয়ে আছে সর্পের সম্পর্ক। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাপের পূজা বিভিন্ন নামে ও পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। আমরা তো নাগের নামে, তক্ষকের নামে, সর্প নামের কত মন্দির, পুর ও শিলা লক্ষ্য করে আসছি। যেমন- নাগপত্তন, নাগপুর, তক্ষশিলা, অহিচ্ছত্র, অনন্তপুর ইত্যাদি নামের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে সর্পের আধিপত্য।

পুরাকালের মত আজও আমাদের দেশে কেন বিশ্বের নানাদেশে মানুষ-জন বিশ্বাস করেন যে সাপ মারলে নরহত্যা হয়। এর প্রমাণ মেলে মহাভারতের আস্তিক পর্বটির মধ্যে। আবার মহাভারতের আদিপর্বের মধ্যে আমরা নাগদের বৃত্তান্ত লক্ষ্য করি। মহাভারতের সভাপর্বে দেখি কদ্রুবংশীয় নাগের কাছে দাস্য মোচন ঘটেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে নাগেদের উল্লেখ দেখতে পাই। এই যে কথা গুলো বলা হল, তার কারণ বাংলাদেশে মনসাপূজার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে নাগদের কথা যে না বললেই হয় না। কারণ মনসাদেবী বাংলাদেশে এসেছেন জরৎকারুর পত্নী হিসেবে। আবার বাসুকির ভগ্নীর সঙ্গে মনসাকে এক করে দেখানো হয়েছে। মনসার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আজও গরুড়ের নাম স্মরণ করতে হয়।

এই মনসার সঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্যেরও মিল রয়েছে প্রচুর। মহাযান শাখাতে দেখি বৌদ্ধ রাজা অশোকের বংশপ্রবর্তক শিশুনাগ। মধ্যভারতে সাপের ওঝাকে বাইগা বলে। এই বাইগা বাংলার বেদে এবং আজকের বাংলাদেশের বাইদ্যার মত। সিন্ধুপ্রদেশে ও কচ্ছের লোকেরা বিষরী পূজা করেন, যা পশ্চিমবঙ্গের ও পূর্ববঙ্গের বিষহরি। কানড়া ও তেলেগু প্রদেশে যেমন বিশালদেবী আছেন, তেমনি আছেন 'মনে মাঞ্চী' দেবী।

> ''ইনি নাগদেবী। বল্মীকস্তূপেই প্রায় জাতি-সাপ থাকে। তাই বল্মীকস্তূপেই কানাড়াতে ও তেলেগুদেশে সাপের পূজা হয়। বৎসরের একবার মাত্র 'মনে মাঞ্চী'র পূজা। বিশালদেবীর পূজার সঙ্গে এই মাঞ্চীর পূজা জড়িত। এই মাঞ্চি দেবীকে সেখানে 'মঞ্চাম্মা' বা মন্চা মাতা বলে। ইহারা 'চ'কে প্রায় 'স'-এর মতন উচ্চারণ করে। কাজেই 'মন্সা অম্মা' মন্সা মাতায় গিয়া দাঁড়ায়।''[১১]

এই প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন যে চাঁদ সদাগর মনসাকে যে 'চেংমুড়ী কানী' বলেছেন তাও তেলেগুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি বলেছেন-

> ''তেলেগু বর্তমান অভিধানে আছে 'চেমুডু' বা 'জেমুডু' শব্দ। এই শব্দটি পাইয়া আমার ধোঁকা আরও অনেকটা কাটিয়া গেল। মনসা নাম পূর্বেই পাইয়াছিলাম- 'মন্চা অম্ম' অর্থাৎ মনসা-মাতা। শিব ও মনসার ঝগড়ার গল্প পাইলাম। পূজার পদ্ধতির ঐক্য পাইলাম। মন্সা-খোলা রাখার নিয়মের সাম্য পাইলাম। মনসা গাছ, যাহাতে মনসা দেবীর পূজা হয় তাহার নামটিও পাইলাম 'চেংমুডু' বা 'চেংমুড়ী'।
>
> বাংলাতে 'চেংমুড়ী' কথাটির মানে হয় না। তখন সকলে মনে করিলেন 'চ্যাং' অর্থাৎ 'লেঠা' মাছের মতো মাথা যার সেই মনসা দেবী। বাংলার মনসাভাসান- লেখকরাও তখন দক্ষিণ হইতে এই পূজার আসিবার ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছেন। এই মনসারই নাম 'চেংমুডু' পাইয়া আগাগোড়া সবটা সুসংগত হইয়া গেল।''[১২]

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন-

> ‘‘বাংলাদেশ যেমন দক্ষিণের রাজাদের ঠেকাইতে পারে নাই, তেমনি দক্ষিণের দেবতাদের ঠেকাইতে পারিল না। চাঁদসদাগর খুব কঠিনরকমের শৈব, কিন্তু গ্রামদেবীর কাছে তাঁকে মাথা নোওয়াইতে হইল। কারণ গ্রামদেবীরা ভয় ও লোভ দেখাইয়া প্রথমে নারীদের বশ করে। কাজেই তখন পুরুষরা দীর্ঘকাল তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।’’[১৩]

মনসা নারী। মনসা দেবী। মহাদেবের কন্যা। মঙ্গলকাব্যের সকল দেব-দেবী মিশ্র গুণে গুণান্বিত। বিশেষকরে দেবী চরিত্র গুলো। দেবী চরিত্রদের মধ্যে একদিকে যেমন ফুটে উঠেছে অকৃত্রিম স্নেহশীলতা ও সন্তান বাৎসল্যের কল্যাণীময়ী মূর্তি ওপর দিকে তাঁরা হিংস্রা, প্রচণ্ডা, উগ্রতা এবং ধ্বংসাত্মিকা শক্তির পরিচায়িকা। শান্ত ও উগ্ররসের সংমিশ্রণে মনসামঙ্গলের মনসা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীদের থেকে স্বতন্ত্রা। আবার এও ঠিক অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবতা মানুষের মধ্যে সহজ-সরল বিরোধের পাশাপাশি বন্ধুত্বের ছোঁয়া অনুভব করা গেলেও মনসামঙ্গলের পাতায় এর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া ভার। তাই বোধ হয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

> ‘‘...মনসামঙ্গলের শেষ সমাধানের মধ্যে যেন একটি বেদনার সুর, যেন একটা গরমিলের সন্দেহ প্রচ্ছন্ন থাকে। বিরোধ মিলন উভয়ের মধ্যেই একটি আতিশয্য যেন সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে, বাঁকা ধনুক আর সম্পূর্ণ সোজা হয় না।’’[১৪]

এমনকি ড: শ্রীকুমার এও মনে করেন- দেবী মনসার

> ‘‘দেবত্বস্বীকৃতি প্রচলিত সংস্কার ও ঔচিত্যবোধের প্রতি এরূপ রূঢ় আঘাত হানে যে, ইহা মানুষের মনে ভক্তিবৃত্তির সমর্থন বঞ্চিত। মানব মনের স্বাভাবিক গতির বিপরীতমুখী বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ কোন দিনই সম্পূর্ণ শান্ত হয় নাই।’’[১৫]

মনসা স্বৈরাচারী রাজশক্তির প্রতীক। মনসা যেনতেন প্রকারে পূজা আদায় করতে ব্যস্ত। তিনি

> ‘‘জোর করেই পূজা আদায় করেন। স্বেচ্ছাচারিতার যুগে দেবতারা স্বেচ্ছাচারিতারই বিগ্রহ, মানুষ যেন তাদের ক্রীড়া পুত্তলিকা।’’[১৬]

কিন্তু কেন আজ মনসা স্বৈরাচারী। সে কথাটিও মনে রাখা দরকার। দেবাদিদেব মহাদেবের কন্যা মনসা সামাজিক বঞ্চনা ও উৎপীড়নের শিকার। দেবী মনসার মধ্যে রয়েছে দুটি বৃত্তি-

ক) স্বাভাবিক কোমল নারী সুলভ মাধুর্য্যময়ী কোমলতা ও কমনীয়তা।

খ) ক্রূর সর্পস্বভাব, জিঘাংসা পরায়ণা এবং সর্বনাশা প্রবৃত্তি।- এর কারণ বিশেষ করে মনসার দেবীত্বের পরিচয় থেকে লোভী, নরহত্যাপটু ও নিষ্ঠুরতার পিছনে যে কারণ গুলি খুঁজে পাওয়া যায়, তাহল-

১) শিবের অবৈধ কামনার ফসল মনসা। কালিদহে পুষ্পচয়ণরত পিতা মহাদেবের আকস্মিক মদনপীড়াজাত বিন্দু-বীর্যপাতে অযোনিসম্ভূত অবস্থায় মনসার জন্ম।

২) পিতা-মাতার স্নেহসান্নিধ্য থেকে বিমুখ। বিশেষকরে জন্মের পর থেকে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিতা।

৩) বিমাতা কতৃক ভৎর্সনা ও গঞ্জনা। বলা ভালো বিমাতার অত্যাচারে মনসার জীবন ওষ্ঠাগতা।

৪) ক্রূর বিষধর ও খল স্বভাবের সাপের সঙ্গে সিঁজুয়া পর্বতে বাস।

৫) অপগত পৌরুষ হৃতযৌবন ঋষির সঙ্গে বিবাহ। অর্থাৎ বিবাহিত জীবনের সুখ থেকে বঞ্চিতা। এবং বিবাহিত জীবনে স্বামী পরিত্যক্তা।

৬) দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রীতির সঙ্গে মনসার নেই কোন পরিচয়। তার জীবনে ব্যর্থতা, বেদনা এবং আঘাত নিত্য সহচর।

তাই আজ নিজ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যেনতেন প্রকারেণে মর্ত্যে তার পূজা আবশ্যক। এর জন্য মনসা নিষ্ঠুর, ক্রূর, প্রতিহিংসা পরায়ণা, শঠ। আবার এও দেখা যায় মনসা তার ক্ষুধার্ত সন্তানের মুখে অন্ন জোগাবার জন্য পরের বাড়ী দাসী বৃত্তি করেছে। যখন তাতেও মুখে আহার জোগাতে পারেনি তখনই সমাজের উচুঁ তলার বাসিন্দাদের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে।

‘‘অন্যের ছাআল হৈলে দুগ্ধে ভাতে খায়।
আমার ছাআল কেনে খিধাএ লালায়।।’’[১৭]

তাই

> ‘‘---দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রীতির সঙ্গে যার আবাল্য অপরিচয়, ব্যর্থতা, বেদনা ও আঘাত যার নিত্য সহচর, পিপাসার্ত ও অতৃপ্ত সেই নারী মনের অলিন্দে নিষ্ঠুর-হিংস্র-উন্মত্ত চোরা চাউনি ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করা যায় কি? তার যৌবন পুষ্ট দেহের দিকে পিতা শিবও ‘কাম-চীতে’ লোভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। সৎমা চন্ডী বিনা অপরাধে শারীরিক নির্যাতনের সাথে সাথে কুৎসিত ভর্ৎসনা বাক্য উচ্চারণ করে বলেছে - ‘বাপের সহিত রতি ভুঞ্জ নিরন্তরে’। বিপ্রদাস পিপলাই তাঁর মনসামঙ্গলে মনসার এসব শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের এক নিঁখুত চিত্র পরিবেশন করেছেন। এইসব অনভিপ্রেত ঘটনার নিষ্ঠুর অভিঘাতে মনসার সুকোমল মানসবৃত্তি সঙ্কুচিত হয়ে ক্রুর সর্পবুদ্ধিকে প্রবলতর হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।’’[১৮]

মা-হারা মনসা মায়ের স্নেহাশীষ পাওয়ার জন্য ব্যাকুলা। আর মা চন্ডী তাকে একেরপর এক নানা কটুকথা, লাঞ্ছনা, পাপিষ্ঠা ব্যভিচারিণী বলেছে। শুধু এই টুকু বলেই ক্ষান্ত হয়নি চন্ডী, তার উপর চালিয়েছে শারীরিক অত্যাচার। মনসার দিয়েছে কাঁকালি ভেঙ্গে, চক্ষু দিয়েছে কানা করে। ফলে মনসার কোমল শরীর-বৃত্তে মন-বৃত্তে এবং অন্তরের অন্তঃস্থলে যে সব শুভবুদ্ধি ছিল তা হিংস্র ও আক্রমণোন্মত্ত ক্রূরবুদ্ধিতে পরিণত হয়ে যায়। মনসামঙ্গলের যে সমস্ত কবিরা রয়েছেন তাঁদের একটা তালিকা আমরা তুলে ধরতে পারি।

মনসামঙ্গলের কবিবর্গ: দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ নামক গ্রন্থে মনসামঙ্গলের মোট ৬২ জন কবির নামোল্লেখ করেছেন। এঁরা হলেন ১) কানা হরিদত্ত, ২) নারায়ণ দেব, ৩) বিজয় গুপ্ত, ৪) রঘুনাথ, ৫) যদুনাথ পন্ডিত, ৬) বলরাম দাস, ৭) জগন্নাথ সেন, ৮) বংশীধর, ৯) দ্বিজ বংশী দাস, ১০) বল্লভ ঘোষ, ১১) বিপ্রহৃদয়, ১২) গোবিন্দ দাস, ১৩) গোপীচন্দ্র, ১৪) বিপ্র জানকীনাথ, ১৫) দ্বিজ বলরাম, ১৬) কেতকীদাস, ১৭) ক্ষেমানন্দ, ১৮) অনুপম চন্দ্র, ১৯) রাধাকৃষ্ণ, ২০) হরিদাস, ২১) কমলনয়ন, ২২) সীতাপতি, ২৩) রামনিধি, ২৪) কবি চন্দ্রপতি, ২৫) গোলোক চন্দ্র, ২৬) কবি কর্ণপূর, ২৭) জানকী নাথ, ২৮) বর্ধমান দাস, ২৯) ষষ্ঠীবর সেন, ৩০) গঙ্গাদাস সেন, ৩১) রাম বিনোদ, ৩২) আদিত্য দাস, ৩৩) কমললোচন, ৩৪) কৃষ্ণানন্দ, ৩৫) পন্ডিত গঙ্গাদাস, ৩৬) গুণানন্দ সেন, ৩৭) জগদ্বল্লভ, ৩৮) বিপ্র জগন্নাথ, ৩৯) জগমোহন মিত্র, ৪০) জয়দেব দাস, ৪১) দ্বিজ জয়রাম, ৪২) নন্দলাল, ৪৩) বাণেশ্বর, ৪৪) মধুসূদন দেব, ৪৫) বিপ্র রতিদেব, ৪৬) রতিদেব সেন, ৪৭) রামকান্ত, ৪৮) দ্বিজ রসিকচন্দ্র, ৪৯) রাজা রাজসিংহ, ৫০) রামচন্দ্র, ৫১) রামজীবন বিদ্যাভূষণ, ৫২) বিপ্র রামদাস, ৫৩) রামদাস সেন, ৫৪) দ্বিজ বনমালী, ৫৫) বনমালী দাস, ৫৬) বিপ্র দাস, ৫৭) বিশ্বেশ্বর, ৫৮) বিষ্ণুপাল, ৫৯) সুকবি দাস, ৬০) সুখ দাস, ৬১) সুদাম দাস, ৬২) দ্বিজ হরিরাম।[১৯] কিন্তু সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে উত্তরবঙ্গের অন্তত যে তিনজন কবির মনসামঙ্গলের কবির কথা জানতে পারি তাঁদের তো নামোল্লেখ করেননি দীনেশচন্দ্র সেন। এই তিনজন বিখ্যাত কবি হলেন- ১) তন্ত্র-বিভূতি, ২) জগৎজীবন ঘোষাল এবং ৩) জীবনকৃষ্ণ মৈত্র। এছাড়া মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন-

> ‘‘গত একশত বৎসরের মধ্যে আমরা কয়েকজন মনসামঙ্গল রচয়িতার নাম এখন উল্লেখ করিতেছি- জগমোহন মিত্র- তাঁহার মনসামঙ্গলের রচনাকাল ১২৫১ সাল (১৮৪৪ খ্রীঃ), দ্বিজ কালীপ্রসন্ন- যশোহর জিলার অন্তর্গত মল্লিকপুরে তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার কাব্যের রচনাকাল ১২৬৭ সাল (১৮৬০ খ্রীঃ), বৈদ্যনাথ- নিবাস কুচবিহার অঞ্চলে। কবির অন্য কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। রাধানাথ রায়চৌধুরী- ইনি শ্রীহট্ট নিবাসী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি তাঁহার মনসামঙ্গল রচনা করেন।’’[২০]

এই সমস্ত কবিরা প্রায় প্রত্যেকেই মনসার দুটি বৃত্তিকে ঠিক মত তুলে ধরবার চেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছেন। মনসামঙ্গলের যে সমস্ত কবিরা রয়েছেন তাঁদের একটা তালিকা দিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি মনসামঙ্গলের ৬২ জন কবির কথা বলেছেন। এই সমস্ত কবিরা প্রায় প্রত্যেকেই মনসার দুটি বৃত্তিকে ঠিক মত তুলে ধরবার চেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বিশিষ্ট কবিদের কাব্যকে বিশ্লেষণ করে মনসার দুটি সত্তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

৫ মনসামঙ্গল কাব্যে মুখ্য নারী চরিত্রগুলির অবস্থান বিশ্লেষণ

প্রাচীন বাংলার পল্লীজীবন, সলজ্জ বধূ, সতী নারীর অপূর্ব গরিমা, শৌর্য্য, পরাক্রমা, সমুদ্রযাত্রা, সমাজ-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, সুখ-দুঃখ, হাস্য-কৌতুক প্রভৃতির সুন্দর আলেখ্য মনসামঙ্গলের কবিরা নিপুণ শিল্প-তুলিকায় স্পষ্ট করে তুলেছেন। 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' বা 'বাইশা'-য় বিজয় গুপ্ত মনসার জন্ম কথায় জানালেন

''পাতালেতে মনসা জন্মিল শুভদিনে।
নারদ গিয়া জানাইল পিতামহ-স্থানে।।
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা আনন্দিত মন।
ব্রহ্মা আসি করেন মায়ের নামকরণ।।
বিষমুখ দেখিয়া মায়ের নাম বিষহরি।

*** *** ***

ভগিনী দেখিয়া নাগ মনে মনে আশা।
বাছিয়া থুইল নাম জয় মনসা।।''[২১]

সুকবি নারায়ণ দেব তাঁর কাব্যে বলেছেন-

''সিবের আদেসে পক্ষী নড়িল সত্তরে।
পুনরপি থুইল বির্জ্য পত্রের উপরে।।
সত্রুনাসে নামিলেক পাতাল ভুবন।
বাসুকি নিকটে জাইয়া দিল দরসন।।

*** *** ***

ধায়া গিয়া পাইলেক কন্যার মুরতি।
শুভক্ষণে জর্ম্ম হইল মাও পদ্যাবতি।।''[২২]

তিনি আবার বললেন-

''জয় জয় পদ্যাবতি পাতালেতে উৎপতি
জয়ে নির্ম্মালি করয়ে নির্ম্মান।
আনন্ধিত নাগপুরি জর্ম্ম হইল বিসহরি
ঘটে জীব হইল দিষ্টান।।

*** *** ***

বিস্বম্বরের কুমরি জর্ম্ম হইল বিসহরি
জয় জয় হইল নাগপুরি।
যে বিসগ ছায়া ছিল সিগ্রগতি আনি দিল

বাসুকি তার আছিল ভান্ডারি।।
জর্ম্মা হইল বিসহরি   সানন্দিত নাগপুরি
প্রকাসিত পাতাল ভুবন।
হেন দেবের পূজা জথা   লক্ষিয়ে না ছাড়ে তথা
নারায়ন দেবের সুবচন।।’’[২৩]

মনসা ‘অযোনি-সম্ভবা কন্যা পরমা সুন্দরী’[২৪] একদিন বনমধ্যে শিব যৌবনবতী মনসার অপরূপ রূপ-মাধুরী দেখে -

‘‘কন্যার রূপ যৌবন অদ্ভুত হেন বাসি।
করিব গন্ধর্ব বিয়া লইয়া যাইব কাশী।।’’[২৫]

আর নারায়ণ দেবের কাব্যে দেবাদিদেব মহাদেব এই রূপবতী কন্যাকে দেখে বলেছেন-

‘‘সিবের নিকটে গেল পরম উর্ল্লাসে।
আচম্বিতে মহাদেব দেখিল বাম পাসে।।
সিবে বোলে মোর বাক্য সুনহ সুন্দরী।
কথা হইতে কথা জাও কাহার কুমারি।।
তব রূপ দেখি মোর দহে কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর।।’’[২৬]

শুধু এই বলেই ক্ষান্ত হননি মহাদেব, এরপর তিনি আর যা বলতে লাগলেন, তাতে অশ্লীলতার মাত্রার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে -

‘‘কন্যা কেনে একেস্বর পদ্যবনে।
প্রথম জৌবন রস   জেন মধুর কলস
বিনে স্বামি বঞ্চয়ে কেমনে।।
কেমন কুন্ধারে তর   গঠিলেক পয়োধর
নিম্মায়াছে দিয়া গজমতি।
দেখি তোর রূপ ছান্ধ   লর্জ্জায়ে পলায়ে চান্ধ
ভোমে পড়িল পসুপতি।।
চন্ডিকা সুন্দরি ঘরে   এড়ি আইলাম একাস্বরে
প্রাণ মোর পোড়ে রাত্রি দিনে।।
তব রূপ জৌবন দেখি   স্থির নাই রই আখি
প্রাণ রাখ আলিঙ্গন দানে।।’’[২৭]

মনসা-শিবের কথপোকথনে 'কামভাবে মহাদেব' নানা অশ্লীল কথা বলতে লাগলেন। আর মনসা শিবকে তাঁর পিতা বলে সম্বোধন করলেও শিব তাঁর কামানলকে নিভাতে পারছেন না। মনসা তখন বাধ্য হয়ে পিতা মহাদেবকে বলতে লাগলেন-

''মুক্তি তোমার নামে তুমিও মোহিত কামে
নরপশু কিসে লাগে আর।।''[২৮]

নারায়ণ দেবের কাব্যে পাই-

''পদ্যা বোলে বাম জপিলেক অবিরাম
হেন বাক্য কহ কি কারণ।
পদ্যা কহিল কথা আমি তোমার দুহিতা
নারায়ণ দেবের সুবচন।।''[২৯]

মনসা প্রাণপণে পিতৃদেব শিবকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, যে সে তাঁরই কন্যা; কিন্তু শিব তো এখন কামানলে দগ্ধ, এই কামানল নিবৃত্ত করার একমাত্র উপায় হিসেবে তাঁকে অচৈতন্য করে নিজ সতীত্ব রক্ষা করতে হবে ভেবে মনসা পিতার দিকে বিষ নয়নে চেয়েছেন-

''পদ্মাবতী বলে শুন বাপ ত্রিলোচন।
আপনার ঝিউ আমি জানে মুনিগণ।।
এ বোল না মানে তবে রাউল শঙ্করে।
পদ্মবনে ধরিয়া পদ্মারে বল করে।।
বিষনয়নে চাইলা জয় বিষহরি।
ঢলিয়া পড়িলা মহাদেব ত্রিপুরারি।।''[৩০]
''সাজিলেক পদ্যাবতি লইয়া নাগগণ।
ব্যার্ল্বিস নাগে হইল পদ্যার সাজন।।
বিস নঞানে জদি চাহিলা বিসহরি।
ঢলিয়া পড়িল সিব উর্ত্তর সিয়রি।।''[৩১]

পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি পন্ডিত জানকীনাথ বিরচিত 'পদ্মাপুরাণ'-এ আমরা দেখি পাতালে মনসার জন্মের পরে পদ্মবনে মনসার সঙ্গে পিতা মহাদেবের সাক্ষাৎ হলে সুন্দরী মনসার রূপে পাগল-হারা কামমোহিত শিব 'অনুচিতবাণী' বলতে থাকেন। কিন্তু দেবাদিদেব শিবের মোহ ভাঙতে মনসা তাঁর নিজের পরিচয় দিয়ে জানান যে, তিনি শিবেরই কন্যা। কিন্তু-

''মদনে মহিত শিব প্রবু না মানেঃ
বল করিবার চাএ হৈয়া ভ্রমজ্ঞানে।

নিজেকে রক্ষায় নান্যোপায় মনসা তখনঃ

পরিণাম না চাইল কুপের কারণঃ

বাপের চাইল পৌদ্যা বিষ নয়ণ।

বিষে ছর্ন্ন হৈয়া তবে দেব ত্রিলুচনঃ

মহ-পাইয়া ভূমিতে পড়িলা ততক্ষণ।’’[৩২]

পিতৃহত্যা করে মনসা ভীষণভাবে অনুতপ্তা। দুঃখিতা মনসা এই হেয় কাজের জন্য নিজেকে স্থির রাখতে পারছেন না তাই নিজেই নিজের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

‘‘বিনাইয়া খেদ করে, মনসা রোদন করে,
কেন এনু কমলের বনে।
প্রথম দর্শনে কই বাপেকে দংশিনু মুই,
কলঙ্ক রহিল ত্রিভুবনে।।’’[৩৩]

অথবা-

‘‘ততক্ষণে পদ্মাবতী স্থির কৈলা মন।

পিতা জিয়াইতে বুদ্ধি করিলা তখন।।

*** *** ***

মহামন্ত্র পাইয়া তবে বিষ নষ্ট হৈল।

ত্রিদেব নাথ শিবাই বর্ত্তিয়া উঠিল।।’’[৩৪]

এর মধ্যে রয়েছে নারী মনসার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। পিতা মহাদেবও যদি কোন অনুচিত কথা বলেন তাকে কিন্তু মনসা সমর্থন জানাননি। মনসা তাঁর পিতাকে ‘নরপশু’ বলে ধিক্কার জানিয়েছেন। কবি বিজয় গুপ্ত সুচতুর শিল্পীর মত এখানে কীভাবে মনসা নাম হল তারও বিবরণ দিয়েছেন। যেমন-

‘‘যোগধ্যান মনে রাখ আপনি ভাবিয়া দেখ
কি ধন এড়িলা পুষ্পবনে।
নামিয়া পাতালভূমি তাহাতে জন্মিলাম আমি
মনসা নাম থুইল দেবগণে।।
হের করি নমস্কার কত পুষ্প তোল আর
রৌদ্রে শরীর হইল ক্ষীণ।
পুষ্পে ভরিল সাজি চল ঘরে যাই আজি
মনে লয় আসিও আর দিন।।
শুনিয়া পদ্মার বাণী নাম থুইল পদ্মাবতী
মনসা নাম থুইল নাগরাজে।।’’[৩৫]

শিবের সঙ্গে মনসার পরিচয় ক্ষান্ত হল। মনসা পিতৃমাতৃ স্নেহ-সুখে বঞ্চিতা। আজ তাঁর পিতাকে পেয়েছে। পিতৃভবনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বাবার কাছে আবদার ধরেছে মনসা। যেখানে রয়েছেন গর্ভধারিণী মা না হলেও সৎ মা চণ্ডী আছেন। কিন্তু পিতা মহাদেব বিমাতার ব্যবহার সম্পর্কে শঙ্কিত। মনসাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেও আজ মনসা যে ছাড়বার পাত্রী নয় এবং মনসা বিমাতার মন জয় করবার জন্য বলে সে তার মায়ের সেবা-যত্ন মায়ের মন তুষ্ট করবেই। বেশ, এই অঙ্গীকারের পর শিব মনসাকে পিতৃভবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্মত হন-

‘‘মনসা বলেন তবে জুড়ি দুই কর। তব সঙ্গে চলি যাব যথা নিজঘর।।

হর বলে চণ্ডী তোমা নারিব দেখিতে। অকারণে মোর ঘরে চাহত জাইতে।।

মনসা বলেন পুন শুন মহাশয়। কহিল অবশ্য আমি জাইব নিশ্চয়।।

যতনে করিব সত্ত-মায়ের সেবন। নহিবেন রুষ্ট মোরে শুন ত্রিলোচন।।’’[৩৬]

শিবের মনে যে সংশয় এসেছে তা আজকের সাধারণ মানুষের মত সংশয়। তিনি একেবারে ধূলি-ধূসরিত মানুষের মত ভাবছেন যে-

‘‘কোন কার্য কপটে ভাণ্ডিয়া আইলাম চণ্ডী।
ঘরে গেলে দিবে গালি দৈবে নাহি খণ্ডি।।
ভালমন্দ না বুঝিয়া কোপেতে আগুলি।
মোর কোপে চণ্ডিকা পদ্মারে দিবে গালি।।
বিরোধের আশে দেবী একমনে আছে।
এখনে না নিব পদ্মা চণ্ডিকার কাছে।।
পদ্মার সঙ্গে বিবাদে কি জানি দৈব ঠেকে।
লুকায়ে রাখিব পদ্ম চণ্ডিকা না দেখে।।
আমারে ভর্ৎসিয়া যদি কোপ দূর হয়।
তবে সৎমায় ঝি করাব পরিচয়।।’’[৩৭]

শিব তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে যে কথা গুলো বলেছেন তাঁর মধ্যে কোন দেব-দেবীর সংসারের আভাস খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সংসার আজকের সংসার বলতে এত টুকু বাঁধে না। তাই দেবাদিদেব মহাদেব ভেবে-চিন্তে-

‘‘পুষ্পের করণ্ডী-মধ্যে থুইল পদ্মাবতী।।
হেটে পুষ্প, উপরে পুষ্প দিয়া চারিভিতে।

মধ্যে লুকাইয়া পদ্মা থুইল অলক্ষিতে।।
গোসাঞির পুষ্পের সাজি সাতা পাঁচা ঘর।
তার মধ্যে রহিলা পদ্মা হইয়া স্বতন্তর।।''[৩৮]

বচাইয়ের বাড়ীতে 'শিব পদ্মা গেল থুইয়া'[৩৯]। এই সুযোগে -

''নাচিতে লাগিল বচাই হাতে তালি দিয়া।
''মহাদেব জানে আমি নাহি করি বিয়া।।
পরমা সুন্দরী কন্যা দিয়াছেন আনিয়া।
বিবাহ করিব আমি সজ্জা কর গিয়া।।''[৪০]

এরপর আমরা দেখি মনসাকে ধর্ষণ করতে এগিয়ে এসেছে হালুয়া ব্রাহ্মণ।-

''হালুয়া বছাই তাকে দেখে আচম্বিতঃ
পরম সুন্দরী কর্ন্না বিদ্ধের সহিত।
দেখেঃ বিদ্ধেরে মারিয়া কর্ন্না আনিবারে গেলঃ
তখনঃ তাহা দেখি পৌদ্দাবতী মহাকুপ হৈলঃ
তখনে বছাইরে পৌদ্দা বিষদৃষ্টে চাইল।
ঢলিয়া পড়িল সাধু লাল পড়ে মখেঃ ইত্যাদি।''[৪১]

বচাইয়ের হাত থেকে মনসাকে নিস্তার পাওয়ার জন্য তাঁর আসল মূর্তি ধারণ করতে হয়েছে। মনসা বিষচক্ষে বচাইয়ের দিকে দেখা মাত্রই বচাই ঢলে পড়ে। মনসাকে যেহেতু বচাই অপমান করেছে তাই বচাইকে তো তার শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেবের কথায় আমরা এর উত্তর পেয়ে যাই-

''মহাদেব বলে, 'বুড়ী, কান্দ কি লাগিয়া।
মরেছে তোমার পুত্র দিব জীয়াইয়া।।
পদ্মার চরণে তুমি দেও পুষ্পজল।
জীয়াইব তব পুত্র সবের ভিতর।।''[৪২]

মনসার মধ্যে রয়েছে দু'টি সত্ত্বা। একদিকে মনসা কল্যাণকামিনী অন্যদিকে প্রতিহিংসা পরায়নী। এ অংশে আমরা মনসার দু'টি বৃত্তিকেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এও ঠিক প্রতিশোধ পরায়নীর চেয়ে মনসার মাতৃরূপিণী বৃত্তিটি এখানে জয়ী হয়েছে। তাই অমৃতনয়না মনসা বচাইকে প্রাণভিক্ষা দিল। কিন্তু একজন সরলা মেয়ের মতো মনসাকে যখন বচাই প্রণাম করেছে, তখন একদিকে সরল-স্বভাবা মনসাকে যেমন পাই তেমনি তার মধ্যে পাই 'যেমন কর্ম তেমন ফল'-এর উত্তর-

‘‘পদ্মা বলে, ‘‘চেয়েছিলে বিবাহ করিবারে।
এখন চরণে পড় কাহার বচনে।।’’[৪৩]

‘চণ্ডীর কোন্দল’ অংশে আমরা দেখি মনসাকে চণ্ডী নানাভাবে নির্যাতন করেছে। ফুলের করণ্ডীর মধ্যে মনসাকে দেখা মাত্র চণ্ডী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে।

‘‘পুষ্পের ভিতরে রহে মনসা লুকাইয়া। পুরে গিয়া পুষ্প হর এড়িল তুলিয়া।।
স্নান করিবারে হর করিলা গমন। বিস্ময় হইয়া চণ্ডী ভাবে মনে মন।।
আর দিন পুষ্প সাজি দিত মোর স্থান। আজি কেন তুলিয়া এড়িল ত্রিলোচন।।
বিস্মিত হইয়া চণ্ডী ভাবে মনে মনে। খুঁজিয়া আনিল সাজি নিজ বিদ্যমানে।।
ঘুচাইয়া একদৃষ্টে নেহালে সত্বরে। মনসা পাইল দেবী পুষ্পের ভিতরে।।
দৃষ্টিমাত্র দুষ্ট নষ্ট বলে দুরাচার। অবিচারে কেশে ধরি করয়ে প্রহার।।
পদ্মা বলে না মারিহ চণ্ডী গো সতাই। দ্বিজ বিপ্রদাস বলে পরিচয় হই।।’’[৪৪]

আর এ জ্বলে ওঠা স্বাভাবিক। কোন নারীই চায় না তার স্বামী পরনারী সম্ভোগে অভিসারে যাক! কোন নারী চায় না সতীনের জ্বালা ভোগ করতে। এখানে দেবী চণ্ডীর পরিচয় থেকে মানবী চণ্ডীর পরিচয় মেলে বেশী। একেবারে গ্রাম্য নারীর মতো দেবী চণ্ডী ‘‘খল খল হাসে দেবী হস্তে দিয়া তালি।’’[৪৫] এবং কাউকে ভয়-ডর না করে নিজে নিজে ‘আপন ইচ্ছায় গালি’[৪৬] দিতে থাকে দেবী।-

‘‘চোপাড়ে চাপড় মারে দের চুণকালি।।

বুকে পৃষ্ঠে মারে দেবী বজ্র চাপড়।’’[৪৭]

‘‘পুষ্পের ভিতর লুকি দিলা বিষহরি।

পদ্ম ফুলের ভিতরে পদ্মারে দেখে গৌরী।।

উন্মত্ত ভাবে মুষ্ঠি চাপিয়া ধরয়ে।

সহিতে না পারি পদ্মা বাহিরিলা ভয়ে।।

*** *** ***

তোমার লাগিয়া শিব নিতি না লয় ঘর।

নিতি যায় তব সঙ্গে ক্রীড়ার অন্তর।।

যদি তুমি শঙ্করের ঝি খানি হইতা।

কি কারণে কন্যা তুমি আমারে লুকাইতা।।’’[৪৮]

চণ্ডীর এই রূপ দেখে মনসা ভয়ে কম্পমানা। এবং-

‘‘মারণের ঘায় পদ্মা করে থর থর।।
বিপরীত ডাকে পদ্মা প্রাণে লাগে ব্যথা।
নিষ্ঠুর হইয়া মারে কার্তিকের মাতা।।’’[৪৯]

এরপর চণ্ডী মনসাকে প্রহার করতে শুরু করল। এখানে বিজয় গুপ্ত তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন।

‘‘চণ্ডীর প্রহার পদ্মা সহিতে না পারি।
‘‘বাপ, বাপ’’ বলি ডাকেন জয় বিষহরী।।
‘‘কোথা গেল বাপ মোর ত্রিদশাধিপতি।
নিকটে আসিয়া দেখ আমার দুর্গতি।।
তুমি বিদ্যমানে মোরে অন্য জনে মারে।
শূন্য ঘরে প্রাণ দিব চণ্ডীর প্রহারে।।’’[৫০]

বিজয় গুপ্ত যেভাবে লৌকিক উপমার দ্বারা মনসার প্রহারকে বর্ণনা করেছেন তাতে কবির কবিত্ব শক্তির পরিচয়কে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের কোন কুণ্ঠাবোধ থাকে না। তিনি বলেছেন-

‘‘ব্যাধের হাতে পড়ে যেন পক্ষীর কিলকিলি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পদ্মা ‘‘বাপ, বাপ’’ বলি।।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পদ্মা বলে ‘‘বাপ, বাপ।’’
তবুও দেবীর শরীরে তিলেক নাহি তাপ।।
‘‘মাতা নাহি, ভ্রাতা নাহি- একমাত্র বাপ।
তোমার চণ্ডীর শরীরে কিঞ্চিৎ নাহি তাপ।’’[৫১]

কোন্দল শুনে দেবী চণ্ডীর দুই সখী সুচরিতা, বসুমাতা এবং জাহ্নবী এসে দেখে - ‘‘পরমা সুন্দরী কন্যা চণ্ডী কেন মারে।’’[৫২] চণ্ডীর প্রহারে অকুমারী মনসার তনু শেষ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। মনসা চিৎকার করে বলতে লাগছে-

‘‘পদ্মা বলে, ‘‘দেবি, তুমি জগতের মাতা।
অবিচারে মার মোরে পাছে পাবে ব্যথা।।
মন দিয়া শুন, মাতা, কহি তোমার ঠাঁই।
মহাদেবের কন্যা আমি উদাসিনী নই।।
অবিচারে অনুচিত করিলা অধর্ম।
মহাদেবের কন্যা আমি অযোনি-সম্ভব।।

পদ্মবনে জন্ম আমার নাম পদ্মাবতী।
তোমার ঘরে আইলাম কালি বাপের সংহতি।।
মা নাই, ভাই নাই- মনে বড় তাপ।
তোমার ক্রোধ দেখিয়া লুকাইয়া থুইলা বাপ।।
কোপেতে ব্যাকুল তুমি পাছে নাহি চাও।
উচিত সম্বন্ধে তুমি হও সতা মাও।।’’[৫৩]

এভাবে মনসা তার সৎ মাকে তার পরিচয় দিয়েছেন। একথা শোনার পর দেবী চণ্ডী আরো রেগে গিয়ে বলে-

‘‘চণ্ডী বলে, ‘‘মোর ঠাঁই না রহে নারীকলা।
মোর স্বামী লবা তাই পাতিয়াছ ছলা।।’’
চণ্ডী বলে, ‘‘শুন পদ্মা, আমার বচন।
মোর স্বামিলোভে তুই আসিয়াছ কি কারণ।।
চণ্ডীর প্রহার পদ্মা সহিতে না পারি।
গঙ্গা-সম্বোধিয়া বলে জয় বিসহরী।।’’[৫৪]

মনসাকে দেবী চণ্ডী নানাভাবে অত্যাচার করেছেন। একাব্যের প্রত্যেক কবির হস্তে মনসার উপরে লাঞ্ছনার ছবি সুন্দর ভাবে চিত্রিত। যেমন-

‘‘লাফ দিয়া পার্ব্বতী পদ্মার চুলে ধরে।
অঝোর নয়নে পদ্মা ক্রন্দন সে করে।।
কেশ ধরিয়া মারে লাথি আর গুড়ি।
চড় চাপড় মুটকি মারে বাটুনের বাড়ি।।
পদ্মা বলে না মারিহ পার্ব্বতী সতাই।
বিনি দোষে মার মোকে আমার দোষ নাই।।
আমি সহি এতেক অপমান তোর।
শঙ্করের অভিশাপ তাকে করি ডর।।
না বোল পার্ব্বতী মাগো মিছা আপদায়।
এই মিথ্যা অপবাদ কহিতে না জুয়ায়।।
না বোল সতীন মোকে না করিহ পাপ।
শিব মোর স্বামী নহে জন্মদাতা বাপ।।
দুর্গা বোলে মালঞ্চে করিলে নানা কেলি।

সঙ্কট দেখিয়া স্বামীকে বাপ বোল বালি।।
কোপিত হইয়া লাথি মারে ভদ্রকালী।
সমুখে লাগিল পদ্মার ভাঙ্গিল কাঁকালি।।
পদ্মাকে দেখিয়া দেবী ক্রোধে কম্পমানা।
অঙ্গুলের ঘায়ে তার চক্ষু কৈলা কানা।।’’[৫৫]
‘‘নিতি যায় তব সঙ্গে ক্রীড়ার অন্তর।।
যদি তুমি শঙ্করের ঝি খানি হইতা।
কি কারণে কন্যা তুমি আমারে লুকাইতা।।’’[৫৬]

মনসাকে চণ্ডী বেদম প্রহার করতে করতে ‘খণ্ড খণ্ড কৈল গাও’[৫৭] তাঁর ‘বুক নাড়িতে নারি ভারে।’[৫৮] এরপর চণ্ডী-

‘‘ধরিয়া দীঘল চুল মারে চণ্ডী উভা কিল
ভাবনী আমারে বধ।’’[৫৯]

আবার মার, মারতে মারতে মনসার দিকে আর তাকাবার জায়গা নেই, ক্রুদ্ধা চণ্ডী-

‘‘চুলে ধরি মনসারে মারে আর বারে।।
চণ্ডীর প্রহারে দেবীর শরীর জর্জর।
সহিতে না পারে পদ্মা বলে খরতর।।’’[৬০]

জীবনের পথে পা বাড়ানো থেকে শুরু করে পদ্মাবতী পুরুষ-সমাজের চিত্রটিকে সচক্ষে দেখেছেন। সমাজে নারীর যে হীনদশা তাকেও মনসা অনুধাবন করেছেন। পুরুষের চোখে নারীর মান-সম্ভ্রম বলে যে কিছুই নেই সে সম্পর্কেও জ্ঞানার্জন করেছেন। আসল কথা নারীর প্রতি পুরুষের মানসিকতা, নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং পুরুষ সমাজের চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ে মনসা তার পিতা মহাদেবের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করেছেন। এই জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মনসা বুঝেছেন, নিজের শক্তিতে নিজেকে টিকিয়ে রাখা ছাড়া অন্য কোন পন্থা নেই। এই শক্তিকে বলা চলে নারীদের সতীত্বের শক্তি। পথের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে বলা চলে পথকে চিনে আজ ঘরে ফেরার পালা। পথকে না চিনলে তো ঘরকে চেনা দুষ্কর। তাই মনসা পথ আর ঘরকে চিনে সামাজিক জ্ঞানে ঋদ্ধা। মনসা আজ সামাজিক জ্ঞানী। পথের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে ঘরে এলেন। এখানে পদ্মাকে দেখে মা চণ্ডী ক্রোধে পদ্মাকে মারতে আরম্ভ করে। পূর্ববঙ্গের কবি জানকীনাথ সমাজ জীবনের এই ছবিটিকে খুব সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন।

‘‘কুনুহাতে কিলমারে কুনু হাতে চড়ঃ
কুনু হাতে মটকিএ মারহে চাপড়।
কুনু হাতে টুকর মারএ ক্ষণে গালেঃ

কুনু হাতে ধরে চণ্ডী মনুসার চুলে।
দক্ষিণের চক্ষু হস্তে বড় কুপ মনেঃ
অঙ্গুলির অগ্রেহানে পৌদ্দার নয়নে।
চণ্ডীর প্রহারে পৌদ্দা সহিতে না পারেঃ
অচেতন হৈয়া পৌদ্দা পড়ে ভূমিতলে।[৬১]

তারপর চেতন পেয়ে-

বিষদৃষ্টে পৌদ্যবতি চণ্ডিরে চাইলাঃ
অচেতন হৈয়া চণ্ডি ভূমীতে পড়িলা।’’[৬২]

স্বয়ং কবি বিজয় গুপ্ত তাঁর কলমের ডগায় এভাবে পদ্মাকে প্রহার করতে দেখে কবি নিজে বলেছেন-

‘‘বিজয় গুপ্ত বলে সার- ‘‘পদ্মারে না মার আর,
প্রমাদ ফলিবে অবিচারে।।’’[৬৩]

ধূলি- ধূসরিত মানব-সংসারের মতে দেব-দেবীর তো ধৈর্যের একটা সীমা আছে। মনসার বেলায়ও আমরা তা দেখতে পেয়েছি। মনসার কিবা অপরাধ! মনসা তাঁর পিতৃ-মাতৃ সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় মহাদেবের সংসারে এসেছেন, সবার ভালোবাসা পেতে। কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব যে দুঃশ্চরিত্র, পর নারী সম্ভোগে তাঁর আসক্তি, তা তো মনসার জানা নেই। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর এহেন দশা আমরা প্রত্যেক কবি-সাহিত্যিকের কলমের খোঁচায় দেখতে পাই। অন্যান্য মঙ্গল-কবির মতো বিজয় গুপ্তের কাব্যেও এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না। অসহ্য যাতনা সহ্য করতে করতে যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, যখন তার আর কোন জায়গা থাকে না, তখন তো বাঁচার তাগিদে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করবে, এটাই স্বাভাবিক, মনসাও তাই করেছেন। এখানে মনসা যে কাজ করেছে তাঁকে কোনভাবে দোষের ভাগী করা যায় না। দেবী চণ্ডীর অকথ্য অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদিনী মনসা সচতুর বলা ভাল। মনসা বারবার চণ্ডীকে বলেছেন ‘বিনা অপরাধে সতাই কেন মার আমা।’[৬৪] এবং ‘অবিচারে মারে মোরে বড় লাগে ব্যথা।’[৬৫] মনসা বুদ্ধিমতীর মত চণ্ডীর সখী সুচরিতা, বসুমাতা, জয়া, বিজয়াকে সাক্ষী রেখে বলেছেন-

‘‘বাপ ঘরে আসিলে সবে কহিও সত্য কথা।

সুচরিতা, বসুমাতা, জয়া, বিজয়া।

সখী বুঝিও মোরে মারে মহামায়া।।

তোমরা সবে জানিও মোর নাহি অপরাধ।

মিছা মিছা কাজে চণ্ডী ঠেকায় প্রমাদ।।

মোর প্রাণরক্ষা হেতু নানা বুদ্ধি শিখি।
না বুঝিয়া মোরে মারে মোর দোষ কি।’’[৬৬]

এরপর মনসা নাগিনিরূপ ধারণ করে আকাশে ফণা তুলে দাঁড়ালেন। তাঁর দুই চোখ লাল টকটকে, সর্ব শরীর থেকে ‘বিষ পড়ে ফুটে ফুটে।’[৬৭] মনসা মনে মনে বলতে লাগে-

‘‘মনে মনে চিন্তে পদ্মা তক্ষকের মাতা।
আপন দোষে মরে চণ্ডী আরের কিবা কথা।।
অতি কোপে পদ্মাবতী করে ধড়ফড়।
চণ্ডীর হৃদয়ে দিল বজ্রের কামড়।।
পদ্মার কামড়ে চণ্ডীর প্রাণে লাগে ব্যথা।
‘‘উহু, উহু’’ করিয়া পড়ে কার্তিকের মাতা।।

***　***　***

বিষম পদ্মার বিষ কেবা হবে স্থির।
রক্তের সন্ধি পাইয়া বিষ যুড়িল শরীর।।
কোপে অন্তরীক্ষে পদ্মা রহিল নিকট।
কালবিষের জ্বালায় চণ্ডী করে ছট্‌ফট্।।
কাহার প্রাণে সহিতে পারে মনসার ঘা।
বিষের জ্বালায় চণ্ডিকার পোড়ে সর্ব গা।।
জ্বলন্ত অনলে যেন দগ্ধে শরীর।
ধড়ফড় করে চণ্ডী প্রাণ নহে স্থির।।’’[৬৮]

মনসার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে কোন দেব-দেবী এগিয়ে আসেননি। কিন্তু যখনই দেবী চণ্ডীকে মনসা আঘাত হেনেছে তখনই-

‘‘চণ্ডিকা ঢলিল হেন বুঝিল লক্ষণ।
আথেব্যথে ধাইয়া আসিল দেবগণ।।’’[৬৯]

এ হেন কর্মে আমাদের প্রশ্নের মুখে ছুঁড়ে দেয়। একালের মত সেকালেও জারজ সন্তানের কোন স্থান ছিল না সমাজে। চণ্ডীর প্রাণ যায় শুনে ‘ত্বরিত আইল দেব মহেশ্বর’[৭০]। চণ্ডীর প্রাণ যাবার উপক্রমে এবং ‘শুনিয়া দেখিতে আইল যতেক দেবতা।।’[৭১] চণ্ডীকার মৃত্যু সমাসন্ন দেখে ‘‘ভূমি আঁকড়িয়া শিব পড়িল ভূমিতে।।’’[৭২] এভাবে শিব ক্রন্দন করতে করতে পদ্মাকে ডাকতে থাকেন। পিতৃ বচন শুনে

পদ্মা মহাদেবের নিকটে আসে। মহাদেব বলেন আমার দোষে 'মরে চণ্ডী', এটা ঠিক কিন্তু তোমার অপযশ হতে দিতে পারিনা আমি। তাই-

''লোকের অপযশ ঘুচাও রাখহ সাধন।
চণ্ডিকা জীয়াইয়া তুমি তোষ দেবগণ।।
মোর বোল, পদ্মাবতি, না করিও আন।
একবার দেও তুমি চণ্ডীর প্রাণদান।।''[৭৩]

এরপর ব্রহ্মাও মনসাকে অনুরোধ করে বলতে লাগল-

''ব্রহ্মা বলে, ''পদ্মা, তুমি কামরূপে থাক।
জীয়ন্তে মার তুমি, মরা জীয়াইয়া রাখ।।''[৭৪]

সবার অনুরোধ শুনে পদ্মা বলতে লাগলেন-

''পদ্মাবতী বলে, ''বাপ, শুন দিয়া মন।
তোমার আগে কহি মোর দুঃখের কথন।।
তোমার দুহিতা হেন দিলাম পরিচয়।
তবু কোপে মারে চণ্ডী দারুণ-হৃদয়।।''[৭৫]

অপমানে লাঞ্ছনায় মনসা জর্জরিতা। পিতার বৈরাগ্যের আশঙ্কায়, পিতৃ ভক্ত মনসা পিতার অনুনয়ে সাড়া দিয়ে এবং দেবতাকুলের অভিশাপের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য মা চণ্ডীকে পুনর্জীবিত করে তুলেছেন-

''শুনিয়া বাপের বাণী বোলে দেবী ব্রহ্মাণী
অবধান কর মহাশয়।
তোমার যে আজ্ঞা পাই জিয়াইঞা পার্ব্বতী দেই
অন্য হইলে না জিয়াই নয়।।
সংসারের অধিকারী তুমি যাও দেশান্তরি
সৃষ্টি সকলে হইবে নাশ।
সকল দেবতা গণ বিষাদিত সর্বজন
অভিশাপে আমার তরাস।।''[৭৬]

বিপ্রদাসের কাব্য-মধ্যে আমরা দেখি মনসাকে মহাদেব চণ্ডীর ভয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় সিঁজুয়া পর্বতে রেখে এসেছেন।

''চলিল শঙ্কর পদ্মা প্রবেশে কাননে।
শ্রমযুক্ত হৈলা দেবী কানন ভ্রমনে।।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ব্যথিত ত্রিলোচন।
সিজুয়া পার্বতে হর হৈল উপসন্ন।।

*** *** ***

বসিল মনসা দেবী সিজ বৃক্ষতলে।
অবসন্ন মনসা শুইলা তরুমূলে।।
দক্ষিণা শীতল বহে মলয়া-পবন।
নিদ্রাযুতা পদ্মা হর ভাবে মনে মন।
ধীরে ধীরে মহাদেব মনসা এড়িয়া।
নিকটে দাঁড়াইয়া কান্দে ব্যথিত হইয়া।।''[৭৭]

মনসাকে আমরা কাব্য-মধ্যে দেখি নিজেরই শক্তি-বলে নিজেকে রক্ষা করেছেন। নিজের সতীত্বকে কোনভাবে বিসর্জন দিতে রাজী নন মনসা। পদ্মা আজ বিবাহিতা। সূর্য নামের মুনি দ্বারা আক্রান্তা মনসা। মনসা যখন স্নানে গেলেন তাঁকে দেখে মুনি সূর্য ''পৌদ্দারে দেখিয়া মনি মদনে পীড়িতা''[৭৮]- হয়ে বলেন ''আলিঙ্গন দিয়া মর খণ্ডায় সংশয়''[৭৯]। পদ্মাবতী বিনয়-মধুর বচনে জানান, তিনি ''পতিব্রতা সতী আমি অধর্ম না জানি''[৮০]। কিন্তু কামে মাতোয়ারা মুনি কোনো কথা শুনতে নারাজ। আজ পুরুষালি ভয় দেখিয়ে মনসাকে অভিশাপের ভয় দেখান মুনি- ''শাপদিয়া তুমারে করিব সর্বনাশ।''[৮১] বিবাহিতা মনসার এই সঙ্কটে নেতা নিজেকে বলি দিয়ে মনসার সতীত্ব রক্ষা করেছেন। তবুও মুনির অভিশাপ থেকে মনসাকে রক্ষা করতে পারেননি। পদ্মাবতীর ছদ্মবেশে নেতাকে পাঠিয়ে মুনিকে প্রতারিত করেছেন বলে মুনি অভিশাপ দেন-

''স্বামীর গৌরবে তুমি ত্যাগিলা আমাতেঃ
স্বামীএ তুমারে ছাড়ি যাউকা অনিমিত্যে।''[৮২]

এই অভিশাপের জন্য মনসার স্বামী ছেড়ে চলে গেছেন। মনসার স্বামী সঙ্গ-সুখ কপালে জোটেনি। বিয়ের রাতে স্বামী জরৎকারু মুনি মনসাকে শুধু ত্যাগ করে ক্ষান্ত হননি। মুনি দুয়ারী ধামেনাকে নিজ হস্তাক্ষরে দলিল স্বরূপ লিখিত পত্রের মাধ্যমে দান করে গেছে। এখানেও মনসা তাঁর নিজ-বুদ্ধিবলে নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে পেরেছেন। মনসা তাকে বলেছে যদি সে তাকে পারিজাত পুষ্প উপহার দিতে সমর্থ হয় তবেই মুনির অঙ্গীকার পালন করবে, না হলে নয়। কারণ মনসা ভালো ভাবেই জানেন এই সামান্য দুয়ারী কোনভাবেই পারিজাত সংগ্রহ করতে পারবে না।-

''ধামাই বলে কোথা যাও ওহে মুনিরাজ।
জামাতা হইয়া পলাও মুখি নাহি লাজ।।
চোরের মতন হইয়া যাও কি কারণ।

এখনে শিবেত আমি করি নিবেদন।।
তবে মুনি বলে ভয়ে হইয়া কম্পমান।
শুন ধামাই আমারে করয়ে পরিত্রাণ।।
নাহি কহিবা শিবস্থানে আমাকে চাইয়া।
তোমারে দিলাম পদ্মা পত্রেত লিখিয়া।।

*** *** ***

মুনি বলে পদ্মাসতী পতিব্রতা সার।
স্বামীর বচন কভু নারে লঙ্ঘিবার।।
আমার লিখন পদ্মাবতীর স্থানে দিবা।
পত্র পাইয়া পদ্মাবতী তোমারে ভজিবা।।''[৮৩]

এই জন্য কোন সমালোচক মনে করেন-

> ''সংগত কারণেই ধারণা করা যেতে পারে, বিয়ের রাতে তার এ অভাবনীয় পরিণতি পরবর্তীকালে বেহুলাকে বিয়ের রাতে স্বামীহারা করবার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করেছে। নিজ জীবনের সবচেয়ে বড় বঞ্চনার এ জ্বালা আরেক জ্বালা- আজন্ম বৈরি বিমাতার গঞ্জনার জ্বালা- এই উভয় জ্বালায় দগ্ধ কলঙ্কজনক হতভাগ্য ভাগ্যহত মনসা নিদারুণ মর্মাহত হয়েছে, কিন্তু মনসা এটাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়নি।''[৮৪]

মনসা তাঁর স্বীয় বুদ্ধিবলে অসীম কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। মনসা আজ ধরেছে মালিনী বেশ। মালিনীকে দেখে মুনি হয়েছেন মোহিত। শুধু মোহিত নয় মুনি মনসাকে চিনতে না পেরে গন্ধর্ব মতে আবার বিয়েও করেছে-

''বাছিয়া উত্তম কত গুটি পুষ্প নিয়া।
বিনা সুতে সাত ছড়া হার যে গাঁথিয়া।।
পুষ্পের পশার খানি বিছায় ত্রিপথে।
ঘোড়া আরোহিয়া মুনি যায় সেই পথে।।

*** *** ***

কামবাণ হানিলেক চিন্তিয়া বিষহরি।
কামেতে মোহিত মুনি বলে ধীরে করি।।

*** *** ***

মালুনী বলে মুনিবর গন্ধর্ব বিবাহ কর
তবে সে তোমার সঙ্গে যায়।

তবে মুনির কুমারে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে
শ্রী ষষ্ঠীবর কবি গায়।।''[৮৫]

মনসার মধ্যে পিতৃভক্তি সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। যখনই পিতার নামে কেউ কিছু বলেছে তখনই মনসা নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি। সে তাঁর মা-ই হোক কিংবা স্বামী-ই হোক, তাঁকে ছেড়ে কথা বলেনি। তাইতো বাসর রাতে যখন স্বামী তাঁকে 'ভাঙ্গরার বেটী।' বলে গালি দিয়েছে তখনও নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি। স্বামীকেও ছেড়ে দেয়নি মনসা। কারণ অনেক কষ্টে নিজের পিতাকে মনসা পেয়েছেন। তাই আবাল্য পিতৃ-সান্নিধ্য থেকে বিমুখা মনসা কোন প্রকারে পিতার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হতে চায়নি। তাই পিতার সম্বন্ধে যখন স্বামী জরৎকারু অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দিয়েছে তখনই মনসা-

''আর দেবের কন্যা হইলে কহিতে থুইতাম কথা।
দণ্ডের বাড়ি দিয়া তোর মুই ভাঙ্গিতাম মাথা।।

*** *** ***

ভাবিতে চিন্তিতে পদ্মা স্থির করে মন।
কোপে বিষ-পূর্ণিত হইল দুনয়ন।।
বিষ-নয়নে পদ্মাবতী মুনিরে নেহালে।
পদ্মার কোপে পোড়ে মুনি কালবিষের ঝালে।।
কোথায় জপ, কোথায় তপ, কোথায় বড়াই।
বল-বুদ্ধি নষ্ট হইল জ্ঞানমাত্র নাই।।
ছট্‌ফট্‌ করে মুনি কিছু নাহি মন।
অচেতন হইয়া পড়ে মুনির নন্দন।।
রক্ত-ফেনা উঠে মুখে কথা স্থির নহে।
বোলচাল কিছু নাই শ্বাসমাত্র বহে।।
শয্যার উপরে মুনি হইল মূর্ছিত।
কোপে রহিল পদ্মা ঘরের এক ভিত।।''[৮৬]

মনসামঙ্গলের প্রত্যেক কবিই মনসার কোমলতাকে নিয়ে ছেলে খেলা করেছেন। শুধুমাত্র তাঁর ক্রূর মূর্তিটিকে অঙ্কন করতে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এও ঠিক কবিদের কলমের ডগায় কখন যে কোমলতার ছোঁয়া এসে লেগেছে তাঁরা তা খেয়াল করেননি। করেননি বলেই মনসার হৃদয়ে মাতৃময়ী রূপের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করতে পারি। পিতৃ-আজ্ঞামন্ত্রী মনসা পিতার সম্পর্কে অশ্রাব্য কথা শুনেই

নিজের স্বামীকে ছেড়ে কথা বলেননি। পিতার অপমান মনসা সহ্য করতে পারেননি। তাই তার স্বামীকে মারতেও দ্বিধা করেননি। চণ্ডী বার বার করে বলেছেন-

‘‘চণ্ডী বলে, ‘‘মনসা, বার্তা কহ সারা।
তুমি সুখে বসি আছ, জামাই কেন মরা।।’’[৮৭]

চণ্ডী মনসাকে আদর করে ঘন ঘন জিজ্ঞাসা করেও যখন মনসার কোন উত্তর পেল না, তখন চণ্ডী মহাদেবের স্মরণাপন্ন হন। মহাদেব সংবাদ শোনা মাত্র ছট্‌ফট্‌ করতে করতে ‘‘ত্বরিত-গমনে আইলা পদ্মার নিকট।’’[৮৮] এর পর শিব বলতে লাগলেন-

‘‘আজ হৈল বিয়া না হইল বাসি রাতি।
এ নামে, পদ্মা, বড়ই অখ্যাতি।।’’[৮৯]

এবং

‘‘যে মৈল সেই মৈল আপন কর্ম্মদোষে।
তোমার কলঙ্ক লোকে কেন ঘোষে।।’’[৯০]

মনসা তখন পিতার কথায় বলেছেন, স্বামী কেমন করে মরেছে তা তার জানা নেই-

‘‘হেন কি তোমার মনে লয়।
নারী হইয়া আপন স্বামী খায়।।’’[৯১]

কিন্তু আমাকে এবং আমার পিতার সম্পর্কে যে কটু কথা বলবে তাকে তো ছেড়ে দিতে পারেন না। তাই স্বামী-

‘‘মোরে বলে, ‘‘তুই মোরে আনিয়া দে কুশা।।’’
কোপমনে মূর্ছিত মুনি হইল আপনি।
আমি ত না জানি কেমনে মৈল মুনি।।’’[৯২]

তখন মহাদেব হেসে বলেন-

‘‘তোমার প্রতাপ পদ্মা কে সহিতে পারে।।
মুই বুঝিলাম কার্যের হেন দশা।
শীঘ্র করি জীয়াইয়া দেওগো মনসা।।’’[৯৩]

পিতৃ-আজ্ঞাময়ী মনসা বাবার কথা শুনে স্বামীর নিকটে গিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে তুললেন। বেঁচে উঠে মুনি বললেন-

‘‘রাম, রাম।
পদ্মা হেন স্ত্রীতে মুনির নাহি কাম।।’’[৯৪]

এই সব দেখে ‘পদ্মা মুনির চরণ’[৯৫] ধরে কাকুতি-মিনতি করলে স্বামী তাকে অভিশাপ দেয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর দোষকে পুরুষ প্রাধান্য দিবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামী মুনিদেবের একবারের জন্যেও কি দয়া হল না মনসার জন্য। পদ্মার চরিত্রে মুনিবরের ভয় হচ্ছে। মনসার স্বামী তো মুনি তিনি তো পদ্মার চরিত্র-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাহলে আজ কেন তাকে ত্যাগ করছেন। মুনিবর যে অপরাধ করলেন, মনসাকে গালি দিলেন, মনসার পিতা মহাদেবকেও গালি দিতে ছাড়লেন না অথচ মুনিবরের কোন শাস্তির বিধান হল না কি পুরুষ বলে?

মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে আমরা মনসার দুটি স্বরূপের সন্ধান পাই। প্রথম দিকে মনসার অসহায়ত্ব এবং নারী জীবনের ব্যর্থতার ছবি আর দ্বিতীয় ধারায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার বাসনা। বিজয়গুপ্তের মনসা স্বামী জগৎকারুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। মনসা নিজেই তাঁর স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

“অকান্দনে কান্দনে কান্দেন মনসা।
প্রভু মোরে না জাইও ছাড়িয়া।। ধুয়া।।
আচলের নিধি   আহারে দারুণ বিধি
তখন আমি মরিব কান্দিয়া।
নিশ্চয় বুঝিলাম আমি   ছাড়িয়া যাইবা তুমি
চিন্তিত হৃদয় লাগে তাপ।।
করিয়া অনেক আশ   বিহা দিল তোমার পাশ
ত্রিদশ ঈশ্বর মোর বাপ।
পূর্ব্ব জন্মে কল্যাম পাপ   তে কারণে এত তাপ
প্রভু মোরে ছাড়িয়া জাও বোলে।।
চারিভিতে বাহে ঝড়   দেখি প্রাণে লাগে ডর
কি মতে বঞ্চিব স্বামী বিনে।।”[৯৬]

এখানে কবি মনসার হৃদয়ের সম্পর্ক এবং নারীর সামাজিক স্বীকৃতির উপর বেশী জোর দিয়েছেন। তাই তো পিতা মহাদেবও জগৎকারুর হাত ধরে কেঁদে বলেছেন-

“হাতে ধরি বলেন শিব শুন মুনিবর।।
পুত্র নাহি ঝি নাহি পোড়ে মোর হিয়া।
অতি দুঃখে জন্মিল পদ্মা আমার কন্যা হইয়া।।
বিবিধ নির্ব্বন্ধ আমি মনে মনে গণি।
এ জন্য হইল কন্যা তোমার ঘরণী।।”[৯৭]

মনসা যখন শুনেছেন যে তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেন তখন-ই এক অজানা ভবিষ্যতের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। তবে বিপ্রদাস পিপলাই, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল জানকী নাথের কাব্যে মনসা এতখানি আকুলা নন। বরং এ মনসা অনেক বেশী সচেতন। স্বামী পরিত্যাগ করে চলে গেলেও জীবনের বাকি দিনগুলি কীভাবে নিরাপদে বসবাস করা যায়, সে দিকে অনেক বেশী সজাগ। বিজয়গুপ্তের মত অন্য সকল কবিই জগৎকারুর কাছ থেকে পুত্রবর পাওয়ার জন্য মরিয়া। কারণ সন্তানবতী রমণীদের তৎকালীন সমাজ তেমনটি নিন্দার চোখে দেখে না এবং সমাজের লোভী পুরুষের লোভীদৃষ্টি তার উপর তেমনভাবে বর্তায় না। পিতা মহাদেব তাই বলেন, মনসা তুমি পুত্রবর চাও। কারণ পিতা তো জানেন এ সমাজ তাকে কলঙ্ক ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না, বরং বাকি জীবন যদি সুখে কাটাতে হয় তাহলে কন্যা নয় পুত্র বরই প্রয়োজন। তাই দেবাদিদেব মহেশ্বরের বচনের মধ্যে তৎকালীন সমাজে নারীর যে কোন মূল্য নেই তা ফুটে উঠেছে।

‘‘মুনির বচন শুনিয়া মহেশ্বর।
আমি বলি মনসা মাগহ পুত্রবর।।
কার্ত্তিক গণপতি নন্দী মহাকাল।
বর মাগো পদ্মাবতী নাহি বোলচাল।।’’[৯৮]

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে আমরা দেখি মনসা গর্ভবতী অবস্থায় থাকার ফলেও অতি অল্পতেই স্বামী পরিত্যাগের কথাকে স্মরণে আনেননি। তাই তো-

‘‘মাথে হাত দিয়া দেবী করয়ে ক্রন্দন। প্রাণনাথ ছাড়িল মোকে কিসের কারণ।।
কি দোষ করিলু আমি কেমন অকাজে। ছাড়িয়া গেলেন মুনি অরণ্যের মাঝে।।
কান্দিতে কান্দিতে পদ্মা ক্ষেমা দিল মনে। সান্ধায়া রহিল দেবী গহন কাননে।।’’[৯৯]

এভাবে গর্ভবতী অবস্থায় মনসা গহীন অরণ্যে একাকিনী থেকে যান। মনসা গাছের ফল খেয়ে জীবন ধারণ করেন। পরিধানে তাঁর ‘গাছের বাকল।’ বেশ দশ মাস পূর্ণ হওয়ার পর ‘চতুর্মুখ সুন্দর পুত্র ভূমিতে পড়িল।’[১০০] এবং দেবী ‘আস্তিক বলিয়া তার রাখিলেন নাম।’[১০১] পুত্রমুখ দর্শনের পর অল্প দিনের মধ্যে স্বামী জগৎকারুর কথা ভুলে গেলেন- ‘মনে মহা আনন্দিত দেখিয়া পুত্রের মুখ।’[১০২]

জানকীনাথের কাব্যে দেখা যায়-

‘‘কান্দে পৌদ্যা মনির সমখে
চরণে ধরিয়া বলে   লুটাএ ধরণী তলেঃ
বিষাদে কান্দএ অতি দুক্ষে।
সুখ ভুগ না করিলু   গৃহবাসে না বঞ্চিলুঃ
নাহি গেল মনের সন্তাপঃ

*** *** ***

মই বড় অভাগিনী ছাড়ি যায় শিরমনিঃ
কি মর পাবিষ্ট কর্ম্মদুষে।
পুত্র হৈতে অবিলাস জল পিন্ডের প্রতি আশঃ
চিন্ত মনি তাহার উপাএঃ
মনির চরণে ধরি কান্দে জয় বিষহরিঃ
পন্ডিত জানকীনাথে গাএ।’’[১০৩]

বিপ্রদাসের কাব্যে আমরা অন্য চিত্র দেখতে পাই। সৎ মা চণ্ডী ষড়যন্ত্র করে মনসাকে স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে দেয়নি। মনসা বলেছেন-

‘‘পুস্প-শয্যায় বসিয়া বিরসে।
কান্দিয়া নেতার প্রতি ভাষে।।
অঝর লোচনে জলঝরে।
উপহাস্য হৈল দেবপুরে।।
কান্দে দেবী নেতো হাথে ধরি।
ঋষি গেল থুয়্যা একেশ্বরী।।
মোর কর্মে কি নিখিল বিধি।
সতাই যে দিলেন কুবুদ্ধি।।
পরিনু নাগের অভরণ।
ডরাইল ঋষির নন্দন।।
সতাই হইল দুরবার।
দেবপুরে করিল খাঁখার।।
তাহে প্রবোধিব কি বলিয়া।
কেন ঋষি না গেন গোড়াইয়া।।
জন্মিয়া নহিল কিছু সুখ।
কতেক সহিব মনদুঃখ।।
মনসা কান্দয়ে উর্দ্ধশ্বাসে।
দ্বিজ বিপ্রদাস রস ভাষে।।’’[১০৪]

এইভাবে একেরপর এক অত্যাচারে নিজেকে স্থির রাখা দুস্কর। তাই বোধ হয়-

> ‘‘বস্তুতপক্ষে মনসার উপর দেবসমাজ, তার সৎ-মা যে ব্যবহার করেছেন, তাতে তাঁর চরিত্রে বেশ কিছু নেতিবাচক স্বভাব জন্মেছে বলে মনে হয়। তার প্রতিহিংসা গ্রহণের মানসিকতা, ষড়যন্ত্র করার ভাবনা হয়তো এই দুঃখপূর্ণ জীবন অভিজ্ঞতারই ফল। যে পিতা তাকে আশ্রয় দিলেন না, যে সৎ-মাতা তাকে নানাভাবে লাঞ্ছনা করেছেন- ষড়যন্ত্র করে স্বামীর সঙ্গে সংসার পর্যন্ত করতে দেননি, সেই পিতা ও মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল অভিজাত সমাজকে আঘাত করেই মনসা তার অস্তিত্ব জাহির করেছেন। এখানে মনসা নারী হিসেবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন- তার মধ্যে প্রতিভাত হয় মধ্যযুগের লাঞ্ছিতা সর্বরিক্তা এক নারীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী মানসিকতা, প্রত্যয় ও তার বিজয় অভিযান।’’[১০৫]

দেবাদিদেব মহাদেব মুনিকে বললেন-

‘‘হাত ধরিয়া কহে, ‘‘শুন, মহাজন।।
পুত্র নাহি, ঝি নাহি-পোড়ে মোর হিয়া।
অতি দুঃখে জন্মিল পদ্মা মোর কন্যা হইয়া।।’’[১০৬]

শিব আরো বললেন-

হাতে ধরি বলেন শিব, ‘‘শুন, মুনিবর।।
বিধির নির্বন্ধ আমি মনে মনে গণি।
এইজন্য হইল কন্যা তোমার ঘরণী।।
বিবাহ করিয়া তুমি না কৈলা পরশ।
তবে মন্দ হইলে তোমার অপযশ।।
তোমার ভার্যা হইয়া পদ্মা যাবে ছারে খারে।
অপরাধ ক্ষমা কর কি বল তাহারে।।’’[১০৭]

মনসার কাকুতি-মিনতিতে মুনির হৃদয় না গললেও মহাদেবের কথা শুনে মুনি বলেন-

‘‘মুনি বলে, ‘‘পদ্মাবতি, ঝাটে বর মাগ।।’’
আপনি বলেন মুনি, ‘‘শুন গো মনসা।
মন-সুখে মাগ বর যেবা তোমার আশা।।’’[১০৮]

মনসা ‘‘পুত্রবর, পুত্রবর’ বলে অষ্টবার।।’’ এবং স্বামী আজ তাকে ছেড়ে চলে যাবেন বলে একজন সাধারণ নারীর মত মনসা বলতে লাগলেন-

‘‘নিশ্চয় বুঝিলাম আমি ছাড়িয়া যাইবা তুমি
চিন্তিতে হৃদয়ে লাগে তাপ।

করিয়া অনেক আশ বিয়া দিলা তোমার পাশ
ত্রিদিব-ঈশ্বর মোর বাপ।।
পূর্বজন্মে করিলাম পাপ তে কারণে এত তাপ
প্রভু মোরে ছাড়িয়া যাও বনে।
মা ভাই কারে কব দৈবে মরণ হব
না জানি কি হইল এখনে।।
চারিভিতে বহে ঝড় দেখি প্রাণে লাগে ডর
কেমনে বঞ্চিব স্বামী বিনে।’’[১০৯]

নারীর দুঃখে তথা নিজের স্ত্রীর দুঃখে দুঃখিত না হয়ে মনসার স্বামী ‘‘পদ্মার বচনে হাসিলেন মুনি মহাশয়।’’[১১০] এর থেকে আর কি-ই বা আশা করা যায় পুরুষ শাসিত সমাজের কর্ণধারের কাছে। তিনি শুধু এই সান্ত্বনা দিয়ে বললেন-

‘‘নাগজাতি জন্মিবেক সহোদর অষ্ট ভাই।
তাহা হইতে হইবে তোমার বড় বড়াই।।’’[১১১]

এরপর মনসার ‘‘অষ্টপুত্র বলবন্ত দেবী বিষহরী।’’[১১২] হয়ে এবং ‘‘বাপের গৌরবে পদ্মার কারে নাহি ভয়।’’[১১৩] কিন্তু এখানেও বাধা হয়ে দাঁড়াল মা চণ্ডী। চণ্ডী শিবকে বলেছেন-

‘‘নাগজাতি কন্যা তব, মোর কন্যা নাই।
দুই পুত্র লইয়া আমি বাপের বাড়ী যাই।।
মোর সঙ্গে কেমনে থাকিবে পদ্মাবতী।
আপন প্রকৃতি-দোষে ছাড়ি গেল পতি।।’’[১১৪]

বিমাতা চণ্ডীর সঙ্গে সর্বদা কোন্দল করে মনসা, এই বলে শিবকে জানায় দেবী চণ্ডী। কিন্তু শিব তো জানেন তাঁর স্ত্রী কেমন। তাই শিব চণ্ডীকে বলেন-

‘‘তোমার হৃদয়ে নাহি দয়ামায়া।
মা নাহি,- পদ্মাবতী সতীনের ঝি।।’’[১১৫]

অতএব চণ্ডী-

‘‘আমি বলি মহামায়া না কর অন্যথা।
পদ্মার সঙ্গে বিসংবাদ না কর সর্বথা।।’’[১১৬]

মনসামঙ্গলের কবিগণ অতি সুচতুর ভাবে এখানে মানবিক গুণের সর্বাংশকে ঢেলে সাজিয়েছেন। মানবিকতার খাতিরেই চণ্ডী তাঁর সুখী গৃহকোনে মনসার আগমনকে ভালো চোখে দেখেননি। যে কোন নারীর মত চণ্ডীও ভর-যুবতী রূপবতী মনসাকে দেখে তেলে-বেগুণে জ্বলে

উঠেছে। চণ্ডী তো জানেন তাঁর স্বামী কুলীন। কুলীনের কৌলিণ্য রক্ষার জন্য যেকোন পিতা তাঁর কন্যাকে মৃত্যু পথযাত্রী কুলীন ব্রাহ্মণ-বরের কাছে কন্যা সম্প্রদান করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু তাঁর স্বামী মহাদেব তো সর্বগুণে গুণান্বিত। তাই আজ এই রূপসী কন্যা মনসাকে দেখে তাঁর মনে নানা ধরণের শঙ্কা আসা স্বাভাবিক। চণ্ডী তো জননী। তাই-

> ‘‘তাঁর সুখের সংসারে মনসার আগমনে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির আঁচ পেয়ে তাঁকে শাস্তি দিতে এবং তাঁর সৌন্দর্য নষ্ট করতেই মনে হয় একাজ করেছেন। চণ্ডীর এই নিষ্ঠুর কাজের পেছনে (নখ, জ্বলন্ত অঙ্গার, কুশ ইত্যাদি দিয়ে মনসার চোখ বিদ্ধ করা) আমাদের মনে হয়েছে বিগতা যৌবনা এক নারীর মনস্তত্ত্ব কাজ করেছিল। চণ্ডীর বয়স হয়েছে, মনসা ভরযুবতী তদুপরি সুন্দরী, চণ্ডীকে না জানিয়ে তাঁর স্বামী তাঁরই অগোচরে মনসাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। চণ্ডীর ভয় হয়েছে পাছে শিব যদি তাঁর প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে সেই ভরা-যৌবনাকে ঘরণী করে নেন। তাই মনসার চেহারার বিকৃতি ঘটিয়ে কদর্যদর্শনা করে শিবের কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়ার বাসনায় চণ্ডী হয়তো একাজ করেছেন।’’[১১৭]

তবে মনসার এ ধরণের কোন আশা বা বাসনা ছিল না। তাঁর একটাই অভিলাষ ছিল- চণ্ডীর স্বীকৃতি লাভ। এরই জন্য বোধ হয় মনসা নীরবে নিভৃতে চণ্ডীর যাতনা সহ্য করে চললেও একটা সময় প্রত্যাঘাত করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। মনসার বিষ নয়নে চণ্ডী ঢলে পড়েছেন। ভাই কার্ত্তিক-গণেশ, পিতা দেবাদিদেব সহ দেবতারা চণ্ডীকে বাঁচানোর জন্য মনসাকে কাকুতি-মিনতি করেন। শেষ পর্যন্ত পিতা শিবের কথায় মনসা মন্ত্র পড়ে মা-চণ্ডীকে জীবিত করেছেন। এর মধ্য দিয়ে মনসা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনিও প্রত্যাঘাতে সক্ষমা। মনসাও চণ্ডীর মত প্রতিহিংসাপরায়ণা। একই সংসারে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে রাখা ভালো নয় জানেন দেবাদিদেব মহাদেব। কিন্তু তিনি তো পিতা তাই সাময়িকভাবে তিনি ছিলেন নিশ্চুপ। চণ্ডী তো আর ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন, সপত্নী মনসাকে পাঠাতে হবে বনবাসে। আর যদি না পাঠাও তাহলে-

‘‘তবে যদি যাইতে না দেও, ত্রিপুরারি।
গৃহে অগ্নি দিয়া আমি যাব বাপের বাড়ী।।’’[১১৮]

বনবাসে যাওয়ার সময় মনসা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, যে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের কর্দযতার জন্য ঘরের গৃহিণীর কাছে যারপর নাই অকথ্য কথা শুনতে হয়। মনসা তাঁর পিতৃ-পরিচয়ের মাধ্যমে পিতার চরিত্র সম্বন্ধে কতকাংশে অবগত হয়েছেন। সৎ মায়ের যাতনা থেকে এবং মা চণ্ডীর আদেশকে শিরোধার্য করে মনসা বনবাসে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু মানবিক অধিকারবোধে পিতা মহাদেবের কাছে তাঁর যে আব্দার তাকে তো দূরে ঠেলে দেওয়া যায় না। তাই মনসা বারে বারে পিতার কাছে অনুযোগ করেছেন। মায়ের আচরণে মনসা মর্মহতা। এই মর্মহতা মনসার রূপটিকে

সকল কবিগণ খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। সেই অনুযোগ পেয়ে শিব স্ত্রী চণ্ডীর কাছে তাঁর আদেশ রদ করতে বললেও শিব হয়েছেন অপরাগ। তাই মনসাকে শিব চণ্ডীর কাছে অনুরোধ করতে বললে, মনসা পিতৃ-আজ্ঞাকে শিরোধার্য করে, পূর্বের সমস্ত ঘটনাকে ভুলে গিয়ে মাকে কাকুতি-মিনতি করলেও চণ্ডী তাঁর কথা থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেননি। যখন কোন কথাকে মা চণ্ডী কর্ণপাত করলেন না, তখন মনসা মাকে সুযোগ বুঝে প্রতিশোধের কথা বলে গেছেন। এই সমস্ত দেখার পর যেকোন স্বামীর মত শিবকে ব্রহ্মা বলেছেন, মায়ে ঝিয়ে দ্বন্দ্ব ভালো না, বরং-

‘‘এক ঘরে কাজ কিবা এক দেশে থাকে।
প্রমাদে পড়িবে তবু দেবী নাহি রাখে।।
আমি বলি তুমি কর কঠিন হৃদয়।
গৌরী-পদ্মার বসতি একত্রে সংশয়।।’’[১১৯]

আর-

‘‘মহাদেব বলে, ‘‘ব্রহ্মা,   এই বড় দস্যুকর্ম
দূরে গেলে মনে লাগে ব্যথা।’’
বিধাতা বিনয়ে কয়,   ‘‘পদ্মাবতী মনে লয়
বিদেশেতে রহিবে সর্বথা।।
দেবের বচন ধর   তাহার শোক পাশর-
যে দেশে গৌরীর না হয় দেখা।
হেন দেশে লইয়া যাই   এক দেশেতে নহে ঠাঁই
স্থান দিয়া সেই স্থানে রাখিবা।।’’
ভাবিতে চঞ্চল জীব   হৃদয়ে আকুল শিব
বিচারিয়া চাহে মনে মনে।
ভাবিয়া বিকট ঠেকে   অস্থির কন্যার শোকে
সানন্দে বিজয় গুপ্ত ভণে।।’’[১২০]

পিতৃ-হৃদয়ের কান্না-বারি অগোচরে থাকলেও পাঠক তা বুঝে নিতে বেশী সময় নেননি। পিতার কর্ম দোষে আজ মনসার এমন দশা। কিন্তু কপালের ফেরে শিবকেও কম কষ্ট পেতে হচ্ছে না। শিব বারবার চণ্ডীকে অনুনয়-বিনয় করলেও চণ্ডী তার জায়গা থেকে এক চুলও সরেননি। তাই চণ্ডীকে মহাদেব বলেছেন-

‘‘শিব বলে, ‘‘মহামায়া, বুঝিলাম আশ।
স্থির হও মনসারে দিব বনবাস।।’’[১২১]

যাক মনসাকে তখন শিব ডেকে বলেন- ‘‘বনবাসে দিব তোমা, চলহ সত্বর।’’[১২২] এই কথা পিতৃ মুখে শোনার পর পদ্মার ‘‘আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িলেক বুকে।।’’[১২৩] এ একেবারে স্বাভাবিক ঘটনা। যে কোন নারীর মত মনসার আজ দুঃখের অন্ত নাই। তার তো এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। একমাত্র ভরসা পিতা মহাদেব। কিন্তু সেই পিতা-

‘‘না জানি কি আছে ঘোর পাপিষ্ঠ কপালে।
বনবাস দিলা মোরে সৎমায়ের বোলে।।’’[১২৪]

মনসা পিতা শিবকে বলেছে, ‘আমি কন্যা একেশ্বরী’,[১২৫] আমার তো মা-ভাই কেউ নেই। আমি কেমন করে ‘বনবাসে একেশ্বর’[১২৬] হয়ে বাস করব। যদিও ‘‘মৃত্যু লাগি নাহি মোর দুখ।’’[১২৭] এরপর মনসা মা চণ্ডীর পায়ে পরে কান্না করেছেন। কিন্তু দেবী চণ্ডীর হৃদয়ে দরদ জাগাতে সক্ষম হননি। তাই বনবাসে যাবার সময় একজন সাধারণ নারীর মত মনসা কাঁদতে থাকলে শিব মনসাকে বলেছেন-

‘‘মহাদেব বলে, ‘‘পদ্মা, শুনহ বচন।
এমন মায়ের লাগি কান্দ কি কারণ।।’’[১২৮]

এর উত্তরে মনসা যে কথা বলেছেন, তার মধ্যে রয়েছে মা যে জগতের ধন, মায়ের তো পৃথিবীর কোন কিছু দিয়ে তুলনা হয় না-

‘‘পদ্মা বলে, ‘‘শুন বাপ, দেব ত্রিপুরারি।
পৃথিবীতে মাতা হন, জগত-ঈশ্বরী।।
মাতা যে পরম গুরু বেদশাস্ত্রে কয়।
মা সম সংসারে নাহি, শুন মহাশয়।।’’[১২৯]

এ কথা শোনার পর কেমন করে বলবেন, যে মনসা ছিলেন শঠতাময়ী, ক্রূরা, ছলনাময়ী! মনসার মধ্যে মায়ের কোমলময়ী রূপের পরিচয় আমরা লিপিবদ্ধ করলে কেউ বা যদি মনে করেন এটি বাড়বাড়ন্ত তাহলে তাঁদের প্রতি আমার সবিনয় অনুরোধ তাঁরা যেন মনসা মঙ্গল কাব্যখানিকে খুঁটিয়ে পড়েন। এরপর পিতা মহাদেব মনসাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন-

‘‘আমারে দেখিয়া, মাগো, ক্ষমা দেহ মন।।
বিলম্ব না কর মাতা চলহ সত্বর।
বনমধ্যে থাক গিয়া হৈয়া স্বতন্তরা।।’’[১৩০]

পিতৃ-আজ্ঞাময়ী মনসা একথা শোনারপর মন স্থির করে গৌরীর নিকটে গেছেন ধীরে ধীরে। মা গৌরীকে মনসা যে ভাবে কথা গুলো বলেছেন তার মধ্যে মনসার কোমলময়ী রূপের সন্ধান মেলে। এই বনগমনের আগে মনসা যা বলল তাতে তার সমস্ত পরিচয় ফুটে উঠেছে। মনসা ‘অযোনি-সম্ভবা’ জন্ম ‘পদ্মবনে’, ‘অধোভূমে পালন করিলা নাগগণে।’[১৩১] তারপর ‘তুলিয়া থুইলো, মাগো, তোমার

পুষ্পবনে।।'[১৩২] সেখানে 'বাপের সঙ্গে হইল পরিচয়।'[১৩৩] এবং 'বাপের সঙ্গে আসিলাম তোমার আলয়',[১৩৪] বাবা শুভক্ষণে তোমার সঙ্গে পরিচয় করে দিবে বলে আমাকে ঘরে রেখে 'গেল স্নান করিবারে।'[১৩৫] কিন্তু আমাকে তুমি না চিনে 'করিলা প্রহার।'[১৩৬] এরপর বাবা 'বাছিয়া সুন্দর বরে বাপে দিল বিয়া।'[১৩৭] এবং স্বামী 'দোষিয়া আমারে'[১৩৮] ছেড়ে চলে গেলেন। আবার সেই স্বামী মুনির 'বরেতে অষ্ট হইল নন্দন।'[১৩৯] তাদের সঙ্গে করে 'বাপ ক্ষীরোদ-মন্থন।'[১৪০] আর কী বলব মা-

''জনম-দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল।।
শীতল ভাবিয়া যদি পাষান লই কোলে।
পাষান আগুন হয় মোর কর্মফলে।।
কারে কি বলিব মোর নিজ কর্মফল।
দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল।।
ডাকিবার লক্ষ নাই, শুনগো, জননি।
বিধাতা করিল মোরে জনম-দুঃখিনী।।''[১৪১]

এভাবে মনসা তার দুঃখের কথা বলেছেন। মনসা আর বলতে লাগল 'অযোনি-সম্ভবা হৈয়ে জন্মেছি সুন্দর।'[১৪২] কিন্তু মা 'তোমার উদর ছাড়া কে জন্মিতে পারে।'[১৪৩] কারণ 'জগত-ঈশ্বরী তুমি দেবী মহামায়।'[১৪৪] অতএব মা তুমি আমার প্রতি নির্দয়া হও না। তুমি তো সব জানো-

''মায়ে ঝিয়ে বিসংবাদ কেবা নাহি করে।
ক্রোধ সংবরিয়া, মাগো, রাখহ আমারে।।''[১৪৫]

এই মনসার মধ্যে কোথাও ক্রূরাশীলা রমণীকে খোঁজা বিফল। এ নারী কোমলতায় আচ্ছন্না। এ মনসা মাতৃরূপময়ী। এর মধ্যে ভালবাসার অফুরন্ত ভান্ডার রয়েছে। মায়ে ঝিয়ের বিরোধের মধ্যে মনসাকে কোথাও ক্রূরা বা শঠতাময়ী হিসেবে লক্ষ্য করা যায় না। একেবারে আমাদের প্রত্যেক ঘরের মা-জননীর আদর্শ রূপ।

এত কিছু বলার পরও চণ্ডী মনসার দিকে ফিরেও তাকায় না। তাই মনসা তার মায়ের মনের আশা বুঝে গিয়ে 'বিদায় লইয়া, মাগো, যাই বনবাস।'[১৪৬] মাকে মনসা বলে 'জানিনু বড়ই তোমার নিষ্ঠুর শরীর।'[১৪৭] মা চণ্ডীকে প্রণাম করে আবার মনসা বলতে শুরু করেছে-

''শিব-ঠাঁই শুনি তুমি দয়াল প্রচুর।
এবে সে বুঝিলাম তব দয়া কতদূর।।
শুন মাতা, ভগবতি, পর্বত-দুহিতা।
পাষাণ তোমার কায়া জানিনু সর্বথা।।''[১৪৮]

মনসার পা চলে না, নয়নের জলে তার সর্ব শরীর ভিজে গিয়েছে। নাগরথে উঠে পড়ল মনসা, পিতা বৃষপৃষ্ঠে আরোহন করে ‘মনসা লইয়া গেলা জয়ন্তীনগর।’[১৪৯] সেখানে ‘গহন কানন’ দেখতে ‘ভয়ঙ্কর’ আর ‘তথায় থুইল পদ্মা দেব মহেশ্বর।’[১৫০] কিন্তু পিতৃ-হৃদয়, এই ভয়ঙ্কর গভীর বন-জঙ্গল যেখানে ‘সিংহ-ব্যাঘ্র চলে তথা দেখিতে বিপরীত।’ সেখানে ‘তুমি কন্যা একেশ্বর’ কীভাবে বাস করবে ভেবে কেঁদে ফেলেছেন। পিতা মহাদেব আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন-

“মা ভাই নাই কেহ   সেই দুঃখে দহে দেহ
আমা বিনা আর কেহ নাই।
আমি যে গৌরীর বশ   লোকে ঘোষে অপযশ
তোমা বনে পাঠাইলা সতাই।।
কারে কি করিব রোষ   তোমার কর্মের দোষ
আমি কিবা করিনু তোমারে।
দিয়া তোমা বনবাসে   কি মতে যাইব দেশে
এখন কি হইবে আমারে।।”[১৫১]

এত দুঃখ সহ্য করেও মনসা চণ্ডীর উদ্দেশ্যে বাবাকে বলেছে ‘সতাইরে না বলিও মন্দ।’[১৫২] একজন নারীর উপরে যে এত অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে, যার জন্যে আজ মনসা বনবাসী, যার জন্যে পিতার স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিতা সেই মা চণ্ডীকে মনসা একবারের জন্য গালি দিলেন না, বরং মনসা বলছেন ‘সকলি মোর কপাল-নির্বন্ধ।’[১৫৩] এ কথা শোনার পর সাধারণ মানব পিতার মত দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। তাই ‘নয়নের জলে ভিজে সকল শরীর।’ এই ‘নেত্রের জলেতে তখন জন্মিলেক নেতা।’[১৫৪] নেতাকে ‘দেখিয়া শিব হইল বিস্মিত।’[১৫৫] কারণ তাঁর আর সাধ নেই কন্যা সন্তানের, এক কন্যা মনসাকে নিয়ে ‘এতেক প্রমাদ’ হওয়ার ফলে যেকোন পিতার মত শিবও এই কথা বলেছেন। কিন্তু এই কন্যা নেতা পিতাকে বলেছে ‘কোন কর্মে করিবা নিয়োজিত।’ শোনার পর-

“মহাদেব বলে, “মাতা, কি বলিব আমি।
মনসার প্রিয়পাত্র হইয়া থাক তুমি।।”
মহাদেব বলেন, “মাতা না করিও ত্রাস।
একত্র হইয়া দোঁহে থাক বনবাস।।”[১৫৬]

মনসামঙ্গলের কবির কলমের স্পর্শে যে সুচারু চিত্রটিকে খুঁজে পেলাম তার মধ্যে দিয়ে আমরা তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার চিত্রের দলিলকে হাতের তালুর মত অনুধাবন করতে পেরেছি। মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়ার পাশাপাশি গঙ্গা এবং দুর্গার মধ্যে যে সতীন কলহ তাকেও দেখতে পেলাম। কিন্তু পদ্মা

বা মনসা তার নিজ শক্তি বলে নিজেকে রক্ষা করেছেন। মা চণ্ডীর ভয়ে পিতা আজ তাকে বনবাসে দিয়েছেন। জীবনের অভিজ্ঞতায় এই দ্বিতীয় ধাপে এসে মনসার যে জ্ঞানাহরণ হল তাকে এভাবে তুলে ধরতে পারি-

ক) কুলীন ব্রাহ্মণেরা বহুপত্নীর পতি হন।

খ) যে ঘরে সতীনের বাস সেখানে কলহ নিত্য সঙ্গী।

গ) এই ধরণের সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস বিন্দুমাত্র বিরাজ করে না।

ঘ) পতি-পত্নীর মধ্যে সন্দেহের বীজ সর্বদা লক্ষ্যনীয়।

ঙ) কুলীন নামক পুরুষেরা বাইরে চরিত্রহীন কিন্তু ঘরেতে স্ত্রীর ভয়ে ভেজা বেড়াল, স্ত্রৈণ।

চ) চরিত্রহীন পুরুষের জন্য সমাজে মনসার মত এরূপ হাজার-হাজার সন্তান জন্ম নেয়। আর তারা পিতা-মাতার স্নেহ-লালিত্য থেকে বিমুখ হন।

ছ) সমাজ-কর্তৃক এই সন্তানেরা জারজ-সন্তান নামে অভিহিত। এদের দায়-ভার সমাজ নিতে অপ্রস্তুত।

জ) এই সমাজে বসবাস করতে হলে পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

ঝ) সবশেষে মনসা বুঝলেন তার জন্যে বাপের ঘরে বিন্দু মাত্র ঠাঁই নেই।

এরপর মনসা সহৃদয় সামাজিক জীব মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখতে আর পারলেন না। মনসা যে মানবিক গুণে সমৃদ্ধা ছিলেন তাকে তিনি এক লহমায় দূরে ঝেড়ে ফেলে দিলেন। তারপর নেতার পরামর্শে বিশ্বকর্মা নিজে এসে জয়ন্তী নগরে 'কনক-রচিত হইল বনবাস-পুরী।'[১৫৭] এ পুরী আজ অমরাপুরীর থেকেও অধিক শোভায় শোভিত। বিশ্বকর্মাকে মনসা এরপর প্রতিশ্রুতি দিল এভাবে-

''পদ্মা বলে, ''বিশ্বকর্মা, বলি তোমার ঠাঁই।
আমার সাক্ষাতে তোমার কোন ভয় নাই।।
যদ্যপি তোমার শত্রু হয় কোন জন।
ততক্ষণে নাগে তারে বধিবে জীবন।।''[১৫৮]

জগজ্জীবনের কাব্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাই মনসা আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবতী নারী ও মা। কারণ মনসা জানেন যে তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের কন্যা হওয়ার ফলে মর্ত্যে তো তাঁর গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই রয়েছে।

''পদ্মা বোলে হও আমি শিবের নন্দিনী। আপনার মহিমা আমি আপনে না জানি।।
পুত্র লৈয়া যাই আমি নরলোক পাশ। মনুষ্য ভুবনে পূজা করি পরকাশ।।''[১৫৯]

কারণ মনসা জানেন বিবাহের সময় তাঁর পিতা মহাদেব তো বলেছিলেন-

‘‘করিয়া জয় জয় পদ্মার বিভা হয় ব্রাহ্মণে পঢ়য়ে মঙ্গল।।
ময়নাবতী গ্রাম দান দি সেই গ্রামআর ময়না ‘বড়ু’ রাজ্য।
বোলে দেব ত্রিপুরারি শুন বাছা বিষহরিমর্ত্যে পাইবে প্রজা সজ্জ।।’’[১৬০]

কিন্তু দৈবের বিধান তো মনসা খন্ডন করতে পারছেন না। সাধারণ মানবীর মত যারপর নাই তিনি একেরপর এক কষ্ট সহ্য করে চলেছেন। যেকোন মানবী নারী তথা মায়ের মত নিজ পুত্রের মুখে অন্ন দেবার জন্য নানা ধরনের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। কখন ছলা-কলার আশ্রয় নিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। কেনইবা করবেন না। নিজের ছেলে-পিলের মুখে অন্ন জোগার করার দায়িত্ব তো মা-বাবার। মনসার পুত্রদের বাবা তো তাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাই যেনতেন প্রকারণে পুত্রের মুখে অন্ন জুগিয়ে তোলাই তো আজ তার প্রধান লক্ষ্য। তা আজকের নারী হোক আর মনসামঙ্গলের মনসা হোক না কেন। মায়ের কর্তব্য পালনে মনসা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধা। আজ তাই এসে পৌছালেন মর্ত্য ভুবনে। মর্ত্যলোকে এসে ‘‘গাই চরাইয়া রাখাল’’[১৬১]-দের কাছে এক ফোটা দুধের জন্য তাদের জন্য কাকুতি মিনতি করেছেন। কিন্তু গ্রাম্য রাখালরা কেন দুধ দেবে? মনসাকে তো তারা কেউ চেনে না। যদিও বা চেনে তারা কেনই বা দেবে দুধ। যদি মনসার পুত্রের প্রতি দয়াবশত ভাবে দুধ দেওয়া হয় তাহলে তারা তো জানে বাড়িতে গেলে মা-বাপের বকুনি থেকে তাদের নিস্তার নেই। তাই প্রথমে তারা দুধ দিতে করে অস্বীকার। মনসা সরলা মেয়ে। এ ব্যাপারটা তো তাঁর নখ-দর্পনে। তবুও তাঁরই বা করার কী আছে-পাশে যে তাঁরই পুত্ররা ‘খিধায়’ কান্না করছে। মায়ের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। তবু লাজ-লজ্জা-ঘৃণা সব ভুলে গিয়ে আজ মনসা তাঁর ক্ষুধার্ত পুত্রের মুখে অন্ন দেবার জন্য রাখালদের কাছে নানা কাকুতি-মিনতি করে। রাখালদের কাছে তাঁর একমাত্র কাকুতি ছিল মনসার পুত্রের মুখে কিছু খাবার দেবার। কিন্তু বুদ্ধিমতী মনসা জানেন রাখাল বালকদের করার কিছু নেই। তাই তাদের প্রলোভন দেখান ‘‘তুমার বাপের পুন্যে’’[১৬২]-র জন্য কিছু দুগ্ধ পাওয়ার আকুতি জানান। রাখাল বালকেরা যখন তাঁর কথায় কোন কর্ণপাত করল না তখন বাধ্য হয়ে মনসা ছলনার আশ্রয় নিয়ে-

‘‘ক্রোধ হৈয়া বিষহরি চলিল ফিরিয়া। রাখালের যত গরু রাখিল লুকায়া।’’[১৬৩]

এরপর রাখাল বালকেরা কান্নাকাটি শুরু করে দিল। দেবী মনসা এবার বৃদ্ধা বেশে তাদের দিকে এগিয়ে এসে বলে ‘‘বুড়ি বোলে কেনে কান্দ যতেক রাখাল।’’[১৬৪] তখন রাখাল বালকেরা সমস্ত কথা ঐ বৃদ্ধা বেশী মনসাকে শোনালেন। এবার বৃদ্ধা বললেন ঐ ‘‘এক বেটি ব্রাহ্মণী’’ আর কেউ নন, তিনি হলেন ‘‘শঙ্কর-ঝিয়ারি’। সেই ‘‘শঙ্কর-ঝিয়ারি’’-র যদি পূজা কর তবে তোমরা তোমাদের হারিয়ে যাওয়া গরুর পাল খুঁজে পাবে। রাখালেরা বলে তারা তো পরের বাড়িতে রাখালিয়া কাজ করে। তাদের কাছে তো পূজা দেবার মত কোন দ্রব্যাদি নেই। এরপর

‘‘ বুড়ি বোলে কপোতের কর বলিদান। বনপুস্প দিয়া বাপু করহ পূজন।।’’[১৬৫]

বেশ সেই মত করে মনসার পূজা সমাপন করলে, দেবীর কৃপায় রাখাল বালকেরা তাদের হারিয়ে যাওয়া গরুর পাল ফিরে পায়। এখান থেকেই

‘‘প্রথমে হইল পদ্মার পূজার প্রবন্ধ।।’’[১৬৬]

বিজয় গুপ্তের কাব্যে আমরা দেখতে পাই দেবী মনসা স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে রাখাল বালক গণের কাছে নিজের পূজা চেয়েছেন।

‘‘অতএব এই দৈব হইল তোমার।
চিন্তা না করিয় ধেনু পাইবা আরবার।।
উপদেশ করি আমি স্থির কর মতি।
একমন চিত্তে পূজা কর বিষহরি।।
এতেক স্বপ্নে দেবী কহিয়া বিশেষ।
দিব্য রথে চড়ি গেলা আপনার দেশ।।’’[১৬৭]

আবার নারায়ণ দেবের কাব্যে দেখি দেবাদিদেব মহাদেবের নির্দেশ মত রাখাল বালকেরা পদ্মার পূজা দিয়েছে।

‘‘ গোয়ালের সিসুগণে ধেণু রাখে মাটে।
করন্ডিত থাকিয়া পদ্যা খির মাগে গোটে।।
সিসুগণে খির না দিল গোট মাঝে।
এক সিসু ঢলিল সেহি কাজে।।
গোঠেত বসিয়া কান্দে জত গোপনারি।
সিবে বোলে পুজা কর জয় বিসহরি।।’’[১৬৮]

বিপ্রদাসের মনসা বিজয় কাব্যে দেখি মনসা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বেশ ধারণ করে রাখাল বালকদের কাছে দুগ্ধ চায়। কিন্তু অবোধ রাখাল বালকেরা তাঁকে ‘রাক্ষসী ডাইনি’[১৬৯] বলে উপহাস করে। শুধু উপহাস নয় তারা-

‘‘কুবুদ্ধি রাখাল সভে বেড়ি মনসার।
কেহ হাতে ধরি টানে ধূলা দেয় গায়।।’’[১৭০]

মনসার এই রূপের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের দেবী অন্নদার জরতীবেশ ধারণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নানা কাকুতি-মিনতি করার পরও যখন তাকে এক ফোটা দুধ দিল না তখন মনসা

‘‘গগনে হইল বেলি তৃতীয় প্রহর।
জল পিতে গরু লৈয়া চলিল সত্বর।।

পদ্মার মায়ায় তথা নাবাল হইল।
জল পিতে সর্ব গরু নাবালে পড়িল।।
নড়িতে চড়িতে নারে দেখিল প্রমাদ।
সকল রাখাল কান্দে ভাবিয়া বিষাদ।।''[১৭১]

এরপর রাখালেরা মনসার পূজা সমাপন করলে দেবী মনসা সদয় হয়ে যে যা বর চেয়েছে তাকে তাই দিয়ে বললেন-

''শুন রে রাখাল সব আমার বচন।
শোক দুঃখ রোগ পীড়া নহিব কখন।।
জরা মৃত্যু আদি করি নাহি দুঃখ-লেশ।
সুখের নাহিক ওর আনন্দ বিশেষ।।
পুত্র-পৌত্রে ধনে জনে বাড়িবে আপার।
নাহিক সর্পের ভয় তোমা সভাকার।।
বর দিয়া বিষহরি বসাইলা গ্রাম।
থুইল রাখালগাছি নাম অনুপাম।।''[১৭২]

কেতকাদাসের কাব্যে দেখা যায়, দেবী মনসা মর্ত্যে পূজা পাবার আশায় নেতার কাছে নানা কাকুতি-মিনতি করছে। তারপর নেতার পরামর্শে পিতা মহাদেবের আশীবাদে এবং পিতৃ আজ্ঞাকে শিরোধার্য করে মনসা নরলোকে পূজার প্রচারে বেড়িয়েছেন। ছদ্মবেশী মনসাকে যখন রাখাল বালকেরা দুগ্ধ দিতে অস্বীকার করেছে অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের মত এখানে দেবী মনসা ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। রাখালদের গো-পালকে দেবী লুকিয়ে রেখেছেন। অবোধ শিশুর মত রাখাল বালকেরা যখন কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে তখন-

''রাখালের ক্রন্দন শুনিঞা। অবতরি রাখালেরে হৈলা বরদাতা।।
সেই বৃদ্ধবেশে দেবী ছিল লুকাইয়া। বালকের ক্রন্দনে দ্রবিল তার হিয়া।।''[১৭৩]

এরপর রাখাল বালকেরা দেবী মনসার পূজা দিলে দেবী রাখালদের বরদানে প্রীত করেন। গরুর পাল নিয়ে রাখালেরা ঘরে ফিরে তাদের মা-বাবাকে এই সমস্থ ঘটনার বিবরণ দিলে-

''শুনিয়া শিশুর মুখে পূজে নরনারী। পৃথিবীতে পূজা পায় শঙ্কর-ঝিয়ারি।
ব্রহ্মাণীর 'মহিমায়' গীত গাইল সপনে। পদ্মামুখী প্রাণনাথ জগতজীবন।।''[১৭৪]

মনসাকে বনবাসে পঠানোর পর দেবতারা সমুদ্রমন্থন করলেন। সেই মন্থনে উঠল বিষ, পান করলেন মহাদেব, আর শিব তারফলে হলেন নীলকণ্ঠ। শিব হয়ে পড়লেন অচৈতন্য। এই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত রূপ দেখে চণ্ডীসহ সকল দেবতারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। নারদের পরামর্শে শিবকে বাঁচানোর

উদ্দেশ্যে বনবাসী মনসাকে ফিরিয়ে আনার কথা বললেন। বিষহরণ করার একমাত্র ক্ষমতা রয়েছে মনসার। তাই বিতাড়িত মনসাকে চণ্ডী সাদরে ডেকে পাঠালেন। মনসা বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। আর এই ফেটে পড়াও স্বাভাবিক। কারণ মনসা তো কী নিদারুণ অপমান, যারপর নাই লাঞ্ছনা সহ্য করেছে, সে কথা তো এত সহজে ভুলে যেতে পারে না। তাই চণ্ডী বিপদে পড়ে যখন মনসাকে ডেকে পাঠিয়েছে তখন প্রতিশোধ গ্রহণ করার সংকল্পে দৃঢ়চেতা। পূর্বের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রথমে মনসা আসতে অসম্মত হয়েছেন।

‘‘কহিতে সে সব কথা বাড়ে শোকানল।
ভাল হৈল মৈল বাপ খাইয়া গরল।।
অঙ্গার-দহনে মোর চক্ষু কৈল কানি।
অবিরত দিবানিশি অই মনে গণি।।
আজি মনে প্রীত হৈল শুনি সমাচার।
এতদিনে চণ্ডীর টুটিল অহঙ্কার।।
হেমন্ত ঋষির বেটীর গর্ব্ব হৈল চূর্ণ।
মনসার মনোবাঞ্ছা হইল সম্পূর্ণ।।
বিষপানে মরিল মহেশ মোর বাপ।
চণ্ডিকা রণ্ডিকা হৈল ঘুচিল সন্তাপ।।’’[১৭৫]

বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখতে পাই মৃত শিবের দেহ সৎকার করার সময় চণ্ডী হয়েছেন সহমৃতা। মনসা সুযোগের সৎ ব্যবহার করে বলেছেন-

‘‘শিব সঙ্গে যাও মাতা না কর অন্যথা।
তবে বশ হইয়া চলিল জগতের মাতা।।
শিব সঙ্গে শ্মশানে শুইয়া ভগবতী।
তাহা দেখি আনন্দিত দেবী পদ্মাবতী।।
অগ্নি হাতে লইয়া পদ্মা আসিলা কৌতুকে।
শিবের মুখ এড়িয়া অগ্নি দিল দুর্গার মুখে।।’’[১৭৬]

চণ্ডী চিতার আগুনে ছটফট করছে, এবং চিতা থেকে উঠে দেবী চণ্ডী জলে ঝাঁপ দিলে মনসা আর নিজের হাসিকে চেপে রাখতে পারেনি। পূর্বের প্রতিশোধ স্পৃহায় পদ্মা খলখল করে হেসেছে।

‘‘অগ্নির তেজ দেবী সহিতে না পারে।
ঝাপ দিয়া পড়ে গিয়া জলের মাঝারে।।
খটখটী হাসে পদ্মা হাতে দিয়া তালি।
তাহা দেখি দেবগণ হাসে খলখলি।।’’[১৭৭]

এদিকে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের পদ্মা ছল করে জানিয়েছেন-

> ‘‘পদ্মা বলে এইরূপে বঞ্চি বন দূরে।
> বস্ত্রহীন কেমনে জাইব দেবপুরে।।
> একখানি বস্ত্র লৈয়া আইসেন সতাই।
> তবে বাপু জিয়াইতে আমি তথা জাই।।’’[১৭৮]

বিপাকে পড়েছে পদ্মা তাই মনসার কথা মত বস্ত্র আনতে সম্মত হন। কিন্তু ভালো বস্ত্র নয়-

> ‘‘হাত পাঁচ কাচা-খানি কাঁকতলে থুয়্যা।
> চলিল সত্বরে দেবী সখীগণ লৈয়া।।’’[১৭৯]

সেই বস্ত্র পরিধান করে মনসা দেব সভায় উপনীত হয়। চণ্ডীর দেওয়া বস্ত্র দেবতাদের দেখিয়ে চণ্ডীকে মনসা আরও বিব্রত করে তোলেন-

> ‘‘চণ্ডী-স্থানে সেই বস্ত্র লইল যত্ন করি।
>
> *** ***
>
> সতাই নিষ্ঠুর না থুইল দেবপুরে।
> পর্বতে অরণ্যবাসী করাইল মোরে।।
>
> *** *** ***
>
> দেখ দেখ অপরূপ সকল দেবতা।
> যত্নে এই বস্ত্র মোরে দান কৈল সতা।।’’[১৮০]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে আমরা একই চিত্র দেখতে পাই। কিন্তু সেখানে মনসা আর বেশী ছলনা করেছেন। নারদের কাছে মনসা বলেছেন মা চণ্ডী যেন তাকে একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্র দেয়, তবেই আমি দেব সভায় যেতে পারব। বেশ তাই হল ‘হাতেক অম্বর’ নিয়ে যখন নারদ এসেছেন তখন নারদ দেখেন মনসা দিব্য আভরণে সজ্জিতা হয়ে আছেন। এখানে নারদ হয়েছেন বিব্রত। এতেই আজ ক্ষান্ত নন মনসা। যে বিমাতা একদিন তাকে দীনহীনভাবে আশ্রয়চ্যুত করে বনবাসে পাঠিয়েছে আজ সেই বিমাতাকে শিক্ষা দেবার সময় এসেছে। তাই সঙ্কুচিত নারদ ‘ক্ষুদ্র অম্বর’ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলে মনসা বস্ত্রখণ্ড বের করার প্রয়াস করেন।

> ‘‘ তথা না যাইব কহে পাতাল কুমারী। হাথেক বসন আমি চিরকাল পরি।।
> এ বেশে কেমনে আমি সেইখানে যাই। এত দুঃখ দিল মোরে দারুণ সতাই।।
> বিষজালে মরিল মহেশ মোর বাপ। চণ্ডিকা রণ্ডিকা হৈল ঘুচিল সন্তাপ।।
> প্রাণ যাকু মনসা তথারে নাহি যাই। এই সমাচার গিয়া কহ প্রাণ-ভাই।।

*** *** ***

পাতাল কুমারী তথা সিজুয়া পর্ব্বতে। নানা অভরণে বেশ করে বিধিমতে।।
সাজন করিয়া বৈসে হেম-সিংহাসনে। হেনকালে নারদ আইলা সেইখানে।।
দেখিয়া দেবীর মূর্ত্তি মনে লাগে ডর। লজ্জায় লুকায় মুনি হাথেক অম্বর।।
এরূপ যৌবনবেশ ভুবন বিরাজে। হাথেক বসন লয়্যা দিব কোন্ লাজে।।
কক্ষতলে মহামুনি লুকায় বসন। মনসার কাছে গিয়া দিল দরশন।।
নারদেরে দেখি কহে ঈশানের ঝি। কক্ষতলে মহামুনি লুকাইলে কি।।’’[১৮১]

কেতকাদাসের কাব্যে চণ্ডী সহমৃতা হতে চাইলে মনসা ইচ্ছা করে ধাক্কা দিয়ে জ্বলন্ত চিতায় ফেলে পূর্বের মনস্তাপ খানিকটা মিটিয়ে নেন-

‘‘মনসা বলেন আমি জীয়াইব বাপ।
শোধিব পূর্ব্বের যত পাইল মনস্তাপ।।
চণ্ডিকা পুড়িতে যান জ্বলন্ত অনলে।
মনসা ঠেলিয়া তারে পেরে হেনকালে।।
অঙ্গার দহনে চণ্ডী মোরে কৈল অন্ধ।
শোধিব পূর্ব্বের দুখ দৈবের নির্ব্বন্ধ।।
মনেতে পাইল ভয় যত দিকপাল।
রহিল চণ্ডীর পিঠে চিহ্ন চিরকাল।।’’[১৮২]

সে যাই হোক দেবতাদের অনুরোধে এরপর মনসা দেবতাদের সামনে-

‘‘ধ্যান করি মনসা শিবের বিষ ঝাড়ে।
পদ্মার বিক্রমে সকলের প্রাণ ওড়ে।।
বিষ ঝাড়ে মনসা কপালে দিয়া চুম।
ভাঙ্গিল শিবের তবে সাপালক্ষের ঘুম।।
মরিয়াছিল শিব জিল আরবার।
ডাকিনী যোগিনী দিল জয়ে জোকার।।’’[১৮৩]

‘‘গরল হরিয়া নিল দেবী বিষহরি। চেতন হইয়া চান দেব ত্রিপুরারি।।
অবশেষে বিষ রহে শিবের গলায়। নীলকণ্ঠ নাম হৈল দেবের সভায়।।
হরিষে পাসরে শোক বীর হনুমান। বিষপানে প্রাণদান পাইল ঈশান।।
মহেশ কহেন শুন মনসা কুমারী। আজি হৈতে নাম তোর জয় বিষহরি।।
তুমি সে করিলে নাশ বিষের প্রতাপ। সংসারে রাখিলে যশ জীয়াইয়া বাপ।।

মনসার তরে কহে দেবতা সকল। সভে মেলি সমর্পিল তোমারে গরল।।
আজি হৈতে নাম তব বিষ-বিনোদিনী। গরল বাঁটিয়া দেহ যত নাগ ফণী।।''[১৮৪]

শিব বেঁচে উঠলেন। বেঁচে ওঠার পর শিব চর্তুদিকে চণ্ডীকে খুঁজছেন। কিন্তু চণ্ডীর দেখা না পেয়ে শিব কাঁদতে শুরু করেছেন। কন্যা মনসা পিতার রোদন দেখে একটু কৌতুকতা করলেন। এই কৌতুকতার মধ্যে যেমন রয়েছে মনসার প্রতিহিংসা পরায়নী রূপ তেমনি তৎকালীন সমাজ-মনস্কতার পরিচয়। শিবকে মনসা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কথা বলেছেন।-

''চেতন পাইয়া শিব চর্তুদিকে চায়।
না দেখিয়া দুর্গারে কান্দে দীর্ঘরায়ে।।
পদ্মাবতী বোলে বাপু কান্দ অকারণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া গৌরী[র] হইল মরণ।।
মরিয়া গেল বাপু তোমার বালাই লইয়া।
আর এক ঋষি কন্যা করাইব বিয়া।।''[১৮৫]

এই কথা শোনার পর মহাদেব ছেলেমানুষের মত আর বেশী করে কাঁদতে লাগলেন। পিতার এই কান্না দেখে পিতৃ ভক্তি পরায়না মনসা আবারও নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তাই-

''মহাদেবে বলে পদ্মা শুনহ বচন।
চণ্ডীরে না দেখি আমার না রহে জীবন।।
শিবের কান্দনে লজ্জিত বিষহরি।
চণ্ডীর চক্ষুত জল পড়িয়া দিল তরাতরি।।
পদ্মার মন্ত্রে চৈতন্য হইল দেবী গৌরী।
ইতিন ভুবনে উঠে জয়ে জয়ে করি।।''[১৮৬]

বিপ্রদাসের কাব্যে পাই তৎকালীন সমাজের সুচারু বর্ণনা। কুলীনেরা যে শত বিবাহ করতে পারে তার বিবরণ পাই এখানে-

''হর বলে কেন মাগো জিয়াইলা আমা।
কেমতে বঞ্চিব আমি যদি মৈল উমা।।
মনসা বলেন বাপু মনে দেহ ক্ষেমা।
আর একশত বিভা করাইব তোমা।।''[১৮৭]

''সকল দেবগণে পদ্মারে প্রণমিয়া।
যার যেই নিজ স্থানে গেলেন চলিয়া।।''[১৮৮]

এই ভাবে প্রথমবারের মত দেবসভায় নিজ শক্তির বলে মনসা তাঁর দেবীত্বের বোধ অনুধাবন করেছেন। দেবগণ মনসাকে প্রণাম করেছেন। আজ তাঁর মনে ক্ষমতা বিস্তারের স্পৃহা জেগেছে। কিন্তু দেবী মনসার তো দেবীত্ব এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই আজ দেবতাদের সামনে তাঁর দেবীত্ব আদায় করার ইচ্ছা প্রবল ভাবে জাগ্রত হয়েছে। কারণ অন্যান্য সকল দেব-দেবী মর্ত্যলোকে নিজেরা স্বমহিমায় ভাস্বর। আর আমি তো হরের নন্দিনী হয়ে অমর্যাদায় অস্বচ্ছলতায় কালাতিপাত করতে পারিনা। তাই আজ মনসার মনে বড় দুঃখ। মনসা তো নিজেই বলেছেন-

‘‘জগত মন্ডল মাঝে কেহ না আমারে পূজে
ভালমতে না জানে আমায়।
পিতা মোর পশুপতি চৌদ্দ ভুবন স্থিতি
চতুর্দ্দশ শিবের মহিমা।।

*** *** ***

চারি-দশ-লোক মাঝে সভাকার পূজা আছে
মোর পূজা নাহি দিল বিধি।।’’[১৮৯]

এদিকে জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্য মধ্যে পাই-

‘‘অরণ্যে রহিয়া পদ্মা ভাবে মনে দুঃখ।।
অন্যের ছাআল হৈলা দুগ্ধে ভাতে খায়।
আমার ছাআল কেনে খিধাএ লালায়।।
পদ্মা বোলে হঙ আমি শিবের নন্দিনী।
আপনার মহিমা আমি আপনে না জানি।।
পুত্র লৈয়া যাই আমি নরলোক-পাশ।
মনুষ্য ভুবনে পূজা করি পরকাশ।।’’[১৯০]

এবার মনসার জীবনের আরেক অধ্যায়ের সূচনা। বঞ্চিতা আশাহতা নারী মনসা পিতৃদেব শিবের কাছ থেকে মর্ত্যে পূজা প্রচারের আকাঙ্ক্ষা জানান। পিতার যোগ্য তনয়া হবার সাধ জাগে মনে।

‘‘কৈলাস নিবাস যথা দেব কৃত্তিবাস।
জনকের স্থানে দেবী করেন জিজ্ঞাসা।।
শুন বাপ পশুপতি নিবেদিব কি।
দেব মধ্যে হইল মনসা তোমার ঝি।।

*** *** ***

আমারে অচলবাস আল্যে বাপা।

নিষ্ঠুর হইলে আমা প্রতি নাহি কৃপা।।
মনসা-কুমারী আমি কান্দি মন-শোকে।
দেবতা বলিয়া মোরে না জানিল লোকে।।
কহ পৃথিবীতে মোর কে করিব পূজা।
আমি অপূজিত হৈলে তুমি পাবে লজ্জা।।’’[১৯১]

কিন্তু অন্যদিকে জানকীনাথের পদ্মপুরাণে পাই, নারদ এসে যখন শিবের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে সাগর পাড়ে যেতে মনসাকে কাকুতি-মিনতি করেছে, তখন কবি সুচতুরভাবে মনসার মধ্যে নিজ-শক্তি সামর্থ্য বিষয়ে আর বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন। এবং মনসা বলেছেন-

‘‘সমর্ম্ম জানিয়া পৌদ্দা দিড় করি হিয়া ঃ
মাথা ব্যথা হৈছে করি রহিছে শুইয়া।’’[১৯২]

এই ঘটনাকে আমরা মনসার আত্মোপলব্ধি বা আত্মশক্তির জাগরণ বলেই ব্যাখ্যা করব। মনসা তো বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজেকে সংযত রেখে এবং নিজ কার্য সিদ্ধির জন্য একজন বুদ্ধিমতী নারীর মত প্রথমে কিছুটা পিছুটান ধরেছেন। মনসা ঠিকই করেছেন। শেষ পর্যন্ত সাগরপাড়ে গিয়ে এতদিনের পুঞ্জিত ক্ষোভকে মিটিয়ে নিয়েছেন। বিলাপের ছলে প্রথমেই পদ্মা দেবতার সভায় তাঁর জন্মের বৈধতাকে স্বীকার করার জন্য তৎপর হয়েছেন-

‘‘মায় নাই ঝিএর বাপ ত্রিপুরারি।’’[১৯৩]

তারপর চণ্ডী তাকে সারা জীবন ধরে কু-ইঙ্গিত, গালাগালি, চক্ষু কানা করে পিত্রালয় থেকে বনবাসে পাঠিয়েছে- এ সব কিছুর উত্তর আজ সুদাসলে তুলোধনা করেছেন।

‘‘চণ্ডিকা সাতাই মর বাপের পরানঃ
তুমি কেন না চিন্তিছ স্বামীর কৈলান।
কি চাইয়া রহিছ আর ভাঙড়া শিবরেঃ
বাছিয়া উত্তম স্বামী করহ সত্তরে।
অনাথিনী হৈয়া বেড়াইম বনে ঝারেঃ
তর ডরে বাপে কৈন্যা বলিতে না পারে।
তবে কি করিবে অল ধাঙুড়ি সাতাইঃ
কুনুকালে তুর বাপ দারিদ্র্য দুষ নাই।’’[১৯৪]

আজ মনসা দেবতাদেরও ছাড়বার পাত্রী নন। দেবতাদের উদ্দেশ্যে-

‘‘সাগর মথিয়া রত্ন নিলা জনে জনেঃ
সকল বাটিলা বিষ না বাটিলা কেনে।’’[১৯৫]

মনসা আজ ‘তর্জন-গর্জন বাক্য বুলে’ পার্বতীসহ দেবতাদের মাথা হেঁট করে দিয়েছেন। চণ্ডী তো- ‘মাথা হেটে রহিয়াছে চক্ষের পড়ে পানি।’ আর দেবতারা- ‘স্তুতি বাক্য প্রবুদ বলএ দেবগণে।’ মনসা দেবতাদের স্বীকৃতি আদায় করেছেন দেবাদিদেব মহাদেবের কন্যা হিসেবে। কিন্তু পার্বতী যতক্ষণ মনসাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না ততক্ষণ কাউকে আজ নিস্তার দেবে না মনসা। বেগতিক দেখে ‘পার্বতী আসিয়া ধরে মনুসার রথে।’ এবং নিজ কর্মের জন্য মনসার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বলেন- ‘এতেকে আমার বাক্য না লইয় মনেঃ’ মনসাকে মেয়ে বলে স্বীকৃতি দিয়ে চণ্ডী বলেছেন-

“ঝিএ কি মায়ের দুষ লএ কুনুদিন।”[১৯৬]

এর ফলস্বরূপ মনসার জন্ম-কলঙ্ক দূরে গেল। পিতা মহাদেবকে বাঁচিয়ে তুললেন। শিব চৈতন্য পেলে দেবতারা ‘তুমি বিষহরি যুগনিদ্রা অবতার।’ বলে ‘ধন্য ধন্য পৌদ্দাবতী করিলা ঘোষণাঃ’ করলেন। অন্যদিকে মা চণ্ডী আজ বলতে লাগলেন-

“ধন্য ধন্য পৌদ্দাবতী পার্ব্বতীএ বুলেঃ
বিধবা লক্ষন মোর সধবা করিলে।
ধন্য ধন্য কৈণ্যা তুমি সঙ্কট তারিনীঃ
ইবুলিয়া লএ চণ্ডী মখের নিছনি।”[১৯৭]

এভাবে দেবী চণ্ডী এবং দেবতাদের কাছ থেকে মনসা তাঁর জন্মের এবং দেবীত্বের স্বীকৃতি আদায় করেছেন।

রাখাল বালকদের কাছে পূজা পাবার পর মনসার অভীপ্সা জাগে হাসান-হুসেন, জালু-মালুর কাছে পূজা পাবার। মনসামঙ্গলের কবিরা এক একজন এক এক ভাবে এই পূজা পাবার কাহিনিকে রচনা করেছেন। উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল তাঁর কাব্য মধ্যে রাখাল বালকদের কাছে পূজা পাবার পরই জালো-মালোর ঘরে দেবী মনসা গমন করেছেন। জালো-মালো যেখানে মাছ ধরতে ছিল সেখানে মনসা গিয়ে তাদের সঙ্গে আবার ছলনায় লিপ্ত হলেন। এই ছলনা আজ তাঁর স্বভাব সিদ্ধ। কারণ ছলনা ছাড়া যে এদের কাছ থেকে পূজা পাওয়া যাবে না, তাই প্রত্যেক দেব-দেবীর মত এবারও ছলনার আশ্রয় নিলেন। মনসা জালো-মালোকে বলতে লাগল-

“পদ্মা বোলে জালো মালো কথা শুন ভাই। খানি চারি মৎস্য বাছা শিশুর তরে চাই।।”[১৯৮]

জালো-মালো বলে আজ সাত দিন অতিক্রান্ত হতে চলেছে আমরা “সপ্ত দিনে না পাই মৎস্যের তলাস”[১৯৯] এরপর মনসা বলেন তারা যদি তার নাম করে জাল ফেলো দেখবে অনেক কিছু পাবে। সেই মত জালো মালো দেবীর নাম স্মরণে নিয়ে জাল ফেললে- “জালে করিয়া তুলিল সুবর্ণের ঝারি।।”[২০০] তারপর জালো মালো ‘সুবর্ণের ঝালি’ নিয়ে ঘরে গিয়ে নানা উপহারে দেবী মনসার পূজা করে এবং মনসার বরে জালো মালোর ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

বিপ্রদাস পিপলাইয়ের দেবী মনসা জালু মালুর কাছে পূজা পাওয়ার আশায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী বেশে আসে। দেবী বলেন তাকে নদী পার করে দিলে চম্পক নগরে যেতে পারে। কিন্তু জালু-মালু 'চাঁদোর পিতার কৃত্যো'র কথা বলে বারবার এড়িয়ে যায়। দেবী তো আজ ছাড়বার পাত্রী নন। তাই তাদের প্রলোভন দেখায় যে, তাকে যদি পার করে তবে তাদের কল্যাণ হবে, তাদের পিতৃ-পুরুষের কল্যাণ হবে এমনকি উপবাসী ব্রাহ্মণীকে পার করলে নারায়ণ সেবা হবে। কিন্তু তবুও জালু-মালু কোন কর্ণপাত করে না বরং বলতে লাগে-

''বিপরীত দেখি বুড়ি হিড়িম্বা ডাইনি।
মায়া পাতি রক্ত পিতে চাহসি বামনি।।''[২০১]

বারবার জাল ফেলতে লাগলেও যখন জালে মাছ ধরা পড়ছে না তখন তারা বলছে-

''মৎস্য নাহি পড়ে জালে তোমার কারণে।।''[২০২]

শেষে কোন গতি না দেখে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে বলে-

''আইস পার করি করি নায় উঠহ সত্বর।
তবে জালে মৎস্য পাব তোমা বরাবর।।''[২০৩]

দেবী এবার বলেন-

''কি হইবে মোরে পার করিলে এখনি।।
ভক্তি হৈয়া দুই ভাই না করিল হেলা।
কেরোয়াল দড়া লৈয়া জাল কৈল দোলা।।
কান্ধে করি দুই ভাই লৈল মনসায়।
গৌরব করিয়া সুখে বসাইল নায়।।
চরণে প্রণতি করি জাল ফেলে জলে।
তুলিতে না পারে এত মৎস্য পড়ে জালে।।
নৌকা ভরি মৎস্য জালু হরিষ আপার।।
মনসা বলেন জাল ফেল আরবার।
পদ্মার আজ্ঞায় পুন জাল ফেলে জলে।
মনসার স্বর্ণ বারি উঠে হেন কালে।।''[২০৪]

দেবীর কৃপায় জালু-মালু বাড়িতে স্বর্ণঘট এনে ভক্তি সহযোগে পূজা শুরু করে। দেবীর কৃপায় তাদের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়।

বিপ্রদাস পিপলাইয়ের ‘মনসা বিজয়’ কাব্যে দেখা যায় আগে হাসন-হুসেনের কাছে দেবী মনসা তাঁর পূজা আদায় করেছেন। নানা বাত-বিতন্ডা, ছলা-কলার আশ্রয় নেওয়ার পর হাসনের প্রতি দয়াবশত ভাবে দেবী মনসা বলেন-

‘‘ডাকিয়া বলেন শুন অবুধ হাসন।
আমি পদ্মাবতী তোরে কহি জে কথন।।
পূজহ মনসা-পদ একান্ত ভাবিয়া।
জেই বর চাহ সুখে পাবে হৃষ্ট হৈয়া।।’’[২০৫]

এরপর হাসন কেঁদে আকুল হয়ে ভাই হুসেনের প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছে। কিন্তু দেবী বলেন-

‘‘আমি জেইমতে বলি করহ পুজন।।
স্বর্ণবারি বিচিত্র নৈবিদ্য দশ ফল।
ভক্তিভাবে তুলসী কমল শতদল।।
মনসাকুমারী নামে পূজ একমনে।
এখনি জিয়াইয়া দিব জত পুরীজনে।।’’[২০৬]

বেশ দেবীর আদেশমত হাসন দেবী মনসার পূজা দিলে হাসনের প্রতি দেবীর ‘অধিক বাড়িল দয়া’ এবং দেবী হাসনকে বলতে লাগলেন-

‘‘ধন্য ধন্য ক্ষিতি মাঝে তুমি নৃপবরে।।
অচিরাতে রাজ্য কর নিজ মন-সুখে।
মোর বরে জরামৃত্যু নাহি শোক-দুখে।।
ছত্রিশ আশ্রম লৈয়া সুখে ভুঞ্জ রাজ্য।
প্রচার করিহ ক্ষিতি মোর পূজাকার্য্য।।’’[২০৭]

শুধু এতেই ক্ষান্ত হননি দেবী হাসনের ভক্তিতে দেবীর বিগলিত প্রাণ। দেবী এলেন আবার হাসনকে বর দিতে। তাই দেখি-

‘‘আপন কৃপায় যদি মোরে দিবে বর।
তব পদে ভক্তি অতি রহে নিরন্তর।।

হাসিয়া মনসা অতি হইয়া সদয়।
অধিক যাচএ বর আপন কৃপায়।।
দিনে দিনে বংশবৃদ্ধি হব চিরজীবী।
বাড়িব অমূল্য রত্ন রাজ্য ধন আদি।।
আয়ু যশ বৃদ্ধি হব ধর্ম্মে শুদ্ধমতি।
হেনমতি বর দিলা হাসনের প্রতি।।''[২০৮]

একদিন জালু মালুর দুই বধূ বিশাল বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে মনসা পূজা করলে, সনকা সেখানে উপস্থিত হয়ে বলে-

''সনকা বলেন শুন জালুর জননী।
কেমন দেবতা পূজা করিস আপনি।।
অদ্য অন্নশূন্য তুমি ছিলা এই স্থান।
এতেক বিভব হৈল কহ ত কারণ।।

***   ***   ***

জালুর জননী বলে সুনহ বচন।
ভকতি-প্রণতি পূজি মনসা-চরণ।।
সমুদ্র-সলিলে জালে উঠে দিব্য বারি।
তাহার প্রসাদে মোর স্বর্ণময় পুরী।।''[২০৯]

মনসার পূজায় উৎসাহী হয়ে সনকা ঘরে গিয়ে ছয় জন পুত্র বধূকে নিয়ে পূজা করতে শুরু করে। এমন সময় চাঁদ এ খবর পেয়ে তড়িৎ গতিতে সেখানে চলে আসে, আর রেগে গিয়ে হেতালের ঘাঁয়ে মনসার ঘট চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। দেবী মনসার সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত এখান থেকে।

বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখা যায় চাঁদ বণিকের স্ত্রী সনকা বাল্যকাল থেকেই দেবী মনসার চরম ভক্ত। বাল্যকাল থেকে মনসাকে সনকা পূজা করেন। কিন্তু বিবাহিতা জীবনে স্বামী চাঁদ সদাগর ছিলেন মনসার চরম বিরোধী। চাঁদ বাণিজ্যে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সনকা দেবী মনসার পূজা করার কথা বললে চাঁদ ভীষণ রেগে যান। মনসার ঘট ভেঙে তছনছ করে দেয়। শুরু হয়ে যায় চাঁদ আর মনসার বিবাদ। মনসার কোঁপে চাঁদের ছয় পুত্রের প্রাণ যায়। চাঁদ সদাগরকে ছলনা করার জন্য দেবী মনসা জালু-মালুর বাড়িতে উপস্থিত হন। দেবী মনসা জালুর মাকে বলেন-

''উঠ উঠ ঝালুর মা কত নিদ্রা জাও।
শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও।।
তোমার ঘরে দুখ আর দেখিতে না পারি।

তোমার ঘরে বর দিতে আসিছি বিষহরি।।
ঝালু মালুরে বোল জাল বাহিবার।
তবে সকল দুঃখ ঘোচিবে তোমার।।''[২১০]

বেশ দেবীর কথা মত ঝালু মালু-

''ভাঙ্গা জাল লইয়া তখন করিল গমন।।
জাল লইয়া তখন দুই ভাই চলে।
সুবর্ণের ঘট হইয়া পদ্মা নামে জলে।।''[২১১]

ঘট পেয়ে দুই ভাই ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। দেবী তখন-

''ঘট পাইয়া দুই ভাই ভয়ে পাইয়া মনে।
ঘটে থাকি পদ্মা কহে জালু মালুর স্থানে।।
শোনরে জালু মালু কথা শোন মোর।
শিবের কুমারী আমি ভয় নাহি তোর।।''[২১২]

বাড়িতে গিয়ে-

''জালুর মায়ে ঘট পাইয়া নিজ ঘরে ছাপাইয়া
পূজা করে দেবী বিষহরি।
জালুর মায়ের পুরী প্রত্যক্ষে দেবতা পুরী
পূজা করে সর্ব্বদা দেবী।।''[২১৩]

দেবী মনসা সনকাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন জালু-মালুর বাড়িতে যাওয়ার জন্য। খবর পেয়ে সনকা দেবীর আশীর্বাদ পাওয়ার আশায় জালু-মালুর ঘরে যায়। এবং দেবী বিষহরির পূজায় নিমগ্ন হলে মনসা সন্তুষ্ট হয়ে সনকাকে পুত্রবর দেন। পুত্রবর পেয়ে সনকা চম্পক নগরে ফিরে আসেন।

মনসামঙ্গল কাব্যের সকল কবিদের মত কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যেও মনসা একদিকে যেমন কঠিন অন্যদিকে কোমলতার ছোঁয়া রয়েছে। রাখাল বালকদের কাছ থেকে পূজা পাবার আগে পর্যন্ত মনসাকে আমরা দেখি তিনি কঠিন হৃদয়ের চেয়ে কোমল-হৃদয়ের অধিকারিণী। স্বার্থান্বেষী মানুষের মত মনসাও ব্যতিক্রমী নন। তিনি পূজা পাবার আশায় হাসন-হুসেনের কাছে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু হাসন-হুসেন তাঁকে অস্বীকার করলে দেবী মনসা রুষ্ট হন। এখানে তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার ছবি নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছেন কবি। হাসন-হুসেন শুধুমাত্র মনসা বিদ্বেষী নয়, বলা চলে তারা হিন্দু-বিদ্বেষী। হাসন-হুসেন দূতের মুখে 'হিঁদুয়ার' দেবী মনসার কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে। হিন্দু-বিদ্বেষীর পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন-

''যবনের পুরে আইল হিন্দুর দেবতা। হাসন হুসন দূত-মুখে শুনে কথা।।''[২১৪]

হাসন-হুসনের নির্দেশমত তারই দূত সাদ্যা এসে মনসার পূজা লন্ডভন্ড করে দিয়ে রাখাল বালকদের যারপর নাই শাস্তি দেয়। এখানে দেবী মনসার মধ্যেও জাত-পাতের দিকটি আমরা লক্ষ্য করি। যেমন-

“ আইল সকল ঠাটে: কচুয়াদহের তটে: যেখানে মনসা অবতার।।
যবন আইল তথা: মনে ভাবে বিশ্বমাতা: ছুঁইলে হইব বড় লাজ।
ছুঁইলে যবন জাতি: ভুবনে কুযশ খ্যাতি: অপযশ দেবতা-সমাজ।।”[২১৫]

একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িকতার বর্ণনা করেছেন তেমনি আবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা শোনা যায় কবির কলমে।

“কোরাণে কাজীর পাশ: শুন তার ইতিহাস: খোদায় জপন বড় ধন।
কেহ কহে ভগবান: কেহ কহে রহমান: কেবল একেলা সেইজন।।”[২১৬]

কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসার যে রূপের বর্ণনা দিয়েছেন তাতে কবির ভক্তি-বিগলিত প্রাণের পরিচয় ফুঁটে উঠে-

“পরিধান পীতবাস: মুখে মন্দ মৃদু হাস: মৃণাল জিনিঞা দুইপাণি।
চম্পক অঙ্গুলি মাঝে: উদয়ত দ্বিজরাজে: গজমহ বঙ্কিম চাহনি।।
কলাপী কলাপ জিনি: অভিনব ত্রিভঙ্গিনী: রূপের তুলনা দিব কি।
বিমোহন হংসরথে: দেখিলাঙ শূন্যপথে: বুঝি কোন্ দেবতার ঝি।।”[২১৭]

এরপর হাসন-হুসনেকে সাদ্যা বলে-

“শুনহ হাসন রায়: নিবেদি তোমার পায়: দেশে আইল হিন্দুয়ার ভূত।
তোমা দুই সহোদর: বুঝিয়া বিচার কর: কালযবনের পুরহুত।।”[২১৮]

সাদ্যার কাছে সমস্ত বিবরণ শোনার পর হাসন-হুসেন রেগে গিয়ে ‘হিন্দুয়ার ভূত’ মনসাকে যা-ইচ্ছে গালি পারতে থাকে। শুধু গালি পারা নয় দেবী মনসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হয়। দেবী মনসাও ছাড়বার পাত্রী নন। তাই দেবী মনসা নেমে পড়েন সংগ্রামে। হাসন-হুসেনকে নাস্তানুবাদ করার জন্যে দেবী ভীমরল এবং আলকুশী সৃষ্টি করে পীড়ন করতে চেয়েছেন। আবার দেবী নিজ কাজ সিদ্ধি করার জন্য অলৌকিক ক্ষমতারও আশ্রয় নিয়েছেন। হাসন-হুসেনকে জব্দ করার জন্য দেবী মনসা সর্প-স্মরণ করে বলেছেন-

“মনসা বলেন শুন বড় বড় সাপ। কোনজন ঘুচাইবে মোর মনস্তাপ।।
হাসনহাটিতে রাজা হাসন হুসেন। তার পুরী মজাইতে পার কোনজন।।
সেজন উঠাহ পান মোর বিদ্যমানে। যেজন খাইতে পার যতেক যবনে।।”[২১৯]

একথা শোনার পর কোন সাপই হাসনহাটিতে যেতে চাইল না। কারণ তারা একস্বরে বলে হাসন-হুসেনের ‘প্রতাপে কাঁপে এ তিন ভুবন।’ শেষ পর্যন্ত দেবী মনসা নিলেন নাগের স্মরণ। আর বললেন-

‘‘শুন অহিসুত: তুমি মোর পুত: তোমারে আশিস করি।
আমার আশয়: তুমি কর জয়: খাইয়া যবন-পুরী।।’’[২২০]

মনসা হাসনের পুরীনাশে উদ্যোগী হলেন। তারপর একে একে কোটালের প্রাণনাশ, বহু মুসলমানের জীবনহানি, তারপর বিশিষ্ট মুসলমানের মৃত্যু এবং কাজীর মৃত্যুর পর জোলা-জোলানীর মৃত্যু, শেখ ফকীরের মৃত্যু, নটিনী পটিদার প্রমুখের মৃত্যু, একে একে জীবজন্তুদের বিনাশের পর সাদিয়ার মৃত্যু হওয়ার পরে দেবী হাসনের পুরীনাশ করেছেন। তাতেই দেবী আজ ক্ষান্ত হলেন না। দেবী মনসা হাসন-হুসেনকে তাদের সাত পুরুষের ভিটা পর্যন্ত ত্যাগ করালেন। আজ মনসা হাসন-হুসেনকে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে নিরুদ্দেশে পাঠাতে ব্যস্ত। তাদের পিতৃ-পুরুষের ভিটে টুকু আঁকড়ে থাকতে দিল না। এমনকী দেবী মনসা মুসলমানদের ধর্মের পীঠস্থানকে ধূলিসাৎ করে মন্দির নির্মান করতে বলেছেন। অগত্যা তারা তাদের মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির নির্মান করে দিয়েছে। এখানে মনসাকে বড় বেশী নিষ্ঠুরা রূপে কবি অঙ্কন করেছেন। নিজ ধর্ম বিসর্জন দিয়ে তারা যখন সব ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছে নিরুদ্দেশর পথে তখন মনসা তাদের করেছে লাঞ্ছনা। গাঙ্গুর নদী পার হবার সময় মনসা মুসলমানদের নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন-

‘‘দেবীর আদেশে তবে কুম্ভীরিনী চলে। যবনেরা পার হয় গাঙ্গুরের জলে।।
কুম্ভীরিনী ধরে গিয়া কানাঘুড়ির পায়। ঝলকে ঝলকে দুইভাই জল খায়।।
কানাঘুড়ি বিবি বুড়ী ডুব্যা মরে জলে। খোদায় রসুল আল্লা দুইভাই বলে।।
মাথার বিচিত্র টোপ পেলিল ইজার। পার হৈতে নারে দোঁহে, নাজানে সাঁতার।।
হাসন হুসন দুঁহে খাইল চুবানি। হেনকালে দয়া তারে মানিল ব্রহ্মাণী।।’’[২২১]

শেষাব্দি যদিও হাসন-হুসেনকে দিয়ে মনসা তাঁর পূজা করাননি, তবুও তাদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছেন তাতে যেকোন সমাজের সাধারণ মানুষ ভীষণভাবে ভীত গ্রস্থ হয়ে পড়বে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নেত্রীও বলা চলে মনসাকে। এ মনসার ভিতর যেন দয়া মায়া নেই। না থাকারই কথা। আজ যে তার কার্যসিদ্ধি করতেই হবে। কারণ তাঁর নিজ পুত্রদের মুখে অন্ন দিতে না পেরে যেকোন মায়ের মত মনসা রেগে গিয়ে যারপর নাই কর্মকান্ড চালিয়েছেন। আবার পুত্র সমতুল্য রাখাল বালকদের উপর হাসন-হুসেনের নির্দেশে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। ফলস্বরূপ মনসা গোটা মুসলমান সমাজকে দেশত্যাগ করিয়েছে। যদিও সবই তাঁর পরিকল্পিত। কারণ সখী নেতার কথা

মত মনসা সব কাজ করেছেন। শেষ পর্যন্ত চাঁদবাণ্যার নগর চাম্পাইতে গোটা মুসলমান সমাজের স্থান হয়েছে। চাঁদ বেনে বলে-

''চাঁদবান্যা বলে তারে আমি ভাল জানি। বাপন-ভাতারী বেটি চ্যাঙ্গমুড়ি কানি।।
শুনি যবনের দুঃখ চাঁদ সদাগর। বসতি করিতে দিল পশ্চিম শহর।।''[২২২]

চাঁদ বণিকের কাছে আশ্রয় নেওয়ার পর এ কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই বণিকের কাছে মাথা নত করার মধ্যে একদিকে যেমন মনসা বিজয়ী হয়েছেন অন্যদিকে তৎকালীন হিন্দু সমাজের কিছুটা ইচ্ছাপূরণ ঘটেছে। তাই অনেকে এই কাহিনির সঙ্গে সহমত হয়ে বাহবা দিবেন কিন্তু এভাবে দুর্বলের উপর সবলের কষাঘাত কোন মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে ভীষণভাবে কষ্ট পান। যখন মনসা বলেন যে-

''হাসনের হাসনহাটি: সপ্ত পুরুষের মাটি: কাড়্যা নিল জগতী মঙ্গল।
ঘন ঘন জয়কার: খরতরি অবতার: নরলোকে দেই পুষ্পজল।।
হাসনহাটিতে অবতার।
দেবীরে নগর দিয়া: রাজা গেল পলাইয়া: লোক-মনে হৈল চমৎকার।।
চাম্পাই নগরে চল যাই।''[২২৩]

তখন আরও বেশী করে ভাবিয়ে তোলে সকলকে। এবার মনসা চলেছেন চাঁদ সদাগরের চম্পক নগরে। না জানি কী করবেন মনসা? যাক আমরা জানি এরপর শুরু হয় আমাদের সকলের অধিক পরিচিত চাঁদ বণিকের কাহিনি।

মনসা আজ অনেক বেশী সচেতনা। তিনি বুঝে গিয়েছেন কীভাবে ক্ষমতাকে আগলে রাখতে হয়। এমনকী কীভাবে ক্ষমতাকে করায়ত্ত করা যায় তার কৌশল আজ মনসার হাতের মুঠোয়। দেবাদিদেব কন্যা মনসা জানেন যে তাঁর পিতার বরে তো দেবতা, ঋষি, এবং মানুষের দ্বারা তিনি পূজিতা হবেন। তাই তো অন্ত্যজ-নিম্নবিত্ত মানুষের দ্বারা পূজিতা হয়ে এবার এসেছেন বণিকের অর্থাৎ উচ্চবিত্ত সমাজের কর্ণধার চাঁদ বণিকের ঘরে পূজা লাভের আশায়। সেকথা পরে হবে। কিন্তু দেবসমাজের কাছে তো পূজা পাই আগে। তাইতো দেবী মনসা বলেন-

''পিতা মহেশ্বর মোরে দিল হেন বর। করিব তোমার পূজা দেব ঋষি নর।।
আজি আমি নেহারিব অমরার পুরী। কেমতে দেবতাগণ পূজে বিষহরি।।
তথায় ছলিব আমি ইন্দ্রের কোঙর। দুই পুত্র পাঠাইব মর্ত্তের ভিতর।।
জন্মিব ধীবর-কূলে দুইভাই তারা। জালেতে উঠিব তার মনসার বারা।।''[২২৪]

দেবসমাজের সকল দেব-দেবী যেমন তাঁদের নিজ কূলের কাউকে দিয়ে পূজিত হবার জন্য নানা ধরণের ছলনা করে তাঁদের কাছে পূজা পেয়ে মর্ত্যে সাধারণ মানুষের কাছে পূজা পেয়েছেন এখানেও

দেবী মনসা তাঁর স্বকূলের দ্বারা পূজিতা হবার জন্য ছলনার ফাঁদ পাতলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যখন মনসার পূজা দেবার জন্য মনস্থির করেছেন তখন তাঁরই দুই পুত্র মালাধর ও পুরবরকে পাঠিয়েছেন ফুল তুলে আনতে। দেবী মনসা এই সুযোগকে হাত ছাড়া করেননি। তিনি তাঁর মায়া-বলে সমস্ত ফুল লুকিয়ে রেখেছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বলেছেন-

> ‘‘পুষ্প নাহি ফুটে আজি কুঁড়ি নাই ডালে। দেবী পাছে দ্বন্দ্ব করে শুধু হাথে গেলে।।’’[২২৫]

দুই ভাই স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে কোথাও কোন ফুল খুঁজে পেলেন না। এদিকে বিলম্ব দেখে দেবরাজ ইন্দ্র ভীষণভাবে রেগে যান। মনসা এই সুযোগের অপেক্ষায় রত ছিলেন। বেশ মনসাকে পূজা দিতে দেরী হওয়ায় দেবী মনসা ক্রুদ্ধা হয়ে ইন্দ্রকে বলেন-

> ‘‘মনসা বলেন তোর অহঙ্কার-হেতু। না পূজ আমার পদ, পূজ বৃষকেতু।।
> সেই বিশ্বনাথ মৈল খাইয়া গরল। আমারে করিল স্তুতি দেবতা সকল।।
> সেইকালে আসি আমি তার বিষ হরি। রক্ষা করি তোর তরে দিল সুরপুরী।
> এই হেতু আমারে পূজিতে কর হেলা। মালাধর পুরবর কোথাকারে গেলা।।
> মৎস্যধরা দেখ গিয়া সমুদ্রের কূলে। আমি উপবাসী আছি নাহি আন ফুলে।।’’[২২৬]

এরপর দেবী রেগে গিয়ে বলেন-

> ‘‘মোর তরে দেখাহ আপন সুরদম্ভ। মনসার পুষ্পতোলা করহ বিলম্ব।।
> মোর দাস হয়্যা তোরা জন্ম ভূমন্ডলে। ধীবর হইয়া আজি মৎস্য ধর জলে।।’’[২২৭]

মনসার অভিশাপে ইন্দ্রের দুই তনয় চাম্পাই নগরের নিবাসী ধীবর-ধীবরীর ঘরে জালু মালু নামে জন্ম গ্রহণ করে। একদিন চাঁদবান্যা তাদের আদেশ দেয় ‘শতভার মৎস্য’ দেবার। সেই আদেশ শিরোধার্য করে দুইভাই মাছ ধরতে যায়। কিন্তু মনসার ছলনায় জালু মালু মাছের কোন সন্ধান পায় না। কারণ ‘‘দেবীর মায়াতে মীন নাই উঠে আর।’’[২২৮] ছলনাময়ী মনসা জরতী ব্রাহ্মণী বেশ ধারণ করে জালু মালুকে ছলনা করতে এসেছে। জরতী ব্রাহ্মণী পার কর বলে জালু মালুকে ডাকছে। বারবার জালু মালুকে পার করার অনুরোধ করলেও তারা শুনছে না। জালু মালুকে বেশী কষ্ট দেননি কবি। দেবীকে নৌকায় চড়ানোর আগেই

> ‘‘দেখেন সকল রঙ্গ দেবী খরতর। উঠিল জালুর জালে মনসার বারা।।
> জালু বলে জালে কেন যবনের কোরা। শিশুমতি নাহি চিনে মনসার বারা।।
> মালু বলে কিছু হকু পেলে রাখ নায়। ঘরে নিঞা দুই ভান্ড দেখাইব মায়।।’’[২২৯]

এরপর দেবী দেখেন মৎস্য না পাওয়ার জন্য দুইভাই কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। তাই দেখে দেবী মনসা স্থির থাকতে পারলেন না। তাদের ডেকে বলতে লাগলেন-

"বুড়ী বলে জালু মালু না কান্দিহ আর। এখনি পাইবে দেখ মৎস্য শতভার।।
এত ভাগ্য বলে জালু মালু দুইভাই। নিঃশ্বাস ছাড়িয়া গেল ব্রাহ্মণীর ঠাঁই।।
বুড়ী বলে জালু মালু হেথা আইস বলি। শ্রবণে না শুনি বোল লাগিয়াছে তালি।।
ডাকিয়া কানের কাছে দুইভাই কয়। বুড়ী বলে শ্রবণে না শুনি অতিশয়।।
আমারে করহ পার তোরা দুইভাই। শতভার মৎস্য তবে পাবে একু ঠাঁই।।
বুড়ী বলে মীন না পাইলে শতভার। ঠেলিয়া পেলিহ জলে এই অঙ্গীকার।।"[২৩০]

সেই কথা মত জালু মালু জরতীবেশী দেবী মনসাকে নৌকায় চড়ায়। আর দেবীর দয়ায়-

"নিজ করে ডোর থুয়্যা: মাথা-জাল ঘুরাইয়া: পেলাইল গাঙ্গুরের নীরে।
শতভার সেইদিন: জালে বন্দী হৈল মীন: দুইভাই টানে ধীরে ধীরে।।"[২৩১]

শিশু জালু মালু দেবীর প্রদত্ত বারা না চিনতে পারলেও তাদের মা নিছনি ঠিক চিনতে পেরেছে। আর সেই বারাকে পূজা দেবার পর জালু-মালুকে দেবী অল্প সময়ের মধ্যে সুবর্ণ প্রাচীর গৃহ দান করেছেন। একদিন সনকা দাসীদের নিয়ে জালু-মালুর বাড়ির পাশ দিয়ে স্নান করতে যাওয়ার সময় জালু-মালুর বিপুল ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হয়ে বলেছে-

"সঙ্গে লয়্যা ঝাউআ দাসী সনকাসুন্দরী। স্নান করিবারে যায় হাথে হেমঝারি।।
সনকা বান্যানী যদি হইল বাহির। জালুমালুর বাটী দেখে সুবর্ণ প্রাচীর।।
আকস্মাৎ কোন্ রাজা তুলিল আওয়াস। কোথাকারে গেল দুটি জালু মালু দাস।।"[২৩২]

তারপর সনকা নিছনির কাছে সমস্ত কিছু শোনারপর স্বামীকে না জানিয়ে দেবী মনসার পূজায় মগ্ন হয়েছে। চাঁদবান্যার ভৃত্য নাড়ার কাছে একথা শোনার পর চাঁদ তেলে-বেগুনে জ্বলে গিয়ে দেখে সনকা সত্য সত্যই মনসার 'পূজেন বারি:'। সনকা জানে স্বামী সদাগর রেগে গেলে পাষন্ডের মত আচরণ করে। তাই "সনকা পলায়্যা গেল ডরে।"[২৩৩] আর চাঁদ সদাগর-

"সাধু কৈল সর্ব্বনাশ: বুড়াকালে বুদ্ধিনাশ: বাড়ি মারে বারার উপরে।।
সাধুর সহিত হটে: মনসা না ছিল ঘটে: তেঞি মারে হেন্তালের বাড়ি।
সাধু কোপে কম্পমান: বারা হৈল চারিখান: ভূমে যায় খোলা গড়াগড়ি।।
কান্ধে হেন্তালের বাড়ি: সদাগর তাড়াতাড়ি: বুলে ঘর সনকারে চায়্যা।
কেতকাদাসেতে কয়: সনকা পাইল ভয়: পড়সী আশ্রমে গেল ধায়্যা।।"[২৩৪]

প্রতিটি মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা যায় দেবী মনসা দুইবার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়েছেন। একবার দেবী চণ্ডীর সঙ্গে আর দ্বিতীয়বার চাঁদ সদাগরের সঙ্গে। প্রথমবার চণ্ডীর কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলস্বরূপ বনবাস জীবনকে মাথা পেতে নিয়েছেন দেবী মনসা। যদিও পিতৃ আজ্ঞাময়ী মনসা পিতার মধ্যস্থতায় এই বনবাস জীবনকে শিরোধার্য করে নিয়েছেন। এবার চাঁদ

সদাগরের সঙ্গে তাঁর চরম বিরোধ। এই চাঁদের সঙ্গে প্রবল বিরোধীতায় দেবাদিদেব মহাদেব কোনরূপ মধ্যস্থতা করেননি। চাঁদ হলেন পরম শৈব ভক্ত। এই শৈব ভক্ত চাঁদের কাছ থেকে যদি পূজা মনসা নিতে পারেন তাহলে মনসা জানেন মর্ত্যে তাঁর পূজা প্রচার হবেই। এরজন্য মনসা চাঁদের উপর একের পর এক অন্যায় কাজ করতে কোন কুণ্ঠা বোধ করেননি। তাই তো মনসা প্রথমে তাঁর ছয় ছয়টি পুত্রকে করেছেন নিধন। তারপর বাণিজ্যপাটনের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছেন, নটীবেশ ধারণ করে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করেছেন, বাসর ঘরে কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দরকে হত্যা করতে পিছুপা হননি ইত্যাদি নানা ঘটনার মধ্যে মনসার নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতার পরিচয় মেলে।

প্রত্যেক কবিদের মধ্যে চাঁদের ছয় পুত্রকে নিধন করতে দেবী মনসা নানা ছলা-কলার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বাইশ কবির মনসামঙ্গলে দেখা বিজয় গুপ্ত চাঁদের ছয়পুত্রকে নিধন করার জন্য দেবী পান্তা ভাতের মধ্যে বিষ দিয়ে এসেছেন। কারণ মা সনকার কাছে ছয়পুত্র আবদার করেছে পান্তা ভাত খাবার। সেই মত সনকা ছয় পুত্রের জন্য পান্তা ভাত রান্না করে রেখেছে।

‘‘হাস-পরিহাস করে সবে হরষিতে।
যতনে ভাত-ব্যঞ্জন থুইল হাঁড়িতে।।’’[২৩৫]

দেবী মনসা আজ ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি আজ যেন তেন প্রকারেণে তাঁর কাজ হাসিল করবেনই। কারণ হিসেবে মনসা বলেন-

‘‘নিদ্রা যায় ভাই সব হইয়া আনন্দিত।
তোলাপাড় করে হেথা মনসার চিত।।
সাত দন্ড অন্ধকার রজনী যে ঘোর।
মনে মনে চিন্তে পদ্মা ‘‘এই বেলা মোর।।
নগরের পূজা ভাঙ্গে, মোরে গালি দেয়।
লক্ষ লক্ষ নাগ মোর মারি করিল ক্ষয়।।
তার ডরে মোর নাগ উত্তরে না যায়।
অপমান করে নিত্য কত সহে গায়।।’’[২৩৬]

মনসা আজ দৃঢ় সংবদ্ধা, চাঁদের ছয় পুত্রকে নাশ করবেই। তাঁকে একেরপর এক যেভাবে হেনস্থা করেছে, করেছে অপমান তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সনকার ‘‘যতনে ভাত-ব্যঞ্জন থুইল হাঁড়িতে।।’’[২৩৭] সেই ভাতে আজ তাঁর বিষ ঢালবেই। আগামীকাল মায়ের হাতে যত্নে রাঁধা পান্তা খাবে ছয় ভাই। মনসার আদেশ মত-

‘‘নিদ্রায় পড়িয়া সব কেহ নাহি জাগে।
মায়ারূপ চান্দর ঘরে যাও অষ্টনাগে।।

সাত-পাঁচ করি দুঃখ না ভাবিও চিতে।
ভাতের মধ্যে বিষ দিয়া আসিও ত্বরিতে।।
পান্তা ভাত খাইতে সব পুত্রের অভিলাষ।
না জানিয়া খাইলে ভাত প্রাণ হবে নাশ।।’’[২৩৮]

চাঁদের ছয় পুত্র ভাতের সাথে বিষ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষ রক্তে মিশে যায়। আর তারা বলতে লাগে-

‘‘কেহ বলে, ‘‘আমার বড় জ্বলে গেল গাও।’’
কেহ বলে, ‘‘নিদ্রা আসে, মুখে নাহি রাও।।’’
কেহ বলে, ‘‘কি খাইলাম কিছু ভাল নইল।’’
কেহ বলে, ‘‘বিষ-ভাতে পদ্মা প্রাণ লইল।।’’
কেহ বলে, ‘‘নিদ্রা আসে, মুখে নাহি বাণী।’’
ক্ষেপিল কালকূট বিষ হারাইলাম পরাণী।।’’[২৩৯]

আজ চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রের প্রাণ চলে যাচ্ছে দেখেও চাঁদের কিছু করার নেই। কারণ আমরা জানি তাঁর আগে মনসার মোহময়ী রূপের কাছে পাগল-হারা হয়ে চাঁদ কামানলের আগুনে জ্বলে যাবার উপক্রমের সময় দেবী তার মহাজ্ঞান হরণ করেছেন। আজ তাই চাঁদ দেখে-

‘‘কলা গাছ ভাঙ্গি যেন পড়ে ঠাঁই ঠাঁই।
‘‘পুত্র পুত্র’’ বলি সোনা কান্দে পরিত্রাহি।।
ছয় পুত্র মৈল সোনার মনে বড় দুঃখ।
পুত্র কোলে করি কান্দে হাতে হানে বুক।।’’[২৪০]

বিজয় গুপ্তের মনসা নৃত্য পটিয়সী। এঁ মনসা অন্যান্য কবিদের মনসা থেকে আলাদা। এঁ শুধু নৃত্যে সাবলীলা কিন্তু ছলা-কলার ধার ধারে না।

‘‘একদিন পদ্মাবতী করিল পরিপাটি।
মহাজ্ঞান হরিতে কপটে হইল নটী।।’’[২৪১]

নেতার পরামর্শ মত চাঁদের গামছা হরণ করতে দেবী মনসা চললেন তাঁর মহাজ্ঞান হরণ করতে তথা চাঁদের গামছা হরণ করতে। পদ্মা আজ চাঁদের কামানলকে জাগ্রত করতে দিয়েছে পাড়ি। তাই তাঁর নিজস্ব আভরণ খুঁলে রেখে-

‘‘গলায় তুলিয়া দিল পারিজাতের মালা।
কোন কালে নাহি দেখি এমত রূপ বালা।।’’[২৪২]

এবং দেবী মনসা নৃত্যে পটিয়সী বলে আজ-

''নটী রূপে পদ্মা গেলা চান্দর নগর।
সুললিত নাচে গায়ে অতি মনোহর।।''[২৪৩]

এই নৃত্য গীতে মন-মোহিনী মনসার জালে জড়িয়ে পড়লেন চাঁদ সদাগর। বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখা যায়-

''গীত শুনিয়া চান্দর মজিলেক মন।
নটীর দিগে চান্দে চাহে ঘন ঘন।।
নিল প্রাণ চিকন কালিয়া।। ধুয়া।।
একদিষ্টে চান্দ নটীর দিগে চায়।
কামবাণেত ঠাকুর প্রাণ পুড়িয়া জায়।।''[২৪৪]

চাঁদ সদাগর ছলনাময়ী নটী মনসার নাচে পাগল-হারা হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে চতুরা মনসা সদা সচেতনা হয়ে নিজ কার্য্য সিদ্ধি করার জন্য বলেছেন-

''নটী কহে তবে শোন মহাশয়।
যেমন কহো তেমত করিব নিশ্চয়।।

*** ***

কিন্তু এক নিবেদন শোন নরপতি।
স্নান করিলে থাকিতে পার আমার সংহতি।।
গামছা নাহিক মোর এই বাক্য ধর।
এ বুঝিয়া মহারাজা মোরে আজ্ঞা কর।।''[২৪৫]

কিন্তু-

''লাজ ভয় নাহি সাধুর মদনে বিকল।
মনে মনে হাসে নেতা সাধিলুম সকল।।
ধন্য ধন্য পদ্মাবতী চিন্তিল উপায়।
হেন পদ্মবতী হইবেন অবশ্য সহায়।।''[২৪৬]

যিনি তাঁর কার্য্যসিদ্ধির জন্য এহেন কপটতার আশ্রয় নিতে পারেন তিনি তো তাঁর সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়ে নিজের কার্যের জন্য সমাজ গর্হিত কাজ করতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করবেন না। মনসার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মনসা আজ চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করতে তৎপর হয়েছেন। করেছেনও। তারপর মনসা-

‘‘কামবন্দে চান্দো বানিয়ার পোড়ে মন।
গুনের গামছা চান্দো দিল ততক্ষণ।।
গামছা পাইয়া পদ্মা হরষিত হইল।
ততক্ষণে পদ্মাবতী উঠিয়া লড় দিল।।’’[২৪৭]

নটিনী মনসা ছলা-কলায় ভীষণভাবে পারদর্শিনী। প্রেমিকের প্রেমের বহ্নিজ্বালা জ্বালাতে পারঙ্গম। একালের মত তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় আমরা বারাঙ্গনাদের পরিচয় পাই। মনসা বারাঙ্গনা হয়ে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করেছে। এর ফলে চাঁদের চরিত্রকে সমাজের চোখে করেছে কলুষিত। মনসা প্রতিশোধ পরায়নী নারী। মনসাকে চাঁদ যেভাবে একেরপর এক মানসিক-শারীরিক লাঞ্ছনা করেছে তাই আজ মনসা চাঁদকে সমাজের সকল মানুষের সামনে মান-সম্মান সমস্ত ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। এখানে মনসাকে হিংস্ররূপী। মনসা আজ চাঁদকে যেমন কর্ম তেমন ফলের সাজা দিয়েছে। আর লাথি মেরে চাঁদের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে।

‘‘লাথি মারিল পদ্মা চান্দের বদনে।
দন্ত ভাঙ্গা গেল চান্দের ফিরিল তখনে।।
ভাল পলাইলি কানি মোরে দিয়া গালি।
এ কথা শুনিয়া পদ্মা হাসে খলখলি।।’’[২৪৮]

এরপর মনসা সঙ্কুরে করে নিধন। সঙ্কুরে নিধন করার পর চাঁদের ছয় পুত্রকে নাশ করেছে। বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখা যায় মনসা গোয়ালিনী বেশে সদাগরের বাড়িতে দধি বিক্রি করতে এসেছে। ছয় ভাইয়ের লোভ জাগে দধি খাবার জন্য। কিন্তু সনকা বুদ্ধিমতী নারী তাই ছয় পুত্রকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে-

‘‘দধি লবা দধি লবা বলে গোয়ালিনী।
দধি দেখি ছয়ে কুমার করে কানাকানি।।
তাহা দেখি বলে সোনাই শোন বিবরণ।
তোমরা না জান বাপু এহার কারণ।।
মনসার সঙ্গে তোমার বাপের বিসম্বাদ।

*** ***

তাহা শুনি ছয়ে কুমার কান্দিতে লাগিল।।’’[২৪৯]

মায়ের কাছে আব্দার করে দই খাবে বলে। গোয়ালিনীর কাছ থেকে দই কিনে ছয় ভাইকে দেয়। এই দধি খেয়ে-

‘‘অন্ন খাইতে বসিল ভাই ছয় জন।
সমপূর্ণ ভোজন তবে [করে] পুত্র ছয় জন।।
হরিষে সোনকা [দেবি] দধি আনি দিল।
দধি খাইয়া ছয় কুমার ঢলিয়া পড়িল।।
কেহ বলে আছে আছে কেহ বলে নাই।
পুত্র পুত্র বলি তবে কান্দেন সোনাই।।’’[২৫০]

বিপ্রদাস পিপলাইয়ের কাব্যে দেখা যায়- চাঁদের কাছে মনসা পূজা চাইতে গেলেন। কিন্তু পূজা তো দূরের কথা, চাঁদ নানা অশ্রাব্য গালি দিয়ে হেতালের বাড়ি নিয়ে মনসাকে মারার জন্য তাড়া করেছে। মনসা রেগে গিয়ে চাঁদের ‘নাখরাবন’ করলেন ধ্বংস। মহাজ্ঞানের শক্তিতে সেটিকে চাঁদ বাঁচিয়ে তুলেছে। মনসা এবার নেতার পরামর্শ মত চাঁদের শ্যালিকা রূপ ধরে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করতে চললেন। শ্যালিকারূপী মনসার রূপে নিজেকে চাঁদ সংবরণ করতে না পেরে বলেছে-

‘‘পদ্মার মায়ায় চাঁদো মোহে কামবাণে।
সনকারে জিজ্ঞাসে এ কন্যা কোন জনে।।
সনকা বলেন এই আমার ভগিনী।
স্বামী এড়ি পলাইল আইল একাকিনী।।
মুনিমন-মোহন মনসা অঙ্গভঙ্গ।
কাতর নৃপতি অতি বাড়িল তরঙ্গ।।
নিবারিতে নারে মন হইল অস্থির।
পাগল হইল রাজা আইল বাহির।।’’[২৫১]

চাঁদ নিজেকে আজ কোনভাবে কামের বহ্নিজ্বালায় স্থির রাখতে পারছে না। মনসাকে আলিঙ্গনের জন্য কাকুতি-মিনতি করছে। আর মনসা সুচতুরা নারীর মত চাঁদের মহাজ্ঞানের মর্মকথা শুনে-

‘‘তবে পদ্মা হাসিয়া সাধেন নিজ কাজ।
কেমনে আঁচল দেখি দেহ মহারাজ।।
কুবুদ্ধিয়া নৃপতি আঁচল দিল হাথে।
শীঘ্র জটা ছিঁড়ি পদ্মা ভর কৈলা রথে।।’’[২৫২]

এভাবে পদ্মা চাঁদোর মহাজ্ঞান হরণ করে নিজ কার্য সিদ্ধি করে চললেন।

মনসা ধনা-মনাকে হত্যা করে চাঁদোর ‘নাখরাবন’ ধ্বংস করলেন। অহঙ্কারী ধন্বন্তরিকে বধ করেছেন। তারপর নেতার পরামর্শে চাঁদের ছয় পুত্রকে নাশ করতে মনসা দৃঢ় সংবদ্ধ হয়ে কাল নাগিনীকে পাঠিয়েছেন। কাল নাগিনীর বিষ অন্ন খেয়ে-

‘‘কিছু অন্ন খায় মাত্র ছয় সহোদর।
জিব্‌ভা আড়াইল অন্ন না জায় উদর।।
অন্ন তেজি ছয় ভাই ভাবয়ে বিষাদ।
দেখিতে দেখিতে ভাই পড়িল প্রমাদ।।
বচন না আইসে মুখে ঘোর দুই আখি।
গরল ভক্ষিনু ভাই হেন প্রায় দেখি।।’’[২৫৩]

বিষ-অন্ন খেয়ে ছয় ভাই ক্রন্দন শুরু করলে সনকা পুত্রদের ক্রন্দন রোল শুনে ছুটে এসে-

‘‘পুত্র পুত্র বলি রানী ডাকে ঘনে ঘন।
জননী চাহিয়া সভে করেন ক্রন্দন।।’’[২৫৪]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে দেবী মনসা তাঁর আত্ম-প্রশস্তিতে সদা তৎপর যা অন্যান্য দেব-দেবীর মত। মনে পড়ে জালু-মালুর কিছু সংলাপ-

‘‘মনসা বলেন: জালু মালু দুইজন: কি করিবে চাঁদ সদাগর।
তোরা মোর দুই দাস: চিরকাল দুঃখ পাস: দয়া-মনে দিতে আইনু বর।।
এই কথা শুন সার: দুঃখ না পাইবে আর: আর না ধরিতে যাহ মীন।
মনের মানস যত: পূরাইব মনোমত: আজি হৈতে সম্পদের চিন।।’’[২৫৫]

শুধু দুই ভাইকে নয় এরপর মনসা জালু-মালুর মা নিছনিকে বলেছেন-

‘‘হ্যাদে গ জালুর মা: বর মাগ্যা লহ বা: যেবা আছে তোর নিজ মনে।
চাম্পাই নগরে মোর: পূজার প্রকাশ কর: উন্নতি বাড়িব দিনে দিনে।।
দেবীর ঈষত হাসি: তুমি মোর ব্রতদাসী: আজি হৈতে প্রাণ হেন মানি।
রণে বনে মহাঘোরে: নিস্তার করিব তোরে: শুন হ্যাদে জালুর জননী।।
বলে দেবী খরতরা: স্বপুরী সহিত তোরা: মনসার মন্ত্রে হঅ দীক্ষা।।’’[২৫৬]

এখানে মনসা তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য নিজের গুণ-কীর্তন নিজেই করেছেন। প্রকারন্তে ভক্ত-বাৎসল্য সন্তানদের অনেকাংশে ভীত করে তুলেছেন। এ মনসা আজ সর্বস্ব দিয়ে নিজের পূজা পাবার আশায় ব্রতী হয়েছেন। চাম্পাই নগরের নগরপতিকে মনসা বধ করবে বলেছেন। এই বলার মধ্যে রয়েছে সমাজের নিচু তলার বাসিন্দাকে ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে পূজা আদায় করা। এখানে মনসা সর্বাংশে স্বার্থান্বেষী। নিজ স্বার্থকে চরিতার্থ করতে এমন কোন কাজ নেই যা মনসা করেননি। এখানে ক্ষমতাকে করায়ত্ব করাই মনসার একমাত্র কাম্য।

দেবী বিষহরি চাঁদকে বশীভূত করার জন্য তাঁর মহাজ্ঞান হরণ করতে চলেছেন নটীবেশ ধারণ করে। ভাবতে অবাক লাগে নিজ কার্য সিদ্ধি করার জন্য দেব-দেবীরা যে পথকে বেছে নিয়েছেন তো

আজকের সাধারণ নর-নারীরা সেই পথের পথিক হয় তবে দোষের কী? কারণ আমাদের দেব-দেবীই তো সেই পথের পথিক। নেতার পরামর্শ মত মনসা আজ নটীবেশ ধারণ করেছেন। নটীবেশী মনসা নিজের কর্যোদ্ধার করার জন্য সমাজের চোখে যা গর্হিত কাজ তাও করেছেন। সখী নেতার উপদেশকে মাথায় তুলে নিয়ে চলেছেন মনসা-

‘‘তোমার পূজার হেতু উপদেশ আছে। কহিতে সঙ্কোচ বাসি দুঃখ লাগে পাছে।।
মনসা বলেন কিবা সঙ্কোচ তোমার। আপনার পূজা আমি করিব প্রচার।।
নেত বলে মহাজ্ঞান জানে সদাগর। তাহারে ছলিতে তুমি হঅ কলন্দর।।
নটিনী হইয়া কর মহাজ্ঞান চুরি। রচিল কেতকাদাস সেবিয়া ঈশ্বরী।।’’[২৫৭]

মনসার সবচেয়ে বড় খেদ, চাঁদ সদাগর তাঁকে যেন-তেন-প্রকারেণে বারবার হেনস্থা করে চলেছে। তাকে চরম শাস্তি আজ মনসা দেবেই। তাই সমাজ-গর্হিত কাজেও আজ তাঁর কোন কুণ্ঠা নেই। সমাজ তাঁকে কীভাবে দেখল তাতে তাঁর যায় আসে না। মনসা চাঁদ সদাগরকে উচিত শিক্ষা দেবে বলে ঠিক করেছেন। মনসার নটিনী বেশ ধারণ করার মূলে রয়েছে-

‘‘এই মতে বিপরীত: মনে চিন্তে হিতাহিত: কেত বলে গ বহিনী।
রাত্রিদিনে সদাগর: মোরে কহে কটুত্তর: গালি দেই চেঙ্গমুড়ি কানি।।’’[২৫৮]

এবার মনসা লাস্যময়ী নটিনী বেশ ধারণ করে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করতে যাবে সংকল্প করেছেন। লাস্যময়ী মনসাকে যাতে লাস্যময়ী নটিনীই লাগে সেইমত বেশ-ভূষা পরিধান করলেন। লাস্যময়ীর রূপের প্রধান অঙ্গ পুষ্পমালা। মনসাও সেই পুষ্পমালায় সজ্জিত হওয়ার জন্য মনসা গেলেন কাজলা মালিনীর কাছে। গিয়ে বললেন-

‘‘সাধুর ভেটিতে যাব দেহ পুষ্পমালা। সমুচিত কড়ি দিব আসিবার বেলা।।’’[২৫৯]

দেবী মনসা এখানে একান্তে মানবী মনসা। মনসা তো অসীম ক্ষমতার অধিকারিণী তিনি কেন সামান্য কিছু পয়সার জন্য বললেন ফেরার পথে কড়ি দিবেন। এ মনসাকে সাধারণ নারী ছাড়া আর কিছু ভাবা দুস্কর। নানা ধরনের পুষ্প দিয়ে মনসা আজ নিজেকে সজ্জিত করেছেন দেখে জাত ব্যবসাদারের মত কাজলা মাল্যানী তো ছাড়বার পাত্রী নয়। মালিনী তো জানে এই হীন দেহ ব্যবসায় কারা জড়িত। তাই দেবী মনসাকে যখন কাজলা বলে-

‘‘কাজলা মাল্যানী বলে কোথাকার মাগী। শুনিঞা লুকায় সাজি ডালা দিয়া ঢাকি।।’’[২৬০]

এই কয়েকটা শব্দ-রাজির মধ্যে সমাজ বাস্তবতার চরম নির্দশন আমাদের সামনে জ্বল-জ্বল করে ফুটে উঠে। দেবী মনসাকে একেবারে সমাজের সাধারণ রমনী ‘মাগী’ বলতে ছাড়লেন না। এ কোন দেবী? যিনি নিজের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারছেন না? যদি সমাজের অপাংক্তেয়ী হিসেবে পূজা আদায় বা নিজ অধিকারকে করায়ত্ব করতে হয় তাহলে কী দরকার আছে এমন ক্ষমতার? কিন্তু যাঁরা ক্ষমতার

পদলেহী তাঁরা তো ক্ষমতাকে কোন ভাবেই হাত ছাড়া করবে না। যদিও মনসা তিনি নিজে তেমন ভাবে ক্ষমতার স্পৃহার বহ্নি-জ্বালায় জ্বলিত হননি তবুও মা-বাবা-ভাই-বোন অন্যান্য সকল দেব-দেবীদের দেখে মনসার স্পৃহার জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি খাঁ-খাঁ করছে। আর ক্ষমতা লোভী মনসা কেনই ক্ষমতাকে বিসর্জন দেবেন। একবার ক্ষমতাকে পেলে মনসা যে সারা জীবন তথা তাঁর পুত্র-পরিজনকে আর পরের বাড়ী দাসীবৃত্ত করতে হবে না। এটাই তো স্বাভাবিক। ক্ষমতা এমনই জিনিস যদি সহজ-সরল ভাবে না পাওয়া যায়, তবে তাকে কীভাবে করায়ত্ব করতে হয় তা মনসা জেনে গিয়েছেন। কোন পদ্ধতিতে ক্ষমতাকে কেড়ে নিতে হয় তাও মনসার জানা। পুষ্পের জন্য মনসা এবং কাজলা মালিনীর মধ্যে খন্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। মনসাকে কাজলা মালিনী যে ভাষায় গালি দিয়েছে তাতে যেকোন সাধারণ নারীর মত মনসাও তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন। আগুনের বহ্নি-জ্বালার মত তাঁর হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত। এমতাবস্থায় মনসা কাজলা মালিনীর কাছ থেকে পুষ্পমালা কেড়ে নিয়েছেন।

‘‘খরতরি মনসার মনে নাহি ডর। আপনি পুষ্পের মালা লইল সত্বর।।
সহজে পরিল গলে মল্লিকার মালা। মাল্যানী আঁচলে তার ধরে হেন বেলা।।
দুজনে কাড়াকাড়ি মল্লিকার গড়্যা। ধূলায় ধূসর দোঁহে ক্ষিতিতলে পড়্যা।।’’[২৬১]

এমন সময় চারজন যুবক এসে সেখানে উপস্থিত হয়। মনসার লাস্যময়ী রূপ দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে তাকে ভোগ করার জন্য এগিয়ে আসে। একবাক্যে বলা চলে চারজন যুবক তাকে ধর্ষণ করতে এসেছে। তারা বলে-

‘‘জনা চারি আইল তথা তরঙ্গ বএস। দেখিয়া ভুলিল তারা নটিনীর বেশ।।
নৌতন বএস তার নৌতন নাগর। হাসিয়া হাসিয়া বলে শুন কলন্দর।।
যতেক পুষ্পের কড়ি দিব চারিজনে। আলিঙ্গন দেহ যদি সভাকার সনে।।’’[২৬২]

একোন সমাজ বাস্তবতা? একজন নারী তার কাছে নেই পুষ্প-কেনার কড়ি সেই সুযোগ নিয়ে আজকের মত তৎকালীন সমাজেও দেখা যাচ্ছে নারীকে কীভাবে ভোগ করা যায় তার বাসনা। নারী যে শুধু ভোগের সামগ্রী তাকে আরেকবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। এই চারজন যুবকের ছবি আজকের টিভির পর্দায় বা দৈনিক খবরের কাগজের পাতায় চোখ পড়লেই আমাদের সম্মুখে ভেসে ওঠে। যদিও মনসা তো ছলনাময়ী রূপে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করতে যাবেন বলে ভেবে রেখেছেন কিন্তু লাস্যময়ী নটিনী রূপে পাগল-হারা হয়ে চারজন যুবক মনসাকে ভোগ করতে বা ক্ষণিকের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে চেয়েছে। তবে এটাই খাঁটি বাস্তব। আর মনসার এই রূপ গ্রহণের মধ্যে আমরা সেকালের মত আজকের সমাজের বাস্তব ছবি চিনে নিতে সামান্য বেগ পেতে হয়না। কাজলা মালিনীর উপর মনসার ক্রমান্বয়ে রাগ বেড়ে চলেছে। মনসার আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। তাই সখী নেতার স্মরণাপন্ন হয়েছে দেবী মনসা। নেতার পরামর্শ মত বিঘত্যার দংশনে

কাজলা মালিনীর দুইপুত্র গোপাল এবং গোবিন্দকে হত্যা করেছে। মালিনী তার দুই পুত্রকে দেখতে না পেয়ে আকুল হয়ে উঠেছে। কাজলার ক্রন্দন দেখে মনসার মাতৃ সত্তা জাগরিত হয়েছে। তাই মনসা বৃদ্ধা বেশে এসে মালিনীকে বলেছে এবং নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছে-

‘‘তাহার ক্রন্দন শুনি দরবিত হিয়া। বিশ্বমাতা ভাবে মনে দিব জীয়াইয়া।।’’[২৬৩]

মনসার বাৎসল্যময়ী চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। তাই কাজলার উপর সমস্ত রাগ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তার দুটি সন্তানকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। বেশ এরপর দেবী নটিনী রূপ ধরে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করতে চললেন। নটিনী রূপিনী মনসা-

‘‘নানা অভরণ গায়: মনসা সাজিয়া যায়: ছলিবারে চাঁদ সদাগর।’’[২৬৪]

মনসা নটিনীবেশে বকুলের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় চাঁদের ভৃত্য নাড়া তাকে দেখে মোহিত হয়েছে। আর নিজের পরিচয় দিয়ে মনসাকে বলেছে-

‘‘গ্রামের ঈশ্বর আছে চাঁদ সদাগর। আমি নাড়া বটি সেই সাধুর কিঙ্কর।।
সাধু যদি দেখে তোর এ রূপ যৌবন। না জানি তোমার তরে কি করে কখন।।’’[২৬৫]

বেশ নাড়া গিয়ে চাঁদের কাছে এ সংবাদ দিলে সমস্ত প্রজাদের ঘর থেকে বিদায় দিয়ে চাঁদ নটিনীবেশ ধারিনী মনসার অপেক্ষায় বসে রইলেন। আর মনসা-

‘‘সংহতি করিয়া দেবী লৈল মোহবাণ। চলিল সাধুর তরে হরিবারে জ্ঞান।।
পরম সুন্দরী কন্যা শিয়র-উপর। দূরে গেল মাথা-ব্যথা আর মায়াজ্বর।।
বেউশ্যার রূপে সাধু পড়্যা গেল ভোলে। ক্ষেমানন্দ বলে দেবী-চরণ-কমলে।।’’[২৬৬]

এরপর মনসা চাঁদের কামানলকে জাগ্রত করার জন্য একেরপর এক ‘‘কামের কুসুম-বাণ’’[২৬৭] নিক্ষেপ করা শুরু করলেন। আর কামুক সদাগর বলতে লাগল-

‘‘তোমার মদন-জ্বরে: আজি রক্ষা কর মোরে: দিয়া সে ঔষধ আলিঙ্গন।।’’[২৬৮]

মনসার লাস্যময়ী দেহকে পাবার জন্য এবং মনসার সঙ্গে রতি সুখে মগ্ন হবার আশায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে চাঁদ-

‘‘স্তনযুগ-ভেলা: দিয়া হেন বেলা: পার কর সিমন্তিনী।
এ নব যৌবন: দেখাইয়া কেন: আমার বধহ প্রাণী।।

*** *** ***

যত চাহ ধন: রজত কাঞ্চন: যাহে তোর অভিলাষ।
দেহ আলিঙ্গন: করি নিবেদন: পূরাহ মনের আশ।।’’[২৬৯]

এরপর মনসা প্রতুত্তরে জানিয়েছেন-

“যেবা ধন চাই: তাহা যদি পাই: তবে আলিঙ্গন দিব।
ক্ষেমানন্দ ভণে: দেবী কৈলা মনে: তোর মহাজ্ঞান নিব।।”[২৭০]

দেবী মনসা চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করে নিলেন। কিন্তু চাঁদ মনসার আঁচল ধরে রেখেছে এবং দেবী মনসা একজন মানবী নারী হয়ে নেতাকে বলেছেন-

“বাপার সম্বন্ধে চাঁদ বড় ভাই হয়। মাথায় মারিতে লাথি বড় বাসি ভয়।।”[২৭১]

কিন্তু মনসাকে তো এই কাজ করতেই হবে, না হলে তাঁকে যে আজীবন দাসী বৃত্তি করে নিজ-পুত্রদের মুখের অন্ন জোগাতে হবে। তাই সখী নেতর পরামর্শে-

“নেত বলে কেত তুমি হয়্যা শঙ্খচিল। পদক্ষেপ কর‍্যা তার ঘাড়ে মার কিল।।

*** *** *** ***

হাথের মাণিক যেন হাথে হাথে চুরি। শঙ্খচিল হয়্যা উড়্যা গেল বিষহরি।।”[২৭২]

কিন্তু এত কিছু করার পরও দেবী মনসা সাধারণ মানবের কাছে পরাজিত হলেন। ধন্বন্তরি ওঝা চাঁদকে পুনরায় মহাজ্ঞান দান করেছে। এতেই মনসা আর বেশী রেগে গিয়েছেন। এবার মনসা নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে মালিনীর বেশ ধারণ করলেন এবং কালকুট দিয়ে মালা গেঁথে ধন্বন্তরির “ছকুড়ি ছজন শিষ”-এর প্রাণনাশ করতে বেরিয়ে পড়লেন। মৃত্যুও হল তাদের কিন্তু আবার ধন্বন্তরি তাঁদের বাঁচিয়ে তোলার পর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছে-

“মনে ভয় নাহি করে: মোর শিষ্যগণে মারে: বুঝি তার মরিবারে সাধ।।
ঝাপান সাজিয়া যাই: যথা তার লাগ পাই: মনসার বধি গিয়া প্রাণ।
শুনিঞা গুরুর বাণী: ছাড়িয়া হুঙ্কার ধ্বনি: সর্ব্ব শিষ্য করিল পয়ান।।”[২৭৩]

দ্বিতীয়বার দেবী মনসা গোয়ালিনী বেশ ধারণ করে দই বিক্রি করতে বেড়িয়েছেন। শঙ্খিনী নগরের পথে পথে মনসা দধি বিক্রি করতে এসে ঘুরে ঘুরে বলছেন-

“ দধির পসরা লয়্যা কোলে।
বলিছে ওঝার শিষ: মূল্য কত কর দিশ: মোর গুরু ডাক্যাছেন তোরে।।
শিষ্যের বচন শুনি: সেইখানে গোয়ালিনী: পসারেতে ঢাকিল বসন।
গোয়ালিনী ডাক্যা কই: আমার অমৃত দই: একখানি একেক কাহন।।”[২৭৪]

এই দই খেয়ে ধন্বন্তরি ওঝার সমস্ত শিষ্যরা অচৈতন্য হয়ে পড়ল-

“সুরাপানে মাতে যেন আসল মাতাল। নাহিক চৈতন্য কার, মুখে গোটা নাল।।
ওঝার যতেক শিষ্য বল্লুকার তটে। বিষদধি খ্যায়্যা মৈল মনসার হটে।।”[২৭৫]

ধন্বন্তরি ওঝা সেখানে এসে তাঁর ছকুড়ি ছজন শিষ্যকে পরিস্থিতি অনুযায়ী সবাইকে বাঁচিয়ে তোলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে ধন্বন্তরি মনসাকে বললেন 'চেঙ্গমুড়ি কানি'। এবার সকলে একত্রিত হয়ে বলেছে-

''চল সভে ঘর যাই পরম হরিষে। ঝাপান সাজিয়া চল মনসার-উদ্দিশে।।
যথা পাই তথা তার বধিব পরাণ। ছয়কুড়ি ছয়জন সাজহ ঝাপান।।''[২৭৬]

ওঝা ধন্বন্তরির ছয়কুড়ি ছয়জন শিষ্য একত্রিত হয়ে দৈব শক্তিকে পরাভূত করার জন্য সংকল্প করেছে। কিন্তু এবার দেবী মনসার কাছে ওঝাদের হার স্বীকার করতেই হল। দেবী মনসা আবার ছলনার আশ্রয় নিয়ে ধন্বন্তরির অনুপস্থিতিতে তাঁর গৃহে প্রবেশ করে স্ত্রী কমলার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেছেন। এরপর দুইজন দুজনের আন্তরিকতায় মুগ্ধা। কিন্তু মনসা ধীরে ধীরে তাঁর কার্যোদ্ধার করার জন্য এগিয়ে চলেছেন। মনসা বাক্‌পটু রমণীর মত ধন্বন্তরি-পত্নী কমলাকে বললেন-

''তোমায় আমায় হৈল পরম পীরিতি। আর খানি মনে ভাবি হইনু বিস্মিত।।
ত্রিভুবন জিনে মোর সয়া ধন্বন্তরি। তে-কারণে তাহার বহুত আছে বৈরী।।
ত্রিজগত জিনে সয়া সাজিয়া ঝাপান। কোন্ দিন কার হাথে হারাইব প্রাণ।।''[২৭৭]

ধন্বন্তরির স্ত্রী কমলাকে মনসা তার স্বামীর বিপদ-সম্ভাবনার কথা বলে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। শয়ন-কালে কমলা তার উৎকণ্ঠার কথা ওঝাকে জানালে ওঝা প্রত্যয়-দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলেছেন-

''ধন্বন্তরি বলে প্রিয়া কান্দ অকারণ। এ তিন ভুবনে নাঞি আমার মরণ।।''[২৭৮]

কিন্তু ব্যাকুল চিত্তে কমলা তার স্বামীর মরণ কীভাবে তা জানতে চেয়েছে।

''ধরিয়া প্রভুর পায় কান্দে সীমন্তিনী। মরণ-জীয়ন-কথা কহ দেখি শুনি।।''[২৭৯]

স্ত্রীর ব্যাকুলতার কাছে ধন্বন্তরি হার স্বীকার করে তাঁর মরণ কীভাবে সম্ভব তা বলতে লাগল-

''ধন্বন্তরি বলে প্রিয়া শুনহ বচন। যেমত প্রকারে হব আমার মরণ।।
প্রজাপতি মন্ত্র দিলা ক্ষীরোদের তীরে। সাত ব্রহ্মতিল মোর ব্রহ্মতালু ফিরে।।
উদয়কাল সর্প আছে মহেশের জটে। সে যদি যাইতে পারে নাসিকার বাটে।।
সাত ব্রহ্মতিল যদি একবারে লয়। তবে সে মরিব আমি কহিল নিশ্চয়।।''[২৮০]

মনসা একথা জানলেন শ্বেত মাছির রূপ ধারণ করে। এরপর দেবী মনসা চললেন কৈলাসে পিতা মহাদেবের কাছে। পিতার কাছে গিয়ে মনসা মহাদেবের উদয়কাল সর্পের প্রার্থনা করলেন। পিতা শিব প্রথমে তা দিতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু কন্যা মনসার আকুল প্রার্থনার কাছে পিতৃ-হৃদয় কোমলতায় পর্যবসিত হয়ে ''উদয়কাল সর্প দিলা মনসার হাথে।।''[২৮১] সেই উদয়কাল সর্পের দংশনে ধন্বন্তরির মৃত্যু ঘটেছে। স্ত্রীর কাছে ধন্বন্তরি যদি তাঁর মরণ-কথা না জানাতেন তবে ধন্বন্তরির মৃত্যু ঘটত না। তাই ধন্বন্তরি তাঁর স্ত্রীকে বলেছে-

''তুমি হৈলে কাল: পাতিলে জঞ্জাল: কি জানি কিসের পাকে।''[২৮২]

ধন্বন্তরি মৃত্যু-জ্বালায় ছটফট করতে থাকলেও তখন তাঁর জ্ঞান হারায়নি, স্ত্রী কমলাকে বলেছে তাঁর দুইজন শিষ্য আছে ধনা মনা নামে। তাঁরা যদি প্রভাতের সূর্য্য ওঠার আগে গন্ধমাদন পর্বত থেকে শাল্য বিশল্য ঔষধ আনতে পারে, তাহলে সে বেঁচে যাবে। ত্রস্ত-গতিতে ধনা মনার কাছে কমলা গেলে, তা শুনে দুই ভাই দ্রুত গতিতে ‘‘বিশল্যকরণী লয়্যা যায় ধনা-মনা।’’[২৮৩] কিন্তু নেতার পরামর্শ মত মনসা এই কাজকে সফল হতে দিলেন না। তিনি চেড়ীর রূপ ধারণ করে ধনা মনাকে বলেছেন-

‘‘দুঃখী চেড়ী বলে আর কি কাজ ঔষধে। ধন্বন্তরি ওঝা মৈল মনসা বাদে।।
অই ধূমা দেখ তোর গুরু যায় পোড়া। নগর ভিতরে শুন ক্রন্দনের সাড়া।।
এত শুনি দোঁহাকার শুকাইল হিয়া। ঔষধের গাছ তারা পেলে টান দিয়া।।’’[২৮৪]

এরপর দুই ভাই শাল্য বিশাল্য ঔষধ গাছ ফেলে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে গিয়ে দেখে ধন্বন্তরি তখনও বেঁচে আছে। আর দেবী মনসা ধনা মনার ফেলে দেওয়া-

‘‘সেইখানে বিষহরি শঙ্খচিল হয়্যা। শূন্যভরে গেল তবে বিশাল্য লইয়া।।
বিশাল্য লইয়া দেবী গেলা শূন্যভরে।’’[২৮৫]

ধনা-মনার কাছে সমস্ত কিছু শোনার পর ধন্বন্তরি মনসার ছলনা বুঝে গেছে। ধন্বন্তরি মনসার মহিমাকে খর্ব করার জন্য তাঁর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছে-

‘‘প্রভাতে মরিব আমি নাহিক এড়ান। কাটিয়া আমার শির কর্য চারিখান।।
চারিদিগে পুতিবে করিয়া চারিখানি। যেন জল খাত্যে নারে মনসার ফণী।।’’[২৮৬]

একথা শোনার পর মনসা আবার কপটতার আশ্রয় নিলেন। ধনা মনাকে ছলনা করার জন্য মনসা গণক ঠাকুরের বেশে এসে ধন্বন্তরির শেষ ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করতে দেয়নি। ছলনাময়ী মনসা ধনা-মনাকে বলেছেন-

‘‘সেই বড় ধর্ম্ম: সভাপর কর্ম্ম: যে করে গুরুরে ভক্তি।
গুরু মহাজন: ব্রহ্ম সনাতন: গুরুর গরিমা শক্তি।।
না কর এমত কাজ।
যেইজন হটে: গিয়া গুরু কাটে: পশ্চাত পাইব লাজ।।’’[২৮৭]

এইভাবে দেবী মনসা অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে ধন্বন্তরি-কেন্দ্রিক সমস্ত প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে তুলে জয়ী হয়েছেন। মনসা ভেবেছিলেন ধন্বন্তরি ওঝাকে বধ করলে বোধ হয় চাঁদ কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে তাঁর পূজা দিতে রাজি হবেন, কিন্তু এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরও চাঁদ তাঁর সংকল্পে অটল। চাঁদ কিছুতেই মনসার পূজা দিতে রাজি নয়।-

‘‘মনসার হটে মৈল ওঝা ধন্বন্তরি। তবু চাঁদ নাহি পূজে জয় বিষহরি।।’’[২৮৮]

মনসা ভীষন চিন্তার মধ্যে পড়লেন। কোন কিছু খুঁজে না পেয়ে আবার সখী নেতার সঙ্গে পরামর্শে অন্তর্লীন হলেন। কিন্তু মনসা বলছেন চাঁদ যদি সামান্য পূজা টুকু তাকে দেয় তাহলে তো চাঁদের ছয়জন পুত্র বেঁচে যায়। নাহলে অগত্যা তাঁকে চাঁদের ছয় পুত্রের প্রাণ নিতে হবে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে দেখি-

> ‘‘বলে দেবী বিষহরি যুক্তি বল নেত। চাঁদ হৈতে প্রচার হইব মোর ব্রত।।
> চাঁদবাণ্যার তিলেক নাহিক মায়ামো। বিষ খায়্যা মরুক তাহার ছয় পো।।’’[২৮৯]

কোন পথ খুঁজে না পেয়ে নেতা মনসাকে বিঘতিয়াকে ডেকে নিয়ে এসে চাঁদের গৃহে গিয়ে অন্ন-ব্যঞ্জনে বিষ উগ্‌রে দিয়ে আসতে বলে। মনসার কথা মত বিঘতিয়া এসে সে কার্যটি সমাপন করে। তারপর চাঁদের -

> ‘‘মধ্যাহ্নের কালে ভুঞ্জে তনয় সকল। ছয় পুত্র মৈল তার খাইয়া গরল।।’’[২৯০]

পুত্রহারা মা সনকা-

> ‘‘সনকা বাণ্যানী কান্দে, নাহি বান্ধে চুল। ধূলায় ধূসর তনু, কান্দে শোকাকুল।।’’[২৯১]

এ খবর নাড়ার কাছে শুনে চাঁদ নাটুয়া বেশে- ‘‘কান্ধে হিন্তালের বাড়ি নাচিতে লাগিল।।’’[২৯২] আর চাঁদ সদাগর বলতে লাগল-

> ‘‘ভাল হৈল পুত্র মৈল কি তার বিষাদ। চেঙ্গমুড়ি কানি সনে ঘুচিল বিবাদ।।
> ক্রোধ-মনে নাড়ারে কহিল চাঁদবাণ্যা। কানির উচ্ছিষ্ট মড়া পেল নিয়া টান্যা।।
> অবিলম্বে কাট্যা আন রামকলা-পাত। মৎস্যপোড়া দিয়া আজি খাব পান্ত ভাত।।
> ছয় বধূ রহু মোর হইআ রাধনী। আর কি করিব মোর চেঙ্গমুড়ি কানি।।’’[২৯৩]

এই কথা শোনারপর মনসা পড়লেন ঘোর সংকটে। তাই দেবী মনসার প্রয়োজন পড়ল উষা অনিরুদ্ধের। যাঁরা বেহুলা লখাই রূপে জন্মগ্রহণ করে মর্ত্যে পূজা করবে। এই আশা বুকে বেঁধে আবার নিজ কর্ম সমাপন করতে উদ্যোগী হলেন।-

> ‘‘হোথায় দেবীর মনে মনস্তাপ বাড়ে। শ্রীহরিবংশের কথা তাঁর মনে পড়ে।।
> ঈশ্বরী কহেন শিবের দোহাই। উষা অনিরুদ্ধ হব বেহুলা লখাই।।
> মনসার পূজা তারা প্রচারিব ক্ষিতি। গন্ধবণিকের কূলে হৈব উৎপতি।।’’[২৯৪]

এরপর শুরু হল মনসার জীবনের আরেক অধ্যায়। চাঁদের নাখড়া বাগান ধ্বংস, তাঁর মহাজ্ঞান হরণ, ছয় পুত্র নিধন এবং বন্ধুবরেণ্য ধন্বন্তরি ওঝাকে বধ করার পর চাঁদ তাঁর পৌরুষ শক্তির জোরে ‘চেঙ্গমুড়ি কানী’র কাছে নতি স্বীকার করেনি। চাঁদ বীর প্রতাপের মত মনসাকে পূজা দিবে না বলে মনস্থির করেছে। তাই দেবী মনসা নেতার পরামর্শে বেছে নিলেন অন্য পথ। স্বর্গের গীতিবাদ্যকার অনিরুদ্ধ এবং নর্তকী উষাকে মর্ত্যে এনে পূজা প্রচারের কাজে নিয়োগ করবেন। কিন্তু দেবাদিদেব

মহাদেবের মত অন্যান্য দেবতারাও প্রথমে খানিকটা বিস্মিত হলেও অবশেষে দেবতারা নৃত্যগীতের আয়োজন করেন। মনসার ষড়যন্ত্রে অনিরুদ্ধ ও উষার নৃত্যগীতে তালভঙ্গ ঘটে ফলস্বরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দ্বারা তারা অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্যে লখিন্দর এবং বেহুলা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই কাহিনিকে এক এক জন কবি এক এক ভাবে বর্ণনা করেছেন।

বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যের মধ্যে এনেছেন খানিকটা নতুনত্ব। তাঁর কাব্যে উষা এবং অনিরুদ্ধের আত্মাকে মর্ত্যে নিয়ে আসার সময় যমরাজের সঙ্গে মনসার যুদ্ধ বেধে যায়। দেবী মনসার কথা মত অনিরুদ্ধ এবং উষা আত্মাহুতি দিলে যমরাজের অনুচরগণ অগ্নিকুন্ডে হাজির হয়ে তাদের প্রাণ সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হয়। এই অনুচরদের দেখে মনসা রেগে গিয়ে বলেন-

‘‘অনিরুদ্ধ উষার জীব যমে লইয়া যায়।

*** ***

কোপে রা [ঙ্গা] আঁখি করি পদ্মাবতী চায়।।
কোথা হতে আসিয়াছ তুই বেটা কে।
প্রাণে যদি না মরিবি পরিচয় দেয়ে।।
পাপীজন নিতে তোর যমের অধিকার।
পূণ্যমন্ত নিতে যম কোথাকার ছাতার।।’’[২৯৫]

এর উত্তরে যমের অনুচরেরা জানান-

‘‘দূতে বলে পদ্মাবতী না হইয়া কুপিত।
যমের অধিকার জান সংসার বিদিত।।
কীট পতঙ্গ আদি আছয়ে সংসারে।
সকল জায় আমার যমরাজ পুরে।।
ইতিন ভুবনে জান যম মহারাজ।
যাহার নমক খাই তাই তাহার করি কাজ।।
অকারণে পাকাও আঁখি চাহ বিষহরি।
যমের প্রসাদে আমি কাররে না ডরি।।’’[২৯৬]

মনসা দূতেদের কাছে এই কথা শোনারপর দ্বিগুণ আগুনে জ্বলে ওঠেন।

‘‘ধর ধর বলি পদ্মা জ্বলিলেক কোপে।
কোপে রাঙ্গা দুই আঁখি থর থর কাঁপে।।’’[২৯৭]

এরপর মনসার বিষ-দৃষ্টিতে যমের অনুচরেরা মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। খবর যায় যমরাজের কাছে। যমরাজ মনসার এহেন স্পর্ধার জন্য যমরাজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন তাঁর সৈন্যদের।

‘‘মনুষ্য জাতি চান্দো তারে জিনিতে নারে।
আজি শুনিলাম কানি মোর দূত মারে।।
আমার বিষয় নিতে তার অধিকার কি।
সবেমাত্র সভপানা মহাদেবের ঝি।।
স্ত্রীলোক হইয়া নিবে এত বড় পদ।
আজি রণে পশিয়া করিব স্ত্রীবধ।।’’[২৯৮]

পুরুষ সমাজের কর্ণধার যমরাজ একজন স্ত্রীলোকের কাছে অপমানিত হবেন এটা কিছুতেই মানতে পারছেন না। তিনি তো জানেন স্ত্রীলোকের স্থান পুরুষের পদতলে। তাই মনসার এতবড় স্পর্ধা যমরাজ কোনভাবে মেনে নিলেন না। শেষ পর্যন্ত যমরাজের সৈন্যরা যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে মনসার কাছে দূত প্রেরণ করে বলেছেন-

‘‘তোমার সঙ্গে যমদূতে করিবেক রণ।
তে কারণে তোমার ঠাঁই পাঠাইছে শমন।।
স্ত্রী হইয়া তোমার কত বা বড়াই।
শৃগাল হইয়া কেন সিংহেরে লড়াই।।’’[২৯৯]

একথা শোনারপর দেবী মনসা আর রেগে গেলেন। স্ত্রী জাতিকে যে পুরুষ কোনরূপ মর্যাদা দেন না তাঁকে তিনি বধ করবেনই। স্ত্রী সমাজের এহেন অপমান তিনি কোনভাবে মেনে নিতে পারলেন না। তাই মনসার-

‘‘কোপে রাঙ্গা আঁখি পদ্মা চাহে চারিদিগে।
অগ্নি মধ্যে ঘৃত দিলে যেন উঠে বেগে।।’’[৩০০]

যমরাজের দূতকে রেগে গিয়ে মনসা বলে দিলেন তিনিও ছাড়বার পাত্রী নন-

‘‘এত বড় দর্প কথা আমারে কয়ে কে।
সেই বেটা নরের যম তার যম কে।।
আমি স্ত্রীলোক [বলি] না দেখে তার সম।
আজি রণে পশিলে আমি তার যম।।’’[৩০১]

নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে মনসাও যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে-

‘‘সহজে মনসা দেবী বড়হি রহস্য।
হুঙ্কারে যমের শেল করিলেক ভস্ম।।
শেল পাট ভস্ম হইল দেখে দেবগণ।

কোটী কোটী নাগে করে বিষ বরিষণ।।
রণমধ্যে যমরাজ হইল ফাফর।”[৩০২]

দেবী মনসার সঙ্গে যুদ্ধে যমরাজ পরাজিত হন। এখানে ভারতীয় সমাজের বিশ্ববিধানকে মনসা নিজ কার্য সিদ্ধির জন্য পরাভূত করেছেন। কারণ মৃত্যুর দেবতা যমরাজ ভারতীয় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপস্থিত। এই মৃত্যুর দেবতাকেও একজন স্ত্রী অর্থাৎ দেবী মনসার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। বেশ দেবাদিদেব মহাদেব শিবের অভিশাপে সনকার গর্ভে অনিরুদ্ধ লখিন্দর রূপে এবং নিছনি নগরে অমলার গর্ভে উষা বেহুলা রূপে জন্মগ্রহণ করে।

অন্যদিকে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে সপ্ত মধুকর ডিঙা নির্মাণের আয়োজন করলেন চাঁদ সদাগর। সপ্ত ডিঙা তৈরী করে সদাগর এবার বাণিজ্য যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। ষষ্ঠীবর দত্তের কাব্যে বাণিজ্য যাত্রার আগে মনসা আরেকবার চাঁদের হাত থেকে আপোসে পূজা পেতে চেয়েছেন-

“হেনকালে পদ্মা আইলা রথে করি ভর।
আমা কেনে না পূজ বাদুয়া সদাগর।।
তোর বাম হস্তে মোরে দেও পুস্পপাণী।
মরিয়াছে পুত্র তোর জয়াইয়া দিমু আমি।।”[৩০৩]

কিন্তু তাতেও চাঁদ সদাগর তাঁর সংকল্পে অনড় থেকেছে। মনসা আবার চাঁদের পূজার আশায় বাণিজ্য যাত্রা পথে ছলনায় সুন্দর মন্দির স্থাপন করেছেন। ভেবেছেন যদি চাঁদ সহৃদয় হয়ে তাঁর পূজা দেয় তাহলে সকল বাদাদিবাদ ঘুঁচে যাবে। নারায়ণ দেবের ‘পদ্মাপুরানে’-

“হরসিতে পদ্যা পূজে জত দিজগণ।
হেনকালে চন্দ্রধর শুনিল বাজন।।
তিয়র দেখিয়া চান্দো জিঙ্গাসিল তারে।
কোন দেবের পূজা কর এহী নদির তিরে।।
তিয়রে বোলে ঠাকুর তুমি নাহি জান কি।
এহি পুরির মৈধ্যে দেখ মহাদেবের ঝি।।”[৩০৪]

একথা শোনার পর চাঁদ তীব্র গতিতে ডিঙ্গা চালিয়ে চলে যায়। আর বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখা যায়-

“মনসার পুরী হেন ততক্ষণে জানি।
এমত অপূর্ব্ব পুরী করিয়াছে কানি।।
তথাতে কি রিক্ত দেখি করি নানা সন্ধি।
চারি দিগ বেড়িয়া কৈবর্ত্ত করে বন্দী।।
চান্দ বোলে কৈবর্ত্ত শুন মোর কথা।

ধূপে দীপে পূজা কর কোন দেবতা।।
কোন দেব পূজা কর সমুদ্রের জলে।
খাসা ইনাম দিব [তোমা] সত্য কহো মোরে।।
ইনামের কথা শুনি কৈবর্ত্ত হরষিত।
জোড় হস্ত করি কহে চান্দের বিধিত।।
মনসার পুরী এহি শোন মহাশয়।
ধূপ দীপ দিয়া পূজি মনসার পায়।।’’[৩০৫]

বিজয় গুপ্তের কাব্যে এও আমরা দেখি চাঁদ সদাগরকে দেবী মনসা নানাভাবে ভয় দেখিয়েছেন। চাঁদের যারা অনুচর তাদের দিয়ে দেবী মনসার ভয়ঙ্করী এবং ক্ষতিকারিণী রূপ দেখিয়ে চাঁদকে ভীত করার চেষ্টা করেছেন। তাতে লাভের লাভ কিছুই হয়নি মনসার।

নারায়ণ দেবের কাব্যেও দেবী মনসা ভেবেছেন চাঁদের কাছ থেকে পূজা পেতে হলে তাঁকে শুধু নিগ্রহ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এবার মনসা নিলেন মিথ্যাচারের আশ্রয়। ছলনাময়ী মনসা দক্ষিণ পাটনের রাজা চন্দ্রকেতুকে স্বপ্নে জানিয়েছেন যে, চাঁদ সদাগর বাণিজ্যে যে নারকেল আনছেন তাতে বিষ ভর্তি। চাঁদ চন্দ্রকেতুকে হত্যা করার জন্য এই নারকেল নামক বিষফল আনছেন। মনসার এই মায়াবী স্বপ্নকে সত্যি রূপদান করার জন্য দ্বারী গিরিবর যখন নারকেল খেয়েছে তখন মনসার ছলনায় দ্বারীকে বিমনা করে ফেলেছেন। এই দেখে চন্দ্রধর চাঁদকে বন্দী করে রেখেছে। বুকে পাষাণভার দিয়ে কারাবাসী চাঁদকে আলোহীনা, বায়ুহীনা পরিবেশে রেখে নানা ধরণের কষ্টের প্রহর গুনিয়েছেন।

‘‘দ্বারির স্ত্রী বেটী বড়ই দুর্ম্মতি।
চান্দোর বুকেত গিয়ে মারিলেক লাথি।।
মোর স্বামি মারিলী বেটা জাইবা কিমতে।
তোমাকে খাইব আইজ দসন বিকটে।।

***   ***   ***

হাতে পায়ে বন্ধন গলায়ে জিঞ্জির।
চাপায় একখান পাথর বুকের উপর।।
ক্ষেনে ২ মারে তারে জত পাইকগণ।
বন্দিত থাকিয়া সাধু করয়ে ক্রন্দন।।’’[৩০৬]

বাণিজ্য শেষ করে যদি নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে তবে চাঁদ মনসাকে কোনভাবে পূজা দেবে না। এই ভেবে মনসাকে বলতে শুনি-

‘‘সুখে যদি বানিয়া আনন্দে চলি যায়।
নহিবে আমার পূজা কি করি উপায়।।’’[৩০৭]

তাই দেবী মনসা আবার চাঁদকে অনুরোধ করে বলেছেন-

‘‘পদ্মা বলে বর্ব্বর অবোধিয়া সদাগর
এবে মোরে দেও পুস্পপানি।
এই তোর ধন জন পুত্র পাবে ছয়জন
দেশে যাইতে দিমুরে মেলানি।।’’[৩০৮]

চাঁদ সদাগর এই প্রস্তাব অস্বীকার করলে মনসা নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর বাণিজ্য ডিঙ্গা ডুবাবার পরিকল্পনা করেছেন। এক এক জন কবি চাঁদের বাণিজ্য ডিঙ্গা ডুবিয়েছেন এক এক ভাবে। প্রত্যেক কবিই তাঁদের স্বকল্প কল্পিত চাঁদের দুঃখ-কষ্টের বর্ণনাও দিয়েছেন আলাদা আলাদা ভাবে। বিজয় গুপ্তের কাব্যে নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে পিতা মহাদেবের সঙ্গে মনসা দেখা করতে গিয়েছেন। পিতার কাছে গিয়ে মনসা কাতর অনুনয় করে বলেছেন-

‘‘শিবের চরণে পদ্মা নোয়াইল মাথা।
জোড় হাত করি কহে যত দুঃখের কথা।।
মা নাহি যার তার বৃথা সে জীবন।
শিশু কাল হতে মোর চান্দোর বিড়ম্বন।।
নিরন্তর চান্দো বানিয়া মোরে পাড়ে গালি।
না বুঝিলাম চান্দোর আমি হইলাম শালি।।’’[৩০৯]

পিতা মহাদেবের কাছে মনসা সমস্ত দুঃখের কথা বললে পিতা শিব বললেন-

‘‘প্রাণে না মারিয় তারে শোনহ বচন।
ধনে জনে ডুবাইয়া কর বিড়ম্বন।।’’[৩১০]

পিতৃ আজ্ঞাময়ী মনসা এবার চলে এলেন। পিতার আদেশমত চাঁদের ডিঙ্গা ডুবাবার জন্য এলে বাদ সাধেন মা গঙ্গা। মায়ের সঙ্গে বাক্যালাপের পর মা গঙ্গা অনুমতি দেন-

‘‘আজ্ঞা দিলাম আমি তার ডিঙ্গা বুড়াইতে।।’’[৩১১]

পরিশেষে বহুজনের সহায়তায় মনসা চাঁদের ডিঙ্গা ডুবিয়েছেন।

‘‘ঐরাবত আসি তবে ডিঙ্গা ডুবাইল।
দিনে অন্ধকার করি অতি শব্দ হইল।।
দিনে অন্ধকার করি ডুবিল মধুকর।
জল মধ্যে একেশ্বর ভাসে সদাগর।।

মধুকর ডিঙ্গা যদি জলে হইল [তল]।
অন্তরীক্ষে থাকি পদ্মা হসে খল খল।।’’[৩১২]

চাঁদের কর্মদোষে আজ সমস্ত হারিয়েছে। নারায়ণ দেবের কাব্যে দেখি মনসা ইন্দ্রের সহায়তায় চাঁদের ডিঙ্গা ডুবিয়েছেন।

‘‘পদ্যার কপটে রাঘব বিছান তল কৈল।
সাত বেঞা জলে সাধু তল হইল।।’’[৩১৩]

তাই সখী নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে চাঁদকে জ্যান্ত মারার মত করে রেখেছে। কারণ নেতা বলে দিয়েছেন-

‘‘নেত বলে চাঁদবাণ্যা তোমা নাহি জানে। বাদে না মারিহ দেবী রাখিহ পরাণে।।
তবে সে তোমার পূজা হইব প্রচার। এবার সঙ্কটে কর সাধুর উদ্ধার।।
বস্ত্র বিবর্জ্জিত সাধু কাতর হৃদয়। মনসার পাদপদ্মে ক্ষেমানন্দে কয়।।’’[৩১৪]

আর জগজ্জীবনের কাব্যে-

‘‘জলের উপরে চান্দো টেপা মাছ ভাসে।
রথের উপরে পদ্মা মনে মনে হাসে।।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে ক্ষণে তল যায়।
ঢোকে ঢোকে পানি খায় চক্ষু উলুটায়।।
পদ্মা বলে বানিঞা ডুবিয়া যদি মরে।
কি সর্ত্তে পাইব পূজা পৃথিবী-ভিতরে।।
পদ্মা বলে সাগর দাদা মোর বাক্য রাখ।
প্রাণে না মারিহ মোর গন্ধবানিঞাক।।’’[৩১৫]

এই রকম অবস্থা দেখে পদ্মার হৃদয়ও ক্ষণিকের তরে কেঁদে উঠল। চাঁদকে না মেরে মনসা একটা গোটা লাউ তাঁর কাছে ভাসিয়ে দেয়।

‘‘দুক্ষ জাতনা সাধু পাউক অপমান।
তর বাপে বুলিয়াছে রাখিতে পরাণ।।
নেতার বচন পদ্যা শুনিয়া শ্রবণে।
চান্দোর নিকটে লাউ দিল ততক্ষণে।।’’[৩১৬]

কিন্তু চাঁদ যখনই এই প্রেরিত লাউয়ের প্রসঙ্গে বিদ্রুপ বাক্য বলেছে তৎক্ষণাৎ মনসা গোটা লাউ হরণ করে নিয়েছেন। এবার গহিন সাগর মাঝে নিয়ে চাঁদকে দৈহিক বিড়ম্বনা দিয়েছেন। এমনকি -

‘‘টাবি টুবি করি সাধু বেড়ায় ভাসিয়া।
উলি পোকে গালে মুখে ধরিল আসিয়া।।
পদ্যার কপটে মুখে মাড়িল কামড়।
ছটফট করে সাধু মুখে মারে চড়।।’’[৩১৭]

এরপর নেতার পরামর্শে দেবী মনসা পদ্ম পুস্প দিলেন চাঁদের নিকটে। কারণ এই পদ্ম দেখে চাঁদের কী প্রতিক্রিয়া তা জানার জন্যই পদ্ম পুস্প নিক্ষেপ করেছিলেন দেবী মনসা। কিন্তু দেখা গেল-

‘‘নেতার বচন পদ্যা শুনিয়া শ্রবণে।
পদ্ম পুষ্প দিল তবে চান্দো বিদ্যমানে।।
পদ্ম পুষ্প দেখি সাধু লাগে বুলিবার।
বিষ্ণু ২ সিব দুর্গা জপে সাত বার।।
কানির নামে পুষ্প গায় লাগীল আমার।
এহি দায় প্রাচির্ত্ত চাহি করিবার।।’’[৩১৮]

কেতকাদাস তাঁর কাব্যে চাঁদকে এই গহিন বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য একটি পদ্মফুল ফেলে দিলেন। যাতে করে এই ভাসমান পদ্মফুলকে আঁকড়ে সদাগর ভাসতে পারেন। কিন্তু সদাগর বুঝলেন এই পদ্মা মনসার, তাই চাঁদ একে স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না। অতএব চাঁদের আরও দুর্গতি বেড়ে গেল।

‘‘জল খায়্যা মরে সাধু ঘন বহে শ্বাসে। হেনকালে সমুখেতে পদ্মফুল ভাসে।।
চাঁদ বলে এই পদ্মে মনসার জন্ম। হেন পদ্ম পরশিলে অনেক অধর্ম্ম।।
এত ভাবি চাঁদবাণ্যা না ছুঁইল ফুল। জল খায়্যা মরে সাধু নাহি পায় কূল।।’’[৩১৯]

বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখা যায় মনসার কাছে আনুগত্য প্রদর্শন না করলে চাঁদ চরম দুর্গতিতে পড়বে। তাই মনসা চরম ভীতি প্রদর্শনের বাণী লিখে কলা গাছ প্রেরণ করেছেন চাঁদের কাছে। কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত করেনি সদাগর। আবার খিদের জ্বালায় যখন চাঁদ ছট-ফট করছে তখন-

‘‘হেন কালে বাবকের অন্ন পাইয়া।
হাতেত লইল চান্দো বড় তুষ্ট হইয়া।।’’[৩২০]

কিন্তু নেতার পরামর্শে চাঁদের জাতি যায় বলে ‘‘অন্ন হরিয়া পদ্মা আনে শীঘ্রগতি।।’’[৩২১] আবার চাঁদ সদাগর কলার বাকল পাইলে ‘‘গাভীরূপে মনসা তাহা হরি নিল।।’’[৩২২] এইভাবে একেরপর এক কষ্টের কষাঘাত হেনেছেন মনসা। আর সব হারিয়ে চাঁদ আজ-

‘‘ধন নিল জন নিল প্রাণ কেবল রয়ে।
উপুড় হইয়া চান্দো খালের পানি খায়ে।।’’[৩২৩]

কিন্তু মনসার হৃদয়-ব্যাকুল ছিল। তাই আবার দেবী মনসা এবার -

‘‘সাধুর দুর্গতি দেখি জগতী কমলা। রামকলা কাটিয়া সাধুরে দিল ভেলা।।
ভেলায় চাপিয়া চাঁদ পাইল গিয়া তড়। শিব শিব বলিয়া শতেক কৈল গড়।।’’[৩২৪]

চাঁদ বিবস্ত্র অবস্থায় রয়েছে। তাই চাঁদ জলের ভিতরে বসে রইল।

‘‘পীন্ধন কাপড় নাহী সাধু নেঙ্গটা।
জলের ভিতরে জেন কৈবর্ত্য এক বেটা।।’’[৩২৫]

এমতাবস্থায় কয়েকজন নারী জল ভরতে এসেছে। আর দূরে চাঁদের এই হীনদশা দেখে তারা সকলে-

‘‘সাত পাচ নারী আইল জল ভরিবার।
ভঙ্গ হইল দেখি তারা বিক্রিত য়াকার।।
কলসী ফেলাইয়া তারা উঠিয়া দিল নোড়।
আছার খাইয়া জায় ভূমির উপর।।’’[৩২৬]

এহেন অবস্থায় একজন ব্রাহ্মণ ঘাটে এসেছেন তর্পণ করতে। তখন চাঁদ সদাগর তাকে একটুকরো বস্ত্র দেবার অনুনয় করলে ব্রাহ্মণ-

‘‘ডাক দিয়া তার ঠাঞি বোলে সদাগরে।
তোমার বাপের পূর্ণ্যে একখানি তেউনি দেও মোরে।।
ব্রর্হ্ম দিজে শুনিয়া চান্দোর বচন।
ভাঙ্গা গামছার অর্দ্ধেক দিল ততক্ষণ।।’’[৩২৭]

দেবী মনসা আবার তাঁকে ছলনা করতে এগিয়ে এলেন। কুলবধূ রূপে মনসা এসে চাঁদকে অপমান করলেন।-

‘‘জরৎকার মুনিপত্নী জয় বিষহরি। জল আনিবার ছলে কাখে কুম্ভ করি।।
যেইঘাটে চাঁদবাণ্যা হয়্যা বিবসন। তথায় মনসা গিয়া দিলা দরশন।।
কুলবধূ দেখি সাধু বড় লজ্জা পায়। বিবসন অঙ্গ সাধু জলেতে লুকায়।।
সকল রমণী বলে ক্ষেপা দিগম্বর। বিবস্ত্রে বসিয়া কেন মড়া-কানি পর।।’’[৩২৮]

এই কথা শোনার পর চাঁদ শ্মশানের ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে মনসার নগরে চাঁদ ভিক্ষা করে চলেছেন। দেব-দেবীর ছলনায় কীভাবে একজন রাজা ভিখারিতে পরিণত হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর। কিন্তু চাঁদের অনমনীয় শক্তির কাছে দেব-দেবীরাও পরাস্ত হয়েছেন। এতসব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার পরও মনসার কাছে চাঁদ মাথা হেঁট করেনি। এহেন অসীম বীর চাঁদকে আজ দেবী ব্যাধের হাতে প্রহৃত করিয়েছেন। কারণ ব্যাধেরা ভেবেছে চাঁদই তাদের শিকারকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই-

‘‘পাইয়া সাধুর শব্দ যত পক্ষ উড়ে। যতেক আক্ষটি তারা চাঁদবাণ্যা বেঢ়ে।।
চারিদিগে বেঢ়িল যতেক পক্ষমারা। চাঁদবাণ্যার চুলে ধরি সভে মারে তারা।।’’[৩২৯]
‘‘কোপে যত ব্যাধ মেলি ধরিয়া চাঁদোরে। লাথি চড় প্রহার করয়ে অবিচারে।।
আর্তনাদ ডাক ছাড়ে কান্দে নৃপমুনি। কোন দোষ কৈনু তব বেড়ি মারো কেনি।।
ব্যাধ সব বলে বুড়া হেন বলি নড়। ঝাক সহ আসি হেথা অবিলম্বে পড়।।

*** *** *** ***

সর্বজনে মহাকোপে অমঙ্গল শুনি। লাথি চড় মারে তারে কেশে ধরি টানে।।

*** *** *** ***

লাথি কিল চড় তারা মারে বিপরীত। পড়িল ধরণীতলে হইয়া মূর্ছিত।।
কেশ ধরি টানিয়া এড়িল কত দূরে। পদ্মার মায়ায় চাঁদো প্রহারে না মরে।।’’[৩৩০]

চাঁদ ব্যাধেদের না মারার জন্য কাকুতি-মিনতি করছে। ব্যাধেরা কোন কিছু কর্ণপাত না করে চাঁদকে বলেছে- ‘‘কোথা হৈতে কাল হয়্যা আলি ভাড়্যারভাড়্যা।।’’[৩৩১] এই মারের আঘাতে চাঁদ কাঁদতে কাঁদতে বন্ধু ধর্মকেতুর পুত্র চন্দ্রকেতুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে। এখানে এসে নিজ দোষে আবার বিপদের মধ্যে পড়ল। বন্ধুর বাড়িতে দেখেন মনসার বারা। এই মনসার বারা দেখে চাঁদ নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে এবং বন্ধুত্বের অধিকার বলে হেন্তালের বাড়ি দিয়ে তা ভাঙ্গতে উদ্যত হয়েছে। এমন সময় বন্ধু চন্দ্রকেতু তাঁকে নিরস্ত করে বলতে লাগল-

‘‘শুন মিতা হত বুদ্ধি: আর তোর নাহি সিদ্ধি: দেবতা সহিত বিসম্বাদ।’’[৩৩২]

বন্ধুর বাড়িতে অপমানিত হওয়ার পর চাঁদ বনে-বাদারে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। আর বনের কাঠ কেটে এবং তা বিক্রি করে জীবন ধারণ করেছে। কিন্তু এখানে চাঁদকে কাঠ বিক্রি করতে দেখে মনসার হৃদয় কেঁদে উঠেছে।

‘‘কাষ্ঠ বেচ্যা খাত্যে যদি চাঁদবাণ্যা যায়। হংসরথে বিষহরি দেখিবারে পায়।।
কাষ্ঠ বেচ্যা খায়্যা যদি সাধু যায় দেশে। আমারে দিবেক গালি যত মনে আইসে।।’’[৩৩৩]

কিন্তু নেতার পরামর্শে মনসা আবার যুদ্ধং দেহী মূর্তি ধারণ করেছেন। যখন চাঁদ কাঠের বোঝা নিয়ে পথ চলছে তখন হনুমানকে মনসা নির্দেশ দিয়েছেন চাঁদকে কষ্ট দেবার জন্য-

‘‘কাষ্ঠবোঝা লয়্যা দেখ চাঁদবাণ্যা যায়। তুমি গিয়া চাপ তার কাষ্ঠের বোঝায়।।’’[৩৩৪]

এখানেও মনসার খানিকটা দয়াময়ী রূপের পরিচয় মেলে। কারণ মনসা বলেছেন- ‘‘অধিক না দিঅ ভর সাধু পাছে মরে।’’[৩৩৫] নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে চলেছে চাঁদ। তবুও চাঁদ বারবার মনসাকে ‘চেঙ্গমুড়ি কানি’ বলে গালি দিয়েছে। এবার ক্ষুধার জ্বালায় চাঁদের প্রাণ যায় যায়। এই খিদের জ্বালায়-

‘‘হেনকালে দৈববশে এক দ্বিজবর। পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া গিয়াছে নিজ ঘর।।
কলা চোপা ইক্ষু গিরা গিয়াছে পেলায়্যা। দেখিয়া দাণ্ডায় সাধু মালসাট দিয়া।।
উলিয়া করিল স্নান তথা সরোবরে। গালবাদ্যে চাঁদবাণ্যা পূজে মহেশ্বরে।।
কলা চোপা খায়্যা সাধু গায় কৈল বল। অঞ্জলি করিয়া চাঁদ পান কৈল জল।।’’৩৩৬

ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য চাঁদ বন থেকে কাঠ এনে বিক্রি করেছে। কিন্তু আমরা দেখি চাঁদ তাঁর কাঠ যখন একটু বেশী দামে বিক্রি করেছে তখনই তৎকালীন সমাজের আসল পরিচয়টি ফুটে উঠল।-

‘‘চান্দের কাষ্ঠ কিনিল দিয়া পোন চারি।।
চান্দো বলে বিধি মোরে হইল ভাল মন।
এক বোঝা কাষ্ঠ বেচিলাম চারি পোন।।
এক পোনা দিয়া আমি ক্রিয়া শুদ্ধি করিমু।
এক পোন দিয়া আমি চিড়া কেলা খামু।।
এ[ক] পোন দিয়া আমি নটী নৃত্য চাব।
এক পোন দিয়া আমি সোনকা ভেটিব।।’’৩৩৭

এই তো পুরুষের আসল পরিচয়। এতদিন যে খিদের জন্য লালায়িত হয়েছে আজ কিছু পয়সা বেশী পেয়েই শখ আহ্লাদের সীমা নেই। সে যাক শখ-আহ্লাদ কিন্তু ‘নটী নৃত্য চাব’? কারণ এখানে তৎকালীন আর এ সময়কার যেকোন বণিক হোক না কেন একজন সাধারণ মানুষও যখন বেঁচে থাকার রসদ পেয়ে যায় তখনই তো জাগে তার কামানলের বহ্নি-জ্বালা। সদাগরের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের কর্ণধারের আসল পরিচয় ফুটে উঠেছে।

প্রতিহিংসা পরায়নী মনসা চাঁদকে দিয়ে যে সমস্ত কাজ করিয়েছেন তা মনুষ্যকূলের কোন মানুষই করাতে পারতেন না। বহুদিনের অভুক্ত চাঁদ সদাগর অনাহারে কালাতিপাত করেছে। এখন তাঁর আর পা চলছে না। এরপরও মনসা তাঁকে বারেবারে ছলনা করে চলেছেন। সামান্য খাবারের জন্য গৃহস্থের বাড়িতে দিনমজুরের কাজ করেছে সদাগর। কিন্তু এখানেও মনসার ছলনার জালে জড়িয়ে পড়েছে চাঁদ। মনসার ছলনায় ধানক্ষেত অন্ধকার হয়ে গেল। ফলে-

‘‘ধান্য না চিনে চান্দো সবে চিনে দুর।
ধান্য কাটিয়া চান্দো কৈল ভুর ভুর।’’৩৩৮

বিকেলে যখন মণ্ডল ধানক্ষেতে এসে দেখে চাঁদ ধান নিড়ানো দূরে থাক উপরন্তু সকল ধান কেটে ফেলেছে তখন-

‘‘সকলে আসিয়া তখন চান্দেরে ধরিল।
চোপার চাপড় মারি ঘাড়কাতা দিল।।

কেহ মাহে ঘাড়কাতা কেহ মারে কিল।
ঝড় বরিষণে যেন পড়ে দারুণ শিল।।’’[৩৩৯]

আবার জগজ্জীবনের কাব্যে দেখা যায় চাঁদ সদাগর তাঁর ক্ষুধা নিবারণের জন্য মুটে বহন করেছেন। কুম্ভকার তার ঘাড়ের ভার নামিয়ে চাঁদকে বলে-

‘‘কুম্ভকার বোলে বৃদ্ধ নিতে পার ভার।
চারিপণ কোড়ি দিব মজুরি তুমার।।
চান্দো বোলে আগে যদি মজুরি আমি পাই।
প্রাণ রাখি হাটে আগে কিছু কিনি খাই।।’’[৩৪০]

বেশ সেই মত কুম্ভকার চাঁদকে চারপণ কড়ি দেয়। চাঁদ সেই চারপণ কড়ি ধুতিতে বেঁধে কুম্ভকারের ভার নিজের কাঁধে নিয়ে চলল। অন্যদিকে মনসা ছলনা করে বাঘ হয়ে চাঁদকে ভয় দেখালে কুম্ভকারের সমস্ত হাঁড়ি ভেঙে যায়। আর কুম্ভকার চাঁদের মজুরি সমেত কেড়ে নেয় তার দেওয়া চারপণ কড়ি।

‘‘ভার লৈয়া চান্দো তবে কত দূর যায়।
সেই স্থানে পদ্মাবতী ব্যাঘ্র হৈয়া চায়।।
চমকি ফিরায়া লেঞ্জ মাথার উপরে।
আন্দোল করিয়া ব্যাঘ্র মহাশব্দ করে।।
আছাড়ে পড়িল চান্দো ভাঙ্গে সব হাঁড়ি।
চান্দোর মস্তকে মারে পজ্যারের বাড়ি।।
মজুরি সমেত তার কাঢ়ি নিল ধুতি।
দিগম্বর হৈয়া চলে সাধু চন্দ্রপতি।।’’[৩৪১]

চাঁদ সদাগরের করার কিছু নেই। লেঙটা চাঁদ আনমনা হয়ে ক্ষুধার কথা ভুলে গিয়ে এক তরুতলে উপস্থিত হয়ে ‘‘সেক করিয়া ছাল পরিধান করে।’’[৩৪২]এরপর ধীরে ধীরে হাটের দিকে এগোতে থাকে কিছু খাবারের আশায়। কিন্তু বাদ সাধল সেই মনসা। আবার মনসার ছলনায় পড়ে চোরের অপবাদ দিয়ে-

‘‘মস্তক মুড়িয়া তার ঢালি দিল ঘোল।।
ঢোল ফিরাইয়া বাহির করিল নগরে।
কান্দি কান্দি যায় চান্দো সদাগরে।’’[৩৪৩]

দীর্ঘদিন ধরে একমুঠো ভাতের জন্য এদিক সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে নানা কাজে লিপ্ত হলেও চাঁদ তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করতে পারেনি। অবশেষে বন্ধুবর মিতার বাড়িতে এলেও মনসা ছলনায় ভোজন পাত্রের অন্ন হরণ করে নিয়েছেন। তাই ‘‘ভাত না পায়ে চান্দ দুঃখ লাগে বড়ি।’’[৩৪৪]

যেকোন সমাজে অর্ধেক মাথা চুল থাকলে সকলে বুঝে নেন সেই ব্যক্তি কোন না কোন দুষ্কর্ম করেছে। আর চাঁদের বেলায় দেখি বিনা অপরাধে নেতার পরামর্শে মনসা ছলনা করে নাপিতের বেশ ধারণ করে চাঁদের-

‘‘বাম পাসের দাড়ি ফেলায় ডাহিন পাসের চুল।
মাথার উপরে ভেজায় মুড়া খুর।।
আসে পাসে দু পোছ দিলেক কপালে।
মরা পুড়িবার জেন খাচিল চিতা সালে।।
মুড়া ২ কহিলেক খুরত নাহি হাটে।
খিল ভূঞির চাসে জেন মুড়া লাঙ্গল ফোটে।।
চান্দো বিড়ম্বিতে বুদ্ধি করি বিসহরি।
ভাড়িত হনে বাহির কৈল পীত্তলের খুরি।।
এক খুরি পানি আন চলি জাও ঘাটে।
সুখান মাথা তোমার খুর নাহি হাটে।।
পানি খুরি আনিবার গেল সিগ্র করি।
চান্দোরে ভাড়িয়া হেথা গেল বিসহরি।।’’[৩৪৫]

মনসার বিড়ম্বনায় চাঁদের কপালে জুটল চোর অপবাদ। ফলস্বরূপ অপমানিত, লাঞ্ছিত চাঁদ গহিন অরণ্যের মধ্য দিয়ে নিজের নগরে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। চলেও আসেন কিন্তু নিজের স্ত্রীর কাছ থেকেও শুনতে হল সমাজের গর্হিত কাজে লিপ্ত হবার কথা।

‘‘ঘরে আসি পাইলা কেন এত অপমান।।
কোন ভির্ন্ন নারির সনে কহিয়াছ কথা।
কোন কার্য্যে কোন দোসে মুড়াইলা মাথা।।’’[৩৪৬]

নানা প্রতিকূলতার মধ্যে কালাতিপাত করার পর চাঁদ এবার ফিরে এসেছেন নিজ গৃহে। চাঁদ সব হারিয়ে ঘরে এসেছে। এখানেও মনসা চাঁদকে বিপাকে ফেলেছে। মনসা সনকাকে দৈববশে জানিয়েছেন আজ তার ঘরে চোর চুরি করতে আসবে। এমনকি চোরের চেহারা কেমন তাও মনসা সনকাকে জানিয়েছেন। দৈবজ্ঞের কথা স্মরণে রেখে কলাবনে সনকা এবং নাড়া গিয়ে দেখে কে যেন একজন চোরের মত বসে রয়েছেন। তাই দেখে-

‘‘কলাবনে চাঁদবাণ্যা খসু-মুসু নড়ে। লাফ দিয়া নাড়া গিয়া ঘাড়ে তার পড়ে।।
চোর চোর বলি তারে মারে কিল লাথি। চিনা পরিচয় নাই অন্ধকার রাতি।।
মারণ খাইয়া চাঁদ হইল কাতর। আর না মারিস নাড়া আমি সদাগর।।

এতেক শুনিঞা নাড়া রাখিল মারণ। প্রদীপ জ্বালিয়া মুখ করে নিরীক্ষণ।।
পরিচয় পায়্যা তবে সনকা লজ্জিত। ক্ষেমানন্দ বিরচিল দেবীর সঙ্গীত।।’’[৩৪৭]

নারায়ণ দেবের কাব্যে মনসা ছলনা করে দৈবজ্ঞে সনকাকে বলেছেন আজ খিড়কির দুয়ার দিয়ে ভূত আসবে। সেই দৈবজ্ঞের নির্দেশকে শিরোধার্য করে ছয় পুত্রবধূদের নিয়ে সনকা পাহারায় রয়েছেন। এমন সময়-

‘‘এক তেনা পরিধান বিক্রিত আকার।
খড়কী দুয়ারে জায় গড়ের মাঝার।।
লাফ দিয়া সাধু গড়খাইত পড়িল।
তখনে পানির সব্দ ঝপরিয়া উঠীল।।
হাতে সান দিয়া দুর্ব্বলি মারে তুড়ি।
ছয় বধূ সতাড় হও ভূতে লইল বাড়ি।।
কতক্ষণে জলেহনে উঠীল সদাগর।
বেতকুচাই কাটা ফুটীল বিস্তর।।
চোরের মত হইয়া জায় বাড়ির ভিতর।
দুর্ব্বলি দেখিয়া তারে কাছিল কাপড়।।’’[৩৪৮]

অন্যদিকে পুত্রবধূরা সকলে মিলে চোর সদাগরকে ধরে ফেলেছে। ধরবার পর ছয় পুত্রবধূ-

‘‘কেহ মারে লাথি চড় কেহ মারে ঝাটার বাড়ি।
আগুন হাতে লৈয়া কেহ পোড়ে গোপ দাড়ি।।
কেহ চুলে ধরি মারে নেয় ছেচুড়িয়া।
বজ্র লাথি মারে কেহ বুকেতে বসিয়া।।
বান্দি বেটী বসিলেক সদাগরের বুকে।
বারে ২ লাথি মারে গালে আর মুখে।।

*** *** ***

দুই পায়ের গোড়া চান্দোর মুখের পর ঘসে।।
পায়ের ধুলা য়েড়ে বেটী সিরের উপরে।
কল্যাণ ২ করি আসির্ব্বাদ করে।।
চান্দো বোলে বান্দী বেটী আদি রস তর।
আমাকে না চিন আমি চান্দো সদাগর।।

*** *** ***

চারি হাত পাও ভূত জানিলাম সন্দি।
চান্দোর নাম লও বেটা ভাড়িয়া জাইবার বুর্দ্ধি।।''[৩৪৯]

এবার চাঁদ অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগল। আর বারবার ছয় পুত্রবধূদের বলতে লাগল আমি তোমাদের শ্বশুর। ছয়পুত্র বধূরা এবার শাশুড়ী সনকার কাছে এসে সমস্ত বলার পর-

''এত সুনি বুলিলেক সোনকা সুন্দরি।
ছয় বধূ থাক মোর লখাইর পহরি।।
তবে সে জানিব আমি রাজা চন্দ্রধর।
এক চির্ন্ন আছে তার হাতের উপর।।
প্রদিব জালিয়া দেখিমু তাহার হাতে।
জদি প্রভু হয় চিনিমু সেহি হইতে।।
এতেক কহিয়া সোনাই ঘরের বাহির হইল।
প্রদিব জালিয়া আসি চাহিতে লাগিল।।
দুইজনে দেখা হইল চাইর লোচনে।
আপনার প্রভু সোনাই দেখিল বিদ্যমানে।।
চির্ন্ন দেখিল সোনাই হাতের উপর।
বিসাদ ভাবিয়া কান্দে চান্দোর গোচর।।''[৩৫০]

''চাঁদোর মস্তকে ঝাউয়া রাখিয়া চরণ। পত্র কাটে নিজ সুখে নাহি করি মন।।
মাথায় বেদনা পায়্যা চাঁদো নাড়ে গা। ভুল ভুল করি ঝাউয়া ডাকে উচ্চ রা।।
ত্রাসে ঝাউয়া কহে গিয়া সনকা নিকটে। পড়িয়া ভুলের হাতে আইনু সঙ্কটে।।
শুনিয়া ভুলের নাম ত্রাস সর্বজন। সব ঠাঁট লইয়া বেড়ে রাম কলাবন।।
মৃতাবত হইয়া চাঁদো কান্দে মন-দুঃখে। হেন অপমান মোর হইল লোকমুখে।।
বিনি পাপ ক্ষেমে মোরে গঠিল গোসাঞি। ছয় পুত্র মৈল কেন মোর মৃত্যু নাই।।
দেখি কি বলিব মোরে যত পুরী জন। হেট মুন্ড করি রাজা ভাবিল তখন।।
আর কেহ না চিনিব আমি চাঁদো রাজা। ভুল বলি মোরে বধ করিবেক প্রজা।।

*** *** *** ***

সনকা ঘরের মধ্যে নৃপতি বাহিরে। প্রদীপ ধরিয়া দেখে সভয় অন্তরে।।
মহামন্ত্রি সনকা জানিল সুনিশ্চয়। প্রভুর দুর্গতি দেখি বেথিত-হৃদয়।।''[৩৫১]

হাজার পথ অবলম্বন করেও মনসা চাঁদের মাথা হেঁট করাতে পারেনি। বারেবারে মনসাও হয়েছেন বিফল। এবার মনসা কোন পথ অবলম্বন করেন তা সবার জানা। বাসর রাতে চাঁদ সদাগরের সপ্তম

পুত্র লখিন্দরকে বধ করে চাঁদের কাছ থেকে মনসা মর্ত্যে পূজা পাবার শেষ প্রচেষ্টা চালাবেন। এই পরিকল্পনা মাফিক মনসা তাঁর কার্য সিদ্ধি করার জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু ছয় পুত্র হারা সনকা একমাত্র বংশধর লখিন্দরকে বিয়ে দিয়ে মনসার সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে চায়নি। দেব-দেবীর কাছে সাধারণ মানব-মানবী একেবারে অসহায়। দেবী মনসার সক্রিয়তায় লখিন্দরকে বিবাহের জন্য প্রস্তুত করিয়ে তুলেছেন। লখিন্দর যাতে নিজেই বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তার ব্যবস্থা করলেন মনসা। লখিন্দরের পৌরুষকে জাগ্রত করার জন্য ছলনাময়ী মনসা ছলনা করলেন।-

‘‘বানিয়ার নন্দন বাঢ়ে বানিয়ার ঘরে।
পঞ্চ বৎসরে বালা কর্ণবেধ করে।।
পঢ়িবারে দিল বালা গুরু বিদ্যমানে।
পঢ়িয়া আসয়ে বালা আপনা ভবনে।।
পঞ্চদশ বৎসরে ষোড়শে দিল পায়।
বিবাদ কারণে বিভা না দেয় বাপ মায়।।
গুরুস্থানে পঢ়ে বালা শিশু সঙ্গে করি।
ব্রাহ্মণের কন্যারূপে গেলা বিষহরি।।
কটাক্ষে বালার পানে চাহে ঘনেঘন।
হাস্য পরিহাস্য করে বানিয়ার নন্দন।।
ক্রোধ হইয়া কন্যা বোলে দুর্ল্লভ নখাই।
আমাকে দেখিয়া হাস নহিবে চিরাই।।
তুমার ধন আছে বান্ধিতে পার সেতু।
বাছিয়া সুন্দরী কন্যা বিভা না কর কি হেতু।।
হইল খুবড় তুমি প্রাণ কেনে ধর।
পরের সুন্দরী দেখি উপহাস্য কর।।
কন্যার বচনে বালা মনে অভিমান।
আপন মন্দির লাগি করিল পয়ান।।’’[৩৫২]

বেশ বাড়িতে এসে লখিন্দর ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে। এদিকে সনকা পুত্র লখিন্দরকে না দেখতে পেয়ে সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসে দেখে, পুত্র লখিন্দর তার শয়ন কক্ষে শুয়ে আছে। মা সনকা বারবার তাকে বাইরে আসবার অনুরোধ করলে লখিন্দর বলেছে-

‘‘সনা বোলে তুমি মোর প্রাণ সব ধন।
সত্য সত্য বোলিলাম তোমায় বচন।।
বালা বোলে বিভা দিতে কর অঙ্গীকার।
তবেত জননী আমি ঘুচাই দুয়ার।।
সনকায় বোলে ই কথা না কহিয় বাপ।
বিভা রাত্রিতে বাছা খাইবে কাল সাপ।।
দ্বার ঘুচাহ বাছা কর স্নান ভোজন।
দাসী করি দিব একশত নারীগণ।।’’[৩৫৩]

শুধু এখানেই ক্ষান্ত হননি মনসা। নিজের কাজকে করায়ত্ব করার জন্য মনসা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে লখিন্দরকে ছলনাময়ী মনসা নিজের মামীর সঙ্গে স্বপ্নে রতিসুখকে উপভোগ করিয়েছেন। এমনকি পরের দিন ঘাটে গিয়ে মামীকে বলপূর্বক হরণ করে রতিসুখ করতে পারে তাও স্বপ্নে জানিয়ে দিয়েছেন মনসা। যথারীতি মনসা ধরলেন মামী কৌশল্যার রূপ। আর যথাসময়ে কৌশল্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল লখিন্দরের।

‘‘নেতা বোলে কামসোনাকে দেহ ডাক।
কোসল্যার মূর্ত্তি ধরি ছলুক বালাক।।

*** *** ***

পদ্মা বোলে কামসোনা মোর বাক্য ধর।
কোসল্যার রূপে ছল চান্দোর কুমার।।

*** *** ***

চলিল কামসুন্দরী নানা মত বেশ করি
ছলিতে দুর্ল্লভ লখিন্দর।
পদ্মার বচন ধরি কোসল্যার রূপ ধরি
শীঘ্র চলে বালার বাসর।।
সপনে বালার সঙ্গে রতি-রস করে রঙ্গে
হৃদয়ে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখে দিয়া মুখ চুম্বনে পরম সুখ
ভুজমূলে করিয়া বন্ধন।।

*** *** ***

বোলে কন্যা রূপবতী আজ্ঞা কর নিজ পতি

আজি করি ঘরকে গমন।
প্রভাতে যাইব জলে সরোবর বটতলে
তুমি আমি হইবে দরশন।।''[৩৫৪]

অন্যদিকে ছলনাময়ী মনসা মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে কৌশল্যাকে স্বপনে বলেছেন-

''উঠ উঠ রূপবতী সরোবরে যাও।
সরোবর-স্নানেতে অনেক ফল পাও।।
এতদিন বঞ্চ তুমি চম্পলা নগরে।
স্নান নাই কর তুমি দীঘি সরোবরে।।
আজি যায়া কর তুমি সরোবরে স্নান।
স্বামীর সংহতি হবে ধনপুত্রবান।।''[৩৫৫]

শাশুড়ির অনুমতি নিয়ে এবং সখীদের সঙ্গে করে সরোবরে স্নানে গিয়েছে কৌশল্যা। স্নান সেরে ফিরে আসবার পথে দেখা বানিয়া-নন্দন লখিন্দরের। লখিন্দর জোরপূর্বক মামী কৌশল্যাকে ধর্ষণ করেছে। তাই দেখে কৌশল্যার যত সখী ছিল তারা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

''শুনিয়া ক্রোধিত গন্ধবণিকনন্দন।
কাচুলি ফেলিয়া কৈল কুচের মর্দ্দন।।
কুচের উপরে বালা দিল নখরেখ।
গিরিশৃঙ্গে দ্বিতীয়ার চন্দ্র পরতেক।।
অধর চুম্বন করে বান্ধি ভুজপাশে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন রাহুয়ে গরাসে।।
লণ্ডভণ্ড করিয়া ছিড়িল গলার হার।
বিবিধ প্রকারে বালা ভুঞ্জিল শৃঙ্গার।।
ভাঙ্গিয়া কলস গেল শঙ্খ হৈর চূর।
যত সব সখী ছিল পলাইল দূর।।
পায়ের নপুর ভাঙ্গি কৈল ছারখার।
বস্ত্র অভরণ ফেলে বহুমূল্য যার।।
টুটিল মদন-জ্বালা তুষ্ট হৈল মন।
স্নান করি ঘরে চলে বানিয়ার নন্দন।।''[৩৫৬]

এ কেমন দেবী। যিনি একদিকে দেবী অন্য দিকে একজন মানবী রমণী। তিনি একজন নারী হয়ে অন্য নারীকে ধর্ষণ করার পথকে প্রস্তুত করে দিয়েছেন। একেই বোধ হয় বলে ক্ষমতা। ক্ষমতাকে

নিজের করায়ত্ব করতে আর কতদূরে নামতে পারেন একজন সাধারন নারী। ভাবতে অবাক লাগে এই ক্ষমতার স্পৃহায় আজকের সমাজেও তো দেখা যায় হাজার হাজার ধর্ষণের প্রতিচ্ছবি। আর যদি কেউ প্রতিবাদের সাহস দেখায় তাহলে তার কপালে হাজারো অপবাদ লেপন করে দেওয়া হয়। বলা হয় খারাপ মেয়ে বা দেহ ব্যবসায়ী। বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক দুনিয়ার দৌলতে আমরা খবরের কাগজে কিংবা টিভির পর্দায় এরকম হাজার হাজার ধর্ষণের প্রতিলিপি দেখতে পাই। আর মধ্যযুগ বলে কথা, সেখানে তো টিভির পর্দা ছিল না। পুরুষেরা এমন অনেক নারীকে ভোগ করে পথে-প্রান্তে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

এই ঘটনা জানার পর বণিক সমাজের কাছে যাতে মাথা হেঁট করতে না হয় তাই এবার সনকা এবং চাঁদ সদাগর মনস্থির করে লখিন্দরকে বিবাহ দেবে। চাঁদ বের হল পাত্রীর সন্ধানে। নানা পাত্রীর সন্ধান শেষে নেতার পরামর্শে এবং ছদ্মবেশিনী মনসার উদ্যোগে চাঁদ উজানী নগরের সাহো সদাগরের কন্যা বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরকে বিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেক কবি তাঁর নিজ নিজ কাব্যে এই ঘটনার মধ্যে কিছু কিছু রঙিনতার ঝলক সৃষ্টি করেছেন। নারায়ণ দেবের কাব্যে দেখা যায় বেহুলা বাল্য বয়স থেকে মনসার ভক্ত। একদিন রাত্রে মনসা স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন-

‘‘উঠ ২ বিপুলা কতেক নিদ্রা জাও।
আমি পদ্যা আসিয়াছী চক্ষু মেলি চাও।।
কালি প্রভাতে জাইয় তির্থ মুক্তাসার।
মনের বাঞ্চিত তোমারে দিব বর।।’’[৩৫৭]

মনসার স্বপ্নাদেশকে শিরোধার্য করে এবং মা-বাবার অনুমতি নিয়ে বেহুলা গেছে মুক্তাসারে স্নান করতে। কিন্তু বিজয় গুপ্তের কাব্যে বেহুলাকে তার মা মেনকা বলেছে-

‘‘পর পুরুষ দেখিতে তোমার হইছে মন।
কপট করিয়া এত কান্দ কি কারণ।।
আমার ঠাঁই না বিকায়ে তোমার নারীকলা।
পরপুরুষ চাহিতে স্নানে হইল মেলা।।’’[৩৫৮]

এরপর পিতা সাহের অনুমতি নিয়ে মুক্তাসারে স্নান করতে গিয়েছে বেহুলা। যাবার আগে বেহুলার পিতা তাকে সতর্ক করে বলেছে-

‘‘সাহে বলে রাজপথে জজ্ঞাল বিস্তর।
স্নান করিয়া শীঘ্র আসিয় সত্বর।।’’[৩৫৯]

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে লখিন্দরের মত মনসা বেহুলাকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিয়ে করার জন্য সম্মতি আদায় করেছে। ব্রাহ্মণী বেশধারী মনসা বেহুলাকে বলেছে-

‘‘ছাড় খেলা শিশুমেলা সাহের নন্দিনী।
বিবাহের কার্য্য তুমি চিন্তহ আপনি।।
বয়ঃক্রম হৈল তার পয়োধর ভার।
এমন বয়সে বোলো স্বামী নাহি কার।।
তোমার ছোট জন হৈল ছাওয়াল পুয়াতি।
তুমি হেন সুন্দরী তোমার নাই পতি।।
এমন বয়সে তোকে বিভা না দেয় বাপে।
না মিলিবে স্বামী তোর পূর্ব্বজন্ম পাপে।।’’[৩৬০]

এ কথা শোনারপর ব্রাহ্মণীকে বেহুলা বলেছেন আমার গতি করুন। বেশ সুযোগ বুঝে মনসা বলেন-

‘‘বালী বোলে ঠাকুরাণী কর মোর গতি।
কি বুদ্ধি প্রকারে আমি পাবো নিজ পতি।।
ব্রাহ্মণী বোলে বালী ছয় ঘাটিকে যাঅ।
তাতে স্নান করিলে স্বামীর বর পাঅ।।’’[৩৬১]

প্রতিটি মঙ্গল কাব্যে দেখা যায় মুক্তাসারে স্নান করার সময় দেবী মনসা বেহুলার সামান্য ভুলের জন্য কঠিন অভিশাপ দিয়েছেন-

‘‘স্নান করয়ে বেউলা আপনার মনে।
মায়া বেসে পদ্যা জায় কিছুই না জানে।।
খণ্ডাইতে না পারি দৈবের জে বাণি।
বিধুবার গায়ে গেল গোড়ালিয়া পানি।।
কোপ করি বিধুবায় বুলিল বচন।
কথাকার পাপিষ্ঠ ছার হেন অভাজন।।

*** *** ***

এতখানি রাগ তোমার প্রথম বয়সে।
ব্রাহ্মণ না চিন তুমি বণিক জাতির দোসে।।
কাল রাত্রিত বিধুবা তুমি হইবা নিশ্চয়।
প্রিথিবিত তোমার জেন বংস নাহি রয়।।
কোপ করি বুলিলেক কুমারির আগে।
কালরাত্রিত প্রভু তোর খাউক কালনাগে।।’’[৩৬২]

বিপ্রদাসের কাব্যে রয়েছে-

‘‘অবধান নাহি করো দেখিয়া ব্রাহ্মণী। কোন গর্বে মোর অঙ্গে দিলা তো গোড়ানি।
জানিবি পশ্চাতে চূর্ণ হবে অহঙ্কার। শাপ দিনু বিবা-রাত্রে খাইবা ভাতার।।’’[৩৬৩]

‘‘খসায়া সভার বস্ত্র রাখে এক স্থানে।
ঝাপাঝাপি করিয়া নাবিল সর্ব্ব জনে।।
সখীসঙ্গে জলক্রীড়া করে বানিয়ানী।
বিধবার গায়ে পড়িল পায়ের পানি।।
বিধবায়ে বোলে ওঠে ঢেট মুরুদারি।
কাহার ঝিয়ারি তুমি কাহার বৌহারি।।
তোর পায়ের পানিতে ভরিল মোর অঙ্গে।
বিভারাত্রি স্বামী তোর পড়িবেক ডঙ্কে।।’’[৩৬৪]

‘‘ঘাটের কিনারে বুড়ী রহিল বসিয়া। বেহুলা নাচনী যায় হাসিয়া হাসিয়া।।
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ে বেহুলা নাচনী। মনসার অঙ্গে লাগে গোড়ালির পানি।।

*** *** ****

বুড়ী বলে সে সব আমার কর্ম্মদোষ। দুজনে করিব স্নান হয্যা পরিতোষ।।
কার হাথে কিবা উঠে দেখিব এখন। প্রতিজ্ঞা করিয়া ডুব দিল দুইজন।।
মনসার হাথে উঠে শঙ্খ-চন্দন। বেহুলার হাথে উঠে ভূষণ কঙ্কণ।।
ভূষণ কঙ্কণ দেখি দেবী দিল শাপ। বাসরে মরিব পতি পাবে মনস্তাপ।।’’[৩৬৫]

সনকার কাছে জানতে পারেন যে, বিয়ের বাসর রাতে মনসা তাঁর নয়নের মণি লখিন্দরকে দংশন করবে। কিন্তু অহংকারী চাঁদ সদাগর একথা শোনার পর বলে-

‘‘এতেক বলিল যদি সনকা বাণ্যানী। সাধু বলে কি করিব চেঙ্গমুড়ি কানি।।
যেইদিন বিবাহ করিব লখীন্দর। তার লাগি গড়াইব লোহার বাসর।।’’[৩৬৬]

এরপর যথাসময়ে বেহুলা ও লখিন্দরের বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু চরম দুর্ভোগের আর তো বেশী দূর নেই। আজ মনসার চরম পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে চাঁদের কাছ থেকে পূজা পাওয়া সহজ হবে বলে মনে করেছেন মনসা। পত্নী সনকার কাছে শুনেছেন বাসর রাতে চাঁদের প্রিয় পুত্র লখিন্দরের মৃত্যু ঘটবে। তাই চাঁদ সাঁতালি বা সান্তালি পর্বতে লৌহ দিয়ে গড়লেন বিশাল ইমারত। সেখানে পুত্র লখিন্দরের বাসর রাত উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু মনসার চক্রান্তের কাছে এখানেও চাঁদকে হার মানতে হয়েছে। যদিও সহজে এ কাজ করতে পারেনি মনসা। তাঁর সমস্ত নাগদের ব্যবহার করলেও সকলে লখিন্দরকে দংশন করতে পারেনি। সুদীর্ঘ দিনের কঠোর সাধনা এক লহমায় ব্যর্থ হয়ে যায় দেখে মনসা পাগলের মত হয়ে যায়।

‘‘কান্দে নরনাগমাতা ভাবিয়া অন্তর।
জিনিতে না পারিলাম আমী বাদুয়া সদাগর।।
তিন প্রহর রাত্রি জায় আছে এক প্রহর।
রজনি পহাইলে লখাই হইব অমর।।
উনকুটী নাগ আমী আছাড়ে মারিমু।
চান্দোর বিবাদে আমি পাতালে পসিমু।।
বেটা নিরবধি গাইল পাড়ে বেঙ্গখাউকা কানি।
কত বা সহিব আমার দেবের পরানি।।
বিপাকে ঠেকীল নেতা কিবা হয়ে জানি।
চান্দোর দাসী কর্ম্ম করি রহিয়া খাইব পানি।।’’[৩৬৭]

ফলস্বরূপ যা হবার তাই হল। লখিন্দরের মৃত্যু ঘটল কাল নাগিনীর দংশনে। কালনাগিনীকে বিপুল ঐশ্বর্যের লোভ দেখিয়ে মনসা তাকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে। তবে এই দংশন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রত্যেক কবি তাঁর নিজ নিজ স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। লখিন্দরকে দংশনের ব্যাপারে মনসাকে তেমনভাবে কোন দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায় না। যাকে দিয়ে মনসা লখিন্দরকে দংশন করাবেন সেই কালনাগিনী প্রত্যেক কবির কাব্যে দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছে। কালনাগিনীর মনে দয়াবশত রূপটি প্রত্যেক কবিই অঙ্কণ করেছেন।-

‘‘কান্দে ২ কাল নাগ লখাইর রূপ দেখি।
এড়িয়া গেলে পদ্যা আমারে হইব দুখি।।
ভুবন জিনিঞা লখাইর রূপ বেস।
চাচর জিনিঞা আছে সুন্দর মাথার কেস।।
প্রভু কোলে করি বেউলা সুইয়াছ পাসে।
আইজ রাড়ি হইবা তোমার সসুরের দোসে।।

*** *** ***

কান্দে ২ কালনাগ কষ্ট করি মনে।
কেমতে ধরাইব ইহার মায়ের পরানে।।

*** ***

ইহার লাগি মনসা জদি কাটেত আমারে।
তমু ঘাও না দিব আমী ইহার সরীরে।।’’[৩৬৮]

‘‘এ হেন সুন্দর গায় কোন্‌খানে খাব। দেবী জিজ্ঞাসিলে তারে কি বোল বলিব।।’’[৩৬৯]

‘‘লখাইর রূপ দেখিয়া বলে হায়ে হায়ে।
এমত অসখ্য কর্ম্ম করেন পদ্মায়ে।।
করুণা করিয়া নাগ কান্দিবার লাগে।
উচ্চস্বরে মন দুখে কান্দে কালিনাগে।।’’[৩৭০]

কালনাগিনী দংশন করতে পারল না লখিন্দরকে। ফিরে এসেছে মনসার কাছে। কিন্তু মনসা চতুরা দেবী। তাই মনসা এবার সর্বস্ব হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আকুলভাবে ক্রন্দন করতে শুরু করল। এই কান্না দেখে কালনাগিনী স্থির থাকতে পারল না।

‘‘সুনিঞা নাগের বানি কান্দে পরাজয় ক্ষানি
কান্দে পদ্যা অঝর নঞানি।
জেহ নাগ ছিল বড় সেহ নাগ খাইল লড়
অখন চান্দোর বৈয়া খাইমু পানি।।
নাগে বোলে বিসহরি সুন নিবেদন করি
স্থির হও মাও না কর ক্রন্দন।
অসম সাহস করি জাইমু চম্পক পুরি
নারায়ণ দেবের সুরচন।।’’[৩৭১]

আর বিপ্রদাস পিপিলাই এর কাব্যে দেখা যায় যে, কালনাগিনী যখন লখাইকে দংশন করছে না তখন মনসা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলতে লাগল-

‘‘হেন রূপ দিব্য গুণ হইয়া অতি নিদারুণ
কেমনে হানিব দন্ত-ঘা।
এহেন পুত্রের শোকে বিষম কঠিন দুঃখে
না জীবে ইহার বাপ মা।।
নাগিনী মমতা দেখি বিষহরি ক্রোধমুখি
নিগদন্তি আকাশবচনে।
চাঁদো রাজা নিন্দে মোরে তার পুত্র দংশিবারে
তোমার মমতা কি কারণে।।’’[৩৭২]

তাই কালনাগিনী দংশিল লখিন্দরকে। এবার মনসার প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রটি আর প্রকট হয়ে উঠল। বেহুলার অকাল-বৈধব্য কিংবা সনকা বা চাঁদের সপ্তম পুত্র লখিন্দরের জন্য এতটুকু হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করেননি মনসা। বরং মনসার প্রতিষ্ঠা লাভের পথকে সুপ্রস্তুত করতে পেরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠেছে-

‘‘মনসা বোলেন বাণী শুন বাছা নাগিনী
বাহির হঅ সত্বর গমনে।
সাধিলে বিষম বাদ নেহ আসি পরসাদ
চল যাই আপন ভুবনে।।
ধন্য তোর জন্মদাতা সাফল তোমার মাতা
যার গর্ভে হৈল তোর জন্ম।
বানিয়ার অহঙ্কার সব হৈল ছারখার
সাধিলে দারুণ মহাকর্ম্ম।।’’[৩৭৩]

এখানে মনসা বড়ই নির্মম। নির্মমতার পিছনেও তো রয়েছে অজস্র কারণ। দেবী কিংবা মানবী মনসাকে তো যারপর নাই অপমান সহ্য করতে হয়েছে। পুরুষের কামানলের বহ্নি শিখরে পড়েছে অনেকবার। কিন্তু বাঙালি রমণীর বড় সম্পদ সতীত্ব। সেই সতীত্বকে মনসা কখন কোনভাবে বিসর্জন দেননি। একদিকে অবৈধ কামনার জারজ সন্তান মনসা। পিতার পরিচয়ে যে কখন বড় হয়ে ওঠেনি। পায়নি মায়ের কোমল স্পর্শ। মনসা কখন দেখেনি কোমলতার বীজ কীরূপ। পিতার পরিচয়ে বড় হয়ে ওঠার আকাঙ্খায় পিত্রালয়ে গেলেও বিমাতা চণ্ডী মনসার কাঁকালি ভেঙ্গে দিয়েছে। লৌহ শলাকা দিয়ে চক্ষু কানা করে দিয়েছে। স্বামী সঙ্গ পায়নি কখন মনসা। কিছুদিনের জন্য পিতা মহাদেবের লালনে পালিত হলেও বিমাতার কু-চক্রান্তের শিকার হয়ে আজ বনবাসী। তাই আজ নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যেকোন হীন কর্ম করতে তার এতটুকু দয়া না হওয়ারই কথা। তাঁর পিতার কাছে শুনেছেন যদি চাঁদ সদাগর তাঁকে যে কোনভাবে পূজা দেয় তাহলে সমাজের সকলে তাঁকে মেনে নেবেন। এমতাবস্থায় মনসা অনেক বেশী জেদী অহংকারী। হওয়াটাও স্বাভাবিক। কিন্তু মনসারও তো করার কিছু নেই। আবার এও তো দেখা যায় মনসা অনেক সময় দয়াময়ী হয়ে একদিকে সকলের ভাল করতে চেয়েছে। তিনি তো চাঁদকে বারংবার অনুরোধ করেছেন তাঁকে যেনতেন ভাবে একটুখানি পুষ্প জল দিক। মনে পড়ে-

‘‘রথভরে মনসা ডাকিয়া বোলে বাণী।
এখন বিবাদিয়া চান্দো পূজহ ব্রহ্মাণী।।
ব্রহ্মাণীর নামে তুমি দেহ ফুলজল।
ধনপুত্রে সাধু তুমার হইবে কুশল।।
হারাঞাছে ধনজন বাহুড়িবে ঘরে।
মরা পুত্র পাইবে দুর্ল্লভ লখিন্দরে।।’’[৩৭৪]

এরপর দেখা যায় দেবী মনসার একান্ত ভক্ত বেহুলা, মনসার উপর আস্থা রেখেই স্বামীর মৃতদেহকে নিয়ে গাঙুরের জলে ভেসে চলেছে। বেহুলার বিশ্বাস যদি কোন প্রকারে স্বামীর প্রাণ ফিরে পাওয়া যায়। তাই বেহুলা দেবীর কথামত লখিন্দরকে সঙ্গে নিয়ে কলার মান্দাসে বেড়িয়ে পড়েছে। আর দেবী মনসা তিনিও বিমুখ হলেন না। এ জন্য বেহুলার প্রতি তিনিও সহৃদয়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন-

‘‘সকল বিদ্যা জানে পদ্মা জগতের মাতা।
বেউলার বচনে দেবীর মনে লাগে ব্যথা।।
সাত পাঁচ পদ্মাবতী ভাবে মনে মনে।
অন্তরীক্ষে ডাকিয়া কহে বেউলার স্থানে।।
পদ্মা বলে বেউলা তুমি স্থির কর মন।
এত অপমান তুমি ভাব কি কারণ।।
শিশুকাল হতে সেবা কর অতিশএ।
মোর বিদ্যমানে তোমার কারে আছে ভএ।।
যদি পথে যাইতে তুমি মনে পাও ভএ।
ভক্তিভরে তুমি মোরে ভাবিয় হৃদএ।।
ভএ পাইয়া তুমি যদি করহ স্মরণ।
তথাএ গিয়া পদ্মা তোমাএ করিব রক্ষণ।।’’[৩৭৫]

বেহুলার পরম ভাগ্য হীনতার সংবাদ তার পিতৃগৃহে প্রেরণের জন্য শ্বেতকাক রূপে নেতাকে বেহুলার কাছে মনসা পাঠিয়েছে, যাতে শ্বেতকাক বেহুলার চিঠি উজানীনগরে পৌঁছে দিতে পারে-

‘‘পদ্মার বচনে নেতা আস্তে বেস্তে লড়ে।
শ্বেত কাক হইয়া নেতা মাজুষেতে পড়ে।।
অন্তরীক্ষে থাকি পদ্মা কহে বেউলার ঠাই।
কি নিদর্শন দিবা তুমি দেও কাক ঠাই।।’’[৩৭৬]

মনসা বার বার বেহুলাকে পরীক্ষা করেছে। কারণ মনসা দেখতে চান বেহুলার ভক্তি অবিচল আছে কিনা? যদি ভক্তি অবিচল থাকে তবেই তো মনসা পূজা প্রচারে সচেষ্ট হবেন, আর মর্ত্যলোকে তার কাঙ্খিত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবেন।

‘‘পদ্মা বোলে সুন নেতা আমার উত্তর।
কাক সকুন রূপে জাও বেউলার গোচর।।
মড়া মাংস ভিক্ষা কর বিপুলার স্থানে।
আইজ বুঝি বিপুলার কিবা আছে মনে।।’’[৩৭৭]

বেহুলা যখন কোন না কোন বিপদে পড়েছে তখনই মনসা নিজ ভক্তকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। তাই দেবী মনসা মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার আশায় যখন কলার ভেলায় করে যাত্রাপথে বাহির হয়েছে তখন-

> ‘‘সকল বিদ্যা জানে পদ্মা জগতের মাতা।
> বেউলার বচনে দেবীর মনে লাগে ব্যথা।।
> সাত পাঁচ পদ্মাবতী ভাবে মনে মনে।
> অন্তরীক্ষে ডাকিয়া কহে বেউলার স্থানে।।
> পদ্মা বলে বেউলা তুমি স্থির কর মন।
> এত অপমান তুমি ভাব কি কারণ।।
> শিশুকাল হতে সেবা কর অতিশএ।
> মোর বিদ্যমানে তোমার কারে আছে ভএ।।
> যদি পথে যাইতে তুমি মনে পাও ভএ।
> ভক্তিভরে তুমি মোরে ভাবিয় হৃদএ।।
> ভএ পাইয়া তুমি যদি করহ স্মরণ।
> তথাএ গিয়া পদ্মা তোমাএ করিব রক্ষণ।।’’[৩৭৮]

মরা স্বামীকে ফিরিয়ে পেতে বেহুলা বদ্ধ পরিকর। যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে বেহুলা মনসা তখন তাঁর কথা রেখেছে। মনসা সেখানে নিজে গিয়ে বেহুলাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে।

আজ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বেহুলা শত বাঁধার সম্মুখীন হলেও দেবী মনসা তাকে উদ্ধার করেছে। আমরা জানি ভক্তের ডাকে ভগবান সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না। দেবী মনসাও বেহুলার ডাকে সাড়া দিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল দেবীর সঙ্গে তো বেহুলার কোন বৈরিতা নেই। বৈরিতা তো চাঁদের সঙ্গে। চাঁদের কাছ থেকে বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে দেবী মনসা কী তাহলে বেহুলার আশ্রয় নিয়েছেন। হতেও পারে। সেইজন্যে বোধ হয় দেবী মনসা বেহুলার দুঃখে দুঃখিত হয়ে বারেবারে তার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে এসেছেন তার কাছে। মরা স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য মনসাও তাঁর সর্বশক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় বেহুলা হাজারও বিপদের সম্মুখীন হলেও সে বিপদকে বিপদ ভাবতে দেননি। তাই আজ শত সহস্র বাঁধাকে অতিক্রম করে এসে বেহুলা পৌঁছল দেবতাদের সভায়। দেবাদিদেব মহাদেব সমেত পুরুষ সমাজের কর্ণধারেরা বেহুলার নৃত্য-গীতে মুগ্ধ হয়ে তাকে বর দিতে চাইল। বেহুলা তার মরা স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার আর্তি জানালে দেবাদিদেব মহাদেব হেসে বলেছেন-

‘‘যাহারে মারিয়া রাখে জয় বিষহরি। কাহার শকতি তারে জীয়াইতে পারি।।
সেই বিষহরি যদি করেন কল্যাণ। তবে সে তোমার পতি পায় প্রাণদান।।
যাহা সনে বিষহরি করেন বিবাদ। কেবা তারে দিতে পারে অভয় প্রসাদ।
মনে মনে জপ তুমি মন্ত্র মনসার। মনসা-বিহনে তব নাহি প্রতিকার।।
হরের বচনে বলে দেবগণ যত। মনসারে আনিবারে চল তুমি নেত।।
বেহুলার পূর্ণ কর মন-অভিলাষ। জগতে জগতী-পূজা হউক প্রকাশ।।’’[৩৭৯]

আজ মনসা প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় পাগল-হারা হয়ে ছুটে চলেছেন। সমাজে গর্হিত হিসেবে এতদিন তাঁকে যেভাবে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে আজ তার অবসান হতে চলেছে এই ভেবে মনসা অপ্রতিহত বেগে ধেয়ে চলেছেন স্বর্গ রাজ্যে। এতদিন মনসা যে সমস্ত কাজ করেছেন তার জন্য কাউকে কিছু বলতে না হলেও আজ মনসা দেব-সভায় নিজের কর্মের জন্য খানিকটা বিব্রতা হয়েছেন। এমনকী মনসা আজ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। মিথ্যার জালে নিজ কর্ম দোষকে ঢাকবার জন্য নানা ধরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু পাপ ছাড়ে না বাপকে। মনসার ক্ষেত্রেও কেন তার বিপরীত হবে? শেষ পর্যন্ত দেখা যায় মনসা তাঁর কৃত কর্মের জন্য বিচলিতা হয়েছেন।

‘‘হেনকালে বেহুলা দেবীর ধরে পায়। ছয়মাস ভস্যা আসি তোমার কৃপায়।।
বেহুলা দেখিয়া দেবী হেঁট কৈল মাথা। হাসিতে লাগিল দেখি যতেক দেবতা।।’’[৩৮০]

যে নারী বেহুলা মনসার আজন্ম সেবাদাসী, তার প্রতিই মনসা রেগে গিয়ে বলতে লাগলেন-

‘‘লখীন্দরে জীয়াইয়া দেহ পুনর্ব্বার। জগতে তোমার পুজা হউক প্রচার।
এতেক বলিলা যদি হর ত্রিপুরারি। কপট চাতুরী করে জয় বিষহরি।।
কি কারণে দেবগণ বল এতগুলা। কেবা চিনে চাঁদবাণ্যা লখাই বেহুলা।।
চিরকাল কার সঙ্গে নাঞি করি হট। বেহুলা বলেন মাতা ছাড়হ কপট।।
মঙ্গল বিভার রাতি লোহার বাসরে। কালসাপে খাইল মোর কান্ত লখিন্দরে।।
সাপের সাপুড়্যা হাথে সুবর্ণের জাঁতি। তিন নাগ বন্দী হৈল তিন পর রাতি।।

*** *** ***

সাপের সাপুড়্যা দেখি দেবগণ কয়। মনসা লখাই তবে খায়্যাছ নিশ্চয়।।
মনসা বলেন আমি কিছু নাঞি জানি। দুর্ল্লভ লখাই তবে খাইল কোন্ ফণী।।
বেহুলা ধরিয়া কান্দে মনসার পায়ে। সকল ভুজঙ্গ ডাক দেবতা-সভায়।।

*** *** ***

ছাড়িয়া কপট মায়া হও গ সদয়। জীয়াইয়া দেহ মাতা সাধুর তনয়।।
করিব তোমার পূজা আমার শ্বশুর। জীয়াইতে মোর কান্ত কোপ কর দূর।।’’[৩৮১]

স্বর্গে আসার আগ-পর্যন্ত মনসা বেহুলার সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু স্বর্গে আসার পর মনসা ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যেতে চেয়েছেন। কারণ আজ তাঁর মনে সংশয়ের বাতাবরণ তৈরী হয়েছে, পাছে যদি চাঁদ তাঁর প্রিয় পুত্র লখিন্দরকে পেয়ে মনসার পূজা না করে তাহলে মনসাকে মর্ত্যলোকে আর কেউ পূজা করার আগ্রহ প্রকাশ করবে না। এই ভেবে মনসা শঠতার আশ্রয় নিয়েছেন। যদিও বেহুলা দেব সভায় কালনাগিনির লেজ হাজির করলেও মনসা মিথ্যাবাদীর মত মিথ্যার আশ্রয়ে জয়ী হবার চেষ্টা করেছেন। পারেননি মনসা। তাই মনসা কালনাগিনীর লেজকে অস্বীকার করে। এমনকী এই লেজকে গুইসাপের বা কাকলাসের লেজ বলে নিজের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করেছেন।

‘‘সিবে বোলে শুন পদ্মা য়ামার উত্তর।
অবিলম্বে জিয়াইয়া দেঔ লখিন্দর।।
তাহা সুনি পদ্মা বোলে দেবের য়াগে।
তুহার প্রভু খাইছে য়ামার কোন নাগে।।
বেউলা বোলে কালনাগে প্রভু খাইল মর।
কাটা লেঞ্জ ফালাইয়া দিল সভার গোচর।।
তাহা দেখি পদ্মাবতি লাগে বুলিবার।
মায়া পাতি চাহে বেউলা য়ামাক ভাড়িবার।।
কাকলাসের লেঞ্জ কি হাৰেলের লেঞ্জ।
গুহিলের লেঞ্জ কি সাপের লেঞ্জ।।’’[৩৮২]

এ ধরনের নানা মিথ্যা কথা বলেছেন মনসা। এমনকি বেহুলা এবং চাঁদ সদাগরকে তিনি চেনেন না বলেছেন। বেহুলাকে কটুক্তি করতেও আজ মনসার বিবেক দংশন হল না। মনসা বলতে লাগলেন-

‘‘বাদ পড়ুক বেউলার মুন্ড হউক ক্ষেয়।
কর্ম্ম দোষে মরে স্বামী মোর দোষ দেয়।।
এতেক দেবতা থুইয়া মোরে করে বাদ।
নৃত [্য] গীত করিতে বেউলার হহছে সাধ।।’’[৩৮৩]

‘‘মনসা আইলা মহেশ কহিলা
হেরো দেখো বিদ্যমান।
বিভারাতি মৈল লখাই দংশিল
বেহুলারো প্রাণধন।।
বৈলা পদ্মা কথা লখাইর কথা
আমি কিছু নাহি জানি।

কথো স্তব আরো করসি আমারো
এতেক গঞ্জিলা কেনি।।''[৩৮৪]

একথা শোনারপর বেহুলা বলতে লাগল-

''দেখ ধেক রে প্রভু সদাসিব পরম সানন্দে দেখ
বোলে বেউলা সভার গোচর।
নাগ থুইয়া খাটের হেটে আমাক ভাড়ে কপটে
এহি নাগে প্রভু খাইল মর।।
কালরাত্রি নিসাভাগে প্রভুকে খাইল নাগে
কাটা লেঞ্জ আছে তার সাক্ষি।
সোবন্তের খোল দিয়া আনিআছি বান্দিয়া
দেবগণে হাসে তাহা দেখি।।''[৩৮৫]

এই হল মনসার কপটতার পরিচয়। যে নারী বেহুলা তার সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে একদিনের জন্যও স্বামীর সোহাগে সোহাগিনী হতে পারল না শুধুমাত্র শ্বশুর চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার বিবাদে আজ মনসার সেবিকা হয়েও বেহুলাকে অস্বীকার করে চলেছে। এমনকি একেরপর এক মিথ্যার জটাজাল সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু বুদ্ধিমতী বেহুলার বুদ্ধির কাছে অর্থাৎ প্রমাণ স্বরূপ হিসেবে কালনাগিনির লেজকে সঙ্গে নিয়ে আসার ফলে-

''লজ্জা পাইয়া বিসহরি রহিলা হেট মাথা করি
কোপ করি বোলে মহেশ্বর।
পদ্মা বড়ই নিদারুণ তুমি নিশ্চয় জানিলাম আমি
জাটে করি জিয়াও লখিন্দর।।''[৩৮৬]

মনসার কপটতা ধরা পড়ার পর বেহুলাকে মনসা দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন-

''শুন ল বাণ্যার বেটী বেহুলা নাচনী। তোমার শ্বশুর বলে চেঙ্গমুড়ি কানি।।
মোর সনে বাদ কর্যা রাখিয়াছে দাড়ি। গোস্যা কর্যা বুলে লয়্যা হিন্তালের বাড়ি।।
শাক এড়া ঢেরাপালা অনন্ত দশর। না করে আমাকে পূজা চাঁদ সদাগর।।
মনসার পূজা মানা প্রতি ঘরে ঘরে। অপমানে গালি পাড়ে প্রাণে যত পারে।।
ছয়পুত্র খাইলু তার ছয় বহু রাঁড়ী। কালীদহে কৈলুঁ তার সাত ডিঙ্গা বুড়ি।।
তবু নাহি মোর পূজা করে সদাগরে। অবশেষে খাইলুঁ তার পুত্র লখীন্দর।।
কেমনে আইলে তুমি দেবতা-সভায়। তোর অপমানে আমি পড়িলুঁ লজ্জায়।।''[৩৮৭]

পিতা মহাদেবের কাছে মনসা চাঁদের সম্বন্ধে নানা অভিযোগ করে বলেছেন-

‘‘কান্দেন পদ্মা বাপের ধরিঞা চরণ।
সহন না যায় বাপু চান্দোর বচন।।
একে চান্দো মোকে না দেয় ফুলপানি।
আর বোলে মোকে বাপু বেঙ্গখকি কানী।।
যেবা নর পূজে মোকে নগর-ভিতরে।
মস্তক মুড়ায়া তাকে গ্রামের বাহির করে।।
আর বোলে মোকে বাপু ঢেমনভাতারী।
চান্দোর অপমান বাপু সহিতে না পারি।।’’[৩৮৮]

আজ মনসা কারুর কথায় কর্ণপাত করছেন না। স্বয়ং পিতা মহদেবের কথায় নয়, আবাল্য মনসার সেবিকা হতভাগিনী বেহুলার কাকুতি মিনতিতেও নয়, শুধুমাত্র দেব-সমাজের মাঝে বেহুলা যদি চাঁদ সদাগরকে দিয়ে মনসাকে পূজা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় তবে লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছে-

‘‘পদ্মা বোলে মোর দুঃখ কেহ নাহি বুঝে।
না জিয়াব বালাকে যাবত নাহি পূজে।।
সভার সাক্ষাতে বালী করুক অঙ্গীকার।
শ্বশুরের হস্তে পূজা করাবে আমার।।
দেবগণ বোলে বালী অঙ্গীকার কর।
পদ্মার পূজা করে যেন চান্দো সদাগর।।
অঙ্গীকার করি বালী বোলে দেবতারে।
দেয়াইব ফুলজল শ্বশুরের করে।।
পদ্মা বোলে সাক্ষী হঅ তুমার দেবলোক।
চান্দো বিবাদিয়া যেন পূজা করে মোক।।
দেবগণ বোলে পদ্মা না কর অন্যথা।
আমার পুষ্পের সাক্ষী হৈলাম সর্ব্বথা।
দেবতার বচনে পদ্মার আনন্দিত মন।’’[৩৮৯]

এই বলে ক্ষান্ত হয়নি বেহুলা বরং আর বলেছে যদি তার শ্বশুরকে দিয়ে মনসার পূজা না করাতে পারেন তবে ক্ষণিকের জন্যও মর্ত্যলোকে থাকবে না। বরঞ্চ বেহুলা সকলকে নিয়ে আবার স্বর্গলোকে ফিরে আসবে। যাক বেহুলার প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হয়েছেন মনসা। এবার মনসা দেব সভায় বললেন

বেহুলা শুধু ছয় মাস যাবৎ একা অনাহারে অনিদ্রায় থাকেনি মনসাও বেহুলাকে এবং লখিন্দরকে রক্ষা করার জন্য অনাহারে অনিদ্রায় কালাতিপাত করেছেন।

‘‘ছয় মাস জলেতে ভাসিল রূপবতী।
ছয় মাস নাই যাঙ পুরী ময়নাবতী।।
ছয় মাস ভাসিলু ভূরার চতুস্পাশে।
চক্ষে নিদ্রা নাহি হয় মরি উপবাসে।।’’[৩৯০]

মনসা বলেছেন ত্রিবেণীর ঘাটে গেলেই লখিন্দরকে তিনি জীবিত করে দেবেন। কিন্তু মনসার এই কথায় আজ বিশ্বাসী হতে পারছে না বেহুলা। কারণ ক্ষণিক আগেই মনসার আসল পরিচয়টি পেয়েছে বেহুলা। মনসার তিন সত্যি অঙ্গীকারকে হেলায় সরিয়ে দিয়ে বেহুলা দেবতাগণকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চেয়েছে-

‘‘ত্রিবিনিকে চল কন্যা ত্রিবিনিকে চল।
ত্রিবিনি গেলে তোর জিয়াব প্রাণেশ্বর।।
বালী বোলে মাগো কথাঙ না যাই।
তুমার বচনে আমি প্রত্যয় না পাই।।
পদ্মা বোলে সত্য সত্য তিন সত্য করি।
যদি জিয়াঞ না দেঙ পাপী হৈয়া মরি।।
বেননী বোলেন প্রভু শুন ত্রিলোচন।
সঙ্গে করি দেহ মোকে যত দেবগণ।।
জিয়াঞা না দেয় আসিব আর বার।
বুঝিয়া করিবে প্রভু তাহার প্রতিকার।।’’[৩৯১]

এই কথা শোনার পর মনসা আবার তাঁর পূর্বরূপ ধারণ করে বেহুলাকে যা-ইচ্ছা তাই বলে চলেছেন। কিন্তু বেহুলা বুদ্ধিমতী নারী বলে এবং বেগতিক রূপ দেখে মনসাকে তখনই-

‘‘চরণে ধরিয়া বেউলা করএ কাগুতি।
তাহা দেখি পদ্মাবতি হইল সানন্দিতি।।’’[৩৯২]

শেষ পর্যন্ত মনসা দেবতাদের ইচ্ছায় এবং বেহুলার শ্বশুরকে দিয়ে পূজা দেবার অঙ্গীকারকে শিরোধার্য করে লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। মৃত লখিন্দরের গলা-পচা দেহকে সুঠাম সুন্দর সাবলীল করেছেন। তাই দেখে-

‘‘হেন মড়া লখীন্দরে: দেবী মনসার বরে: জীয়াইল সুন্দর শরীর।।
দেখিয়া দেবতা সভ: মনসার করে স্তব: ধন্য ধন্য জয় বিষহরি।

বেহুলা দেবীর কাছে: ভ্রুকুটি করিয়া নাচে: দেখি যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী।।
লখাই যথায় জীল: তথা পুষ্পবৃষ্টি হৈল: সুরপুরে দুন্দুভি বাজনা।’’[৩৯৩]

এরপর দেখা যায় বেহুলা এবং লখিন্দর তারা দুজনে মিলে খোল বাজিয়ে নৃত্য করছে। এই নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে মনসা বেহুলার প্রতি সদয় হয়ে বলেছে তার আর কি প্রয়োজন। একথা শুনে একে একে বেহুলার ছয় ভাসুর সহ শ্বশুরের হারানো সমস্ত সম্পদ ফিরে পেতে চাইল। মনসা খুশি হয়ে এবং শর্ত রেখে বেহুলাকে তাঁর ছয় ভাসুর সহ শ্বশুরের সপ্ত ডিঙার সঙ্গে আরও সপ্ত ডিঙা অর্থাৎ চৌদ্দ ডিঙা সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছেন।

‘‘বেহুলা নাচনী বড় আনন্দিত মতি। ছয় ভাশুর চৌদ্দ ডিঙ্গা জীয়াইল পতি।।
নাএর নফর জীল বুদ্ধের কাণ্ডারী। পরিতোষে বরদান দিল বিষহরি।।
দেবতা-সভায় রামা হইল বিদায়। আট জনে গড় করে মনসার পায়।।
চৌদ্দ ডিঙ্গা চৌদ্দ জন বসিল কাণ্ডারী। এক ডিঙ্গা লখীন্দর বেহুলা সুন্দরী।।
ছয় ডিঙ্গা বেহুলার ছয়টি ভাশুর। সাধুপুত্র সাধু যেন ডিঙ্গার ঠাকুর।।’’[৩৯৪]

এবার আমরা স্নেহময়ী মনসার পরিচয় পেলাম। মমতাময়ী মনসা আজ আনন্দে আত্মহারা। আজ তাঁর সমস্ত দুঃখ দূরে সরে গিয়েছে। তবুও খানিকটা রয়েছে সংশয়। চাঁদ যদি মনসার পূজা না দেয়? কিন্তু তবুও হৃদয়ে কোমলতার হিম-শীতল আবহে ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন মনসা। যাবার পথে মনসা নিজে স্বয়ং হয়েছেন কান্ডারী।

‘‘পদ্মা বোলে নায়ে চড় বিহুলাসুন্দরী।
হইনু তোমার নায়ে আপনে কাণ্ঢারি।।
নৌকায়ে আসন করে শঙ্করনন্দিনী।
মস্তকে ধরিল ছত্র অহিরাজ ফণী।।’’[৩৯৫]

পথে এল অনেক বিপদ। সেই বিপদকে মনসা নিজেই দূর করে দিয়েছেন। এমন কি মধুসূদন দানীর পরামর্শ মত রাজ্যের নৃপতি সৈন্যদের নিয়ে চৌদ্দ ডিঙা আক্রমণ করেছে। সেই আক্রমণ থেকে উদ্ধার করলেন মনসা। সর্প দংশন করে তাদের পরাস্ত করেছেন এই মমতাময়ী মনসা। বেহুলা ভয়ে তটস্থ হলে মনসা তাকে দিয়েছেন অভয় বাণী।

‘‘পদ্মা বোলে কন্যা তুমি কেনে বাস ভয়।
রিপু অরি তুমার সকল হবে ক্ষয়।।
নাগগণ বোলি পদ্মা করিল স্মরণ।
চলিল তক্ষকরাজ লৈয়া নাগগণ।।
বিষধর নাগ আইল শঙ্খ মহাসাপ।

এ তিন ভুবন যার বিষের প্রতাপ।।
পদ্মা বোলে নাগগণ শুনহ বচন।
আইল রাজার সৈন্য দংশ প্রতি জন।।’’[৩৯৬]

সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বেহুলা হাজির হলেন চাঁদ সদাগরের সমীপে। বহুপূর্বে হারিয়ে যাওয়া সপ্ত ডিঙা সম্পদ ফিরে পেয়ে এবং সাত সাতটি পুত্রের প্রাণ ফিরে পাওয়ার পরও চাঁদ মনসাকে পূজা দিতে রাজি হয় না। আজ চাঁদ সদাগর দাবি করলেন তাঁর চৌদ্দ ডিঙ্গা যদি জলপথ ত্যাগ করে স্থলপথ দিয়ে গৃহে উপস্থিত হয় তাহলে চাঁদ মনসাকে দেবী বলে মানবেন।

‘‘চাঁদবাণ্যা বলে আমি পূজি তায়। শুকানেতে চৌদ্দ ডিঙ্গা যদি ঘরে যায়।।’’[৩৯৭]

চাঁদের এই অন্যায় দাবিও মনসা মেনে নিয়েছেন।

‘‘শুনিঞা জগতী: রাখিতে খেয়াতি: লইতে চাঁদের পূজা।
আনন্দ বিশেষ: করিলা আদেশ: শুন ফণী মহাতেজা।।
চাঁদ সদাগর: বড় দুরন্তর: না করে আমার ধ্যান।
আমার সাধনে: যত ফণিগণে: বহ চৌদ্দ ডিঙ্গাখান।।’’[৩৯৮]

চাঁদ সদাগরের পূজার উপরই নির্ভর করছে মনসার মর্ত্যলোকে পূজা পাবার। মনসা কাঙালিনীর মত চাঁদকে বলেছেন-

‘‘তুমি পূজিলে মোকে পূজিব সর্ব্বলোকে।
তে কারণে এতেক বলিএ তোমাকে।।’’[৩৯৯]

সদাগর শর্ত দিয়ে বাঁ হাতে পিছন ফিরে মনসাকে পূজা দিতে পারে। তাতেই মনসা সম্মত হয়েছেন। এখানে দেবী মনসার চরম ভীতুতার পরিচয় মেলে, যখন চাঁদের হাতের হেমতালের ভয়ে মনসা বলতে লাগলেন-

‘‘করজোর করি বোলে সোনকা সোন্দরি।
হরসিতে তরে উটে জয় বিসহরি।।
পদ্মা বোলে এই কথা উটিতে না পারি।
কালডণ্ড এহেন দেখ হেমতাল বারি।।
জদি পূজিব সত্য করুক সদাগর।
হেমতাল পালাউক জলের ভিতর।।’’[৪০০]

মনসা চাঁদের হাতের পূজা পেয়ে আজ ভিষণ আনন্দিতা। আজ মনসার ক্ষমতা করায়ত্ব হয়েছে। দেবী হিসেবে স্বর্গলোকে মর্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আননন্দিতা মনসা স্বয়ং চির শত্রু চাঁদকে বলেছেন-

‘‘অজাগর সর্পে পদ্মা কৃতাসন করি। ফণী কাল বেকাল যুগল হস্তে ধরি।।
দুই ঘট শিরে দুই পদাঙ্গুলি দিয়া। নৃপতিরে দিল দেখা ঈষত হাসিয়া।।
দেখিয়া সম্ভ্রমে রাজা সম্মিল লোচন। সর্বাঙ্গ পুলকে অশ্রু পূরিলো লোচন।।
সদয়-হৃদয়ে দেবী বলে চাঁদো প্রতি। তোর অভীষ্ট বর মাগো নরপতি।।
কর জোড়ে চাঁদো বান্যা বলে বিদ্যমানে। তন্ত্রমন্ত্র আদি যতো দেহ মহাজ্ঞানে।।
দারা পুত্র আমাত্য বান্ধব সহোদর। চির কাল করি রাজ্য চম্পক নগর।।
সদয়-হৃদয় দেবী কৈলা অঙ্গীকার। লখাই বেহুলা বিনে সকলি তোমার।।’’[৪০১]

এইভাবে মনসা তাঁর পূজা প্রচারের মধ্য দিয়ে মনসামঙ্গলের কাহিনিকে সকল কবিরা সমাপ্ত করেছেন। চাঁদও আজ অনেক বেশী সংবেদনশীল। এরই জন্য বোধ হয়ে চাঁদকে বলতে শুনি-

‘‘হারা মরা দুই পাই তব আশীর্ব্বাদে। পূজিব তোমার পদ মোর মন-সাধে।।’’[৪০২]

মনসাও আর দেরী না করে বলে ফেললেন-

‘‘শুন চাঁদ অধিকারী: তুমি ছিলে মোর ঐরি: আজি হৈতে ঘুচিল বিবাদ।
পূজিলে আমার পদ: সিদ্ধ হৈল মনোরথ: হের ধর মাল্য পরসাদ।।’’[৪০৩]

মনসা তাঁর পূজা পাবার পর অনেক বেশী সংবেদনশীল হয়ে উঠেছেন। যদিও মনসার বাহন সাপ তাই মনসার মধ্যে ক্রুরতা তাঁর সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে যুক্ত হয়ে আছে। কিন্তু এটাও ভুললে চলবে না মনসা তাঁর পূজা পাবার আশায় প্রথমে চাঁদকে মমতাময়ী হয়ে আকুল-প্রার্থনা করেছিলেন। চাঁদ এই প্রার্থনায় সাড়া না দিয়ে মনসাকে যা-ইচ্ছা-তাই বলে গালাগালি দিয়েছে। এরপর মনসার আর কিইবা করার ছিল তাই মনসাকে ক্রুরতার পথকে বেছে নিতে হয়েছে। যিনি আবাল্য পিতা-মাতার স্নেহ-সুখ থেকে বঞ্চিতা, সোহাগ রাতে স্বামী জরৎকারু মুনি তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। পেলেন না পত্নী হয়ে স্বামীকে সেবা করবার। নিজের পুত্রের মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য মনসা পরের বাড়িতে করেছেন দাসী বৃত্তির কাজ। তবুও তাঁকে কেউ এতটুকু করেননি সহায়তা। তারপর পিতার কাছে নানা আবদার করলে জানতে পারেন যদি চাঁদ তাঁকে পূজা দেয় তবে স্বর্গলোকে এবং মর্ত্যলোকে তাঁর পূজা প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই কারণে চাঁদের কাছে বারবার পূজা পাবার আশায় গিয়েছে। আর প্রত্যুত্তরে চাঁদ মনসাকে দিয়েছে একেরপর এক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। মনসাকে তো পূজা পেতে হবে তাই যখনই কোন সমস্যার মধ্যে পড়েছেন তখন সখী নেতার পরামর্শে সেখান থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। বলা চলে নেতা বিহীন মনসার চাঁদের কাছ থেকে পূজা পাওয়া সম্ভব ছিল না। বেহুলা তো আজন্ম মনসার ভক্ত দাসী হওয়া সত্ত্বেও মনসা কখনও কখনও তাঁর প্রতি বিরূপতা করেছেন। তাঁকে যে পূজা পেতেই হবে। দেবী হিসেবে মনসাকে কেউই স্বীকার করতে চায়নি। বরং বারবার দেবী মনসা সাধারণ মানুষ চাঁদ কিংবা ধন্বন্তরি ওঝা বা ওঝার শিষ্যরা মনসাকে হুমকি দিয়েছেন। তবুও মনসা সব ভুলে গিয়ে যখন

তাঁকে চাঁদ পূজা দিয়েছেন তখন পূর্ব ব্যবহারকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ মনসা যতটা দেবী তার থেকে অনেকবেশী মানবী।

সনকা: বুদ্ধিমতী-দূরদর্শিনী একেবারে বঙ্গ-ললনার খাঁটি বাস্তব চরিত্র সনকা। 'পুত্রার্থে ক্রিয়ার্থে ভার্যা' দর্শনটির অনুগামী হলেও, সনকা শুধুমাত্র সেই সমাজ ব্যবস্থার নির্মম প্রতিচ্ছবিরই শিকার হয়নি, বরং তার প্রতিবাদী রূপটিও কবিরা তুলে ধরেছেন। আমরা জানি বঙ্গ-ললনার ব্রত হল স্বামীর কল্যাণেই নিজের কল্যাণ, সন্তান-সন্ততী এবং সংসারের কল্যাণেই নিজের কল্যাণ বলে জেনেছে। স্বামী-সন্তান-সংসার এই নিয়েই সনকার চার দেওয়াল। এই চার দেওয়ালের মধ্যে যখন বিপদের সাড়া পেয়েছে তখন স্বামীকেও সনকা ছেড়ে কথা বলেনি। তাই সংসারে যখন দেখেছে মনসা বিদ্বেষে বিপদ ঘনায়মান তখন স্বামীর মনসা বিদ্বেষকে সনকা সমর্থন জানায়নি। স্বামীর অন্ধ অনুকরণ সে যুগে প্রতিব্রতা নারীর একমাত্র ব্রত হলেও সনকা কিন্তু স্বামীর ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রতি অন্ধ সমর্থন জানায়নি। সংসারের কল্যাণ চিন্তায় চিন্তিত হয়েই সনকা মনসা-পূজায় ব্রতী হয়েছে। এ সনকা মানব রসে সমৃদ্ধা। সনকা একেবারে জীবন্ত বঙ্গ-নারী। বঙ্গ-রমণীরা যেমন নিজের স্বামী ও সন্তান সর্বোপরি সংসারের মঙ্গল কামনায় দেব-দেবীর আরাধনায় ব্রত হন, সনকাও তাই হয়েছে। মনসামঙ্গলের কবিরা সনকার ভক্ত-হৃদয়ের ছবিটিকে খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। যদিও প্রত্যেক কবিরই নিজস্ব কল্পনার মায়াজালে প্রত্যেক চরিত্রের মত সনকাকে নির্মাণ করেছেন। এক একজন কবি তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ধারার মধ্য দিয়ে সনকাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। বিজয় গুপ্তের কাব্যে প্রথমেই দেখি, সোনাই পন্ডিতের কাছে মনসার মাহাত্ম্য শুনে সনকা মনসার পূজায় ব্রতী হয়েছে-

''চম্পক নগরে ঘর চান্দ অধিপতি।
তাহার ঘরণী সোনকা রূপবতী।।
শিশু হইতে পোজে সে পদ্মার চরণ।
পদ্মার চরণ বিনে অন্য নাহি মন।।
মনসার ঘট করিল স্থাপন।
বিবিধ প্রকারে পূজে পদ্মার চরণ।।
এক মনে ভাবে মাত্র মনসার চরণ।
মনসার বরে পাইল পুত্র ছয় জন।।''[৪০৪]

নারীর উপর পুরুষের চাপিয়ে দেবার অভিপ্রায় একালের সমাজের মত সেকালের সমাজেও আমরা দেখতে পাই। সনকার ছয় পুত্র দেখে চাঁদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করে ''ছয় পুত্র পাইলা তুমি কাহার আদেশে।।''[৪০৫] সনকা এখানে বলতে পারত যে, মনসার বরেই এই তাঁর ছয়পুত্র জন্ম নিয়েছে। কিন্তু সনকা তা না বলে নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া পুরুষের অধিকারকে শিরোধার্য করে এমনকী

খানিকাংশে ভীত হয়েই বলেছে শিবের পাদ-পদ্মে পূজা করার ফলেই এই ছয় পুত্রের জন্ম হয়েছে। কিন্তু আদৌ কি তাই? সনকা তো আজন্ম মনসার ভক্ত-সেবিকা। আজ স্বামী যেহেতু দেবাদিদেব মহেশ্বরের পরম ভক্ত তাই নিজের প্রতিষ্ঠিত দেবীকে অনায়াসে দূরে রেখে স্বামী সোহাগিনী সনকা স্বামী যাঁকে শ্রদ্ধা করে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে নিজের সেবিকা মনসাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। এ কেমন সমাজ? যেখানে নিজের বলে কিছু নেই? শুধু স্বামী আর সংসার বিহনে নারীর কোন নিজের পরিচয় নেই। ধিক্ ধিক্ এই সমাজের উঁচু তলার বাসিন্দাকে। চাঁদ বণিক সমাজের কর্ণধার অথচ তাঁর নিজ-স্ত্রীর প্রতি কখনও এতটুকুর জন্যও দয়া করেনি বরং চাঁদ স্ত্রী সনকার স্বাধীনতাকে হরণ করে নিয়েছে।

''হস্ত জোড় করি বলে রাজার গোচর।
একমন চিত্তে পূজি দেব মহেশ্বর।।
তাহান বরে পাইছি আমি পুত্র ছয় জন।
হরগৌরীর পদ বিনা অন্য নাহি মন।।''[৪০৬]

এই কথা শোনারপর চাঁদ আনন্দিত হলেও আমরা কিন্তু হতে পারলাম না। কারণ চাঁদ তাঁর নিজ-কার্য্য সিদ্ধির জন্য নিজের স্ত্রী-স্বাধীনতাকে হরণ করে নিয়েছে। এমনকি ধনা যখন শীঘ্র তাড়াতাড়ি করে যাওয়ার কথা বলেছে সনকা মনসার পূজা ব্যতিত যেতে চায়নি। এই কথা শোনার পর চাঁদের পরম ভক্ত ধনা খানিকটা ক্রুদ্ধ হয়েছে।

''সদায়ে করিয়া সাধু ডিঙ্গায়ে ভরা তোলে।
আনন্দিত হইয়া সাধু নিজ দেশে চলে।।
ত্বরিতে চলিয়া আইল চম্পক নগরে।
ডিঙ্গা বরিতে সোনেকা আনাইল সত্বর।।
ধনা বোলে ঠাকুরাণী শোন আমার বচন।
ডিঙ্গা বরিতে চল ত্বরিত গমন।।
সোনাই বোলে ধনা রহোত ক্ষেনেকে।
মনসার পূজা আমি করিব পর[ম] সুখে।।
তাহা শুনিয়া ধনা বড় ক্রুদ্ধ হলি।
ত্বরিত গমনে গিয়া সাধুরে জানাইল।।''[৪০৭]

এরপর যা হবার তাই হল। চাঁদ শীঘ্র গতিতে সেখানে উপস্থিত হয়ে মনসার ঘটের উপর হেতালের বাড়ি দিয়ে খন্ড খন্ড করে দিল। এইরকম দোর্দণ্ড প্রতাপ চাঁদের সাহস দেখে স্বয়ং দেবী মনসা ভয় পেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সনকার করার কিছু নেই। স্বামী চাঁদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও সনকা উচ্চারণ করতে পারছে না। যেখানে দেবী কিছু বলতে পারছেন না সেখানে একজন সাধারণ মানবী সনকা

কেমন করে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে? দাঁড়াতে পারল না সনকা। শুধু নারীর যে একমাত্র সম্বল চোখের জল তা দিয়ে মনসাকে জানিয়ে দিল যে, সনকার করার কিছু নেই।

‘‘দোহাতিয়া বাড়ি মারে ঘটের উপরে।
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে ঘরের ভিতরে।।
এত দেখিয়া পদ্মা পাইল বড় ডর।
পূজা এড়ি মন[সা] উঠিয়া দিল লড়।।
ঘট দেখিয়া সোনকার দুঃখ হইল বড়ি।
এই কালে বোল গাইন করুণা লাচারি।।’’[৪০৮]

সনকা ভীষণভাবে দুঃখিত হয়ে একজন সাধারণ নারীর মত বিলাপ করলে, আমাদের চক্ষু স্থির থাকতে পারে না। চোখ ছল ছল করতে থাকে যখন সনকা বলেন-

‘‘আমারে মারিতা প্রভু তাহা নাহি লিখি।
ভাঙ্গিলা মনসার ঘট এই দুঃখে কান্দি।।
ভাঙ্গা ঘট সরা সোনাই নেতে জড়াইয়া।
কান্দে সোনকা রাণী বিষাদ ভাবিয়া।।
ভাঙ্গিলা মনসার ঘট করি অবহেলা।
ছয় পুত্র নিবে মোর দিয়া একছলা।।’’[৪০৯]

স্বামীর এহেন কাজের জন্য সনকা কিন্তু চুপ থাকল না, বরং বলতে লাগল-

‘‘একে পদ্মার সনে তোমার বিসম্বাদ।
তাহাতে হইল মোর দারুণ প্রমাদ।।
কোন দিন পদ্মা জানি মোর পুত্র খায়।
মনসার চরণে বৈদ্য বিজয়ে গোপ্তে গায়।।’’[৪১০]

বিজয় গুপ্তের সনকা কিন্তু স্বামীকে সতর্ক করে দেয়নি বরং বলা চলে সনকা তাঁর কর্ম ফলকে দায়ী করেছে। স্বামীর এহেন কাজকে নিজের কাজ বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই মা মনসাকে এই অপরাধ ক্ষমা করে দিতে বলেছে-

‘‘সাধুর কোপে ভয় পাইল সর্ব্বজন।
সোনেকায় বলেন মাগো পড়িলাম চরণ।।
কি কারণে হেন মতি হৈল সদাগরে।
সকল অপরাধ মা ক্ষেমিবা আমারে।।’’[৪১১]

বিপ্রদাস পিপিলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে দেখা যায় জালু-মালুর সাংসারিক উন্নতি দেখে সনকা এই উন্নতির কারণ জানতে চাইলে যখন বলেছে মনসার পূজা দেওয়ার ফলে তাদের এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে তখন সনকাও তাঁর সংসার, স্বামী-সন্তান-পুত্রবধূদের মঙ্গল কামনায় মনসার পূজায় ব্রতী হয়েছে।

‘‘জালুর মা এর বোলে সনকা বাণ্যানী। ছয়টি পুত্রের দিব্য করিল তখনি।।
না কব সাধুর তরে এ সব কখন। কহ গ জালুর মাতা পূজ কোন্‌জন।।
জালুর জননী বলে সনকার তরে। মনসার পূজা আজি করিলাঙ ঘরে।।
নেত কেত দুটি বারা উঠ্যাছিল জালে। করিল দেবীর পূজা পূর্ব্ব কর্ম্মফলে।।
মনসার পূজা কৈল তিঁহ দিল বর। আওয়াস প্রাচীর হৈল বেড়্যা ভাঙ্গা ঘর।।’’[৪১২]

জালু-মালুর মায়ের কাছে সমস্ত বিবরণ শোনারপর সনকা সিদ্ধান্ত নিল-

‘‘এতদিনে দূর হৈল তোমার বড়াই। মনসা পাইল পূজা সনকার ঠাঁই।।’’[৪১৩]

‘‘সনকা বলেন শুন জালুর জননী।
কেমন দেবতা পূজা করিস আপনি।।
অদ্য অন্নশূন্য তুমি ছিলা এই স্থান।
এতেক বিভব হৈল কহ ত কারণ।।

*** ***

আবাহন পূজন কেমন ভক্তি স্তুতি।
আমি আরাধিব পদ্মা তোমার সংহতি।।
শুনিয়া নিছনি বলে হরষিত হৈয়া।
মনসা পূজার কথা সনকা চাহিয়া।।’’[৪১৪]

এরপর সনকা জালু-মালুর মা নিছনিকে বলল-

‘‘সনকা বলেন বাণী   শুন লো নিছনি ধনি
মনসার ঘট দেহ মোরে।
যাবত না আনি বারি   তদবধি পূজা করি
এই নিবেদন করি তোরে।।’’[৪১৫]

সনকা ঘরে এসে সংসারের উন্নতির আশায় দেবী মনসার পূজা দেবার জন্য ছয় বধূকে সঙ্গে নিয়ে পূজার আরম্ভ করে। কিন্তু নেড়া চাঁদের গৃহে মনসার পূজা দেবার কথা চাঁদ সদাগরকে জানালে চাঁদ অতি দ্রুত এসে-

‘‘দেখিয়া পদ্মার পূজা ক্রোধে জ্বলে চাঁদোরাজ
হেতালের দণ্ড করে ধরি।
আপদ সঞ্চারে নৃপে আপন পাসরে কোপে
ভাঙ্গিলেক মনসার বারি।।’’[৪১৬]

এই রকম অবস্থায় পড়ে সনকা যে কথা গুলো বলেছে তাতে সনকার প্রতিবাদী রূপটি আমাদের সামনে জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠেছে।

‘‘সনকা কাতর হইয়া মনে অতি দুঃখ পাইয়া
গালি পাড়ে চাঁদো বরাবর।
লঙঘিয়া দেবীর বারি এ সুখ সম্পদ গারি
মজিল অবুধ নরবর।।’’[৪১৭]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে চাঁদ মনসার বারা ভেঙ্গে দিলে সনকা ভয়ে পালিয়ে গেছে। মুখে যতই সাহস দেখাক না কেন, সনকার পালিয়ে যাবার মধ্যে তৎকালীন মধ্যযুগীয় সমাজে নারীর যে পুরুষ-স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলার উপায় নেই তা আমাদের বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না।

‘‘ওই দেখ অধিকারী: সনকা পূজেন বারি: মিথ্যা নহে আমার বচন।।
সদাগর দুরবার: নারে সম্বরিতে আর: সনকা পলায়্যা গেল ডরে।
সাধু কৈল সর্ব্বনাশ: বুড়াকালে বুদ্ধিনাশ: বাড়ি মারে বারার উপরে।।
সাধুর সহিত হটে: মনসা না ছিল ঘটে: তেঞি মারে হেন্তালের বাড়ি।
সাধু কোপে কম্পমআন: বারা হৈল চারিখান: ভূমে যায় খোলা গড়াগড়ি।।
কান্ধে হেন্তালের বাড়ি: সদাগর তাড়াতাড়ি: বুলে ঘর সনকারে চায়্যা।
কেতকাদাসেতে কয়: সনকা পাইল ভয়: পড়সী আশ্রমে গেল ধায়্যা।।’’[৪১৮]

তৎকালীন সমাজে নারীর কোন কিছুতে অধিকার ছিল না। নিজের ইচ্ছা বলে নারীর কিছু নেই। স্বামীর ইচ্ছাই নারীর ইচ্ছা, স্বামী নারীকে যেমনভাবে চালনা করবে নারী তা বিনা বাক্যব্যয়ে শিরোধার্য করবে। সনকার মধ্যেও আমরা তাই দেখতে পাই। তবুও সনকা পুরুষ শাসিত শাসানিকে তোয়াক্কা না করে স্বামী চাঁদ সদাগরকে যতটুকু সতর্ক করা দরকার তাই করেছে-

‘‘সনকা বলেন বাণ্যা গেলে ছারেখারে। দেবতা সহিত বাদ কোন্ মূর্খে করে।।
দেবতার ঐরি চিরকাল নাহি রয়। দেবতার বচনে সকল হয় লয়।।’’[৪১৯]

চাঁদ-কর্তৃক ভক্ত সনকার এই অপমান মনসা সহ্য করতে পারেননি। তাই মনসা সঙ্গে সঙ্গে সখী নেতার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেছেন। এরপর নেতা উপদেশ দিল চান্দোর ছয় পুত্রকে ছারখার করার জন্য। কিন্তু যত সহজে নেতা মনসাকে চাঁদের ছয় পুত্রকে নাশ করতে বলেছে তত সহজে তো আর

চাঁদের ছয় পুত্রকে নাশ করা যায় না। কারণ চাঁদের আশেপাশে রয়েছে অসংখ্য ওঝার দল। উপরন্তু চাঁদের আছে মহাজ্ঞান। তাই প্রথমে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ তারপর ধন্বন্তরি ওঝাকে নিধন করার পর অন্নের মধ্যে বিষ মাখিয়ে চাঁদের ছয়পুত্রকে মৃত্যু-পথের যাত্রী করেছেন মনসা। সনকা তো স্বামী সোহাগিনী। স্বামীর কোন দোষকে সনকা দোষ বলে মেনে নেয়নি। আমাদের বঙ্গ ললনার ভূষণ হল স্বামীকে সেবা করা এবং সংসারের শালীনতা রক্ষা করার দায়িত্ব স্ত্রী বা পত্নী বা নারীর। আর স্বামীরা তথা পুরুষেরা স্বেচ্ছাচারী ও বহুগামী। চাঁদ কেন তাঁর থেকে বিরত হবে। তাই মনসার নটীবেশী রূপে পাগল হারা হয়ে মনসাকে যৌবনবতী নারী ভেবে সম্ভোগ করেছে। তবুও সনকা তাঁর স্বামীকে অবিশ্বাস করেননি। সামান্য একজন বেতনভুগ চাকর পুরুষও সনকাকে যে কথা বলেছে তাতে নারীকে কীভাবে হেয় করা হত তা বোঝা যায়।-

‘‘বান্যানী কি কর ঘরে: সাধু আন্ বিভা করে: তোমার দেখিয়া পক্ককেশ।
শুন শুন তত্ত্বকথা: বৃদ্ধকালে তোর সতা: নিঞা সাধু আইসে নিজদেশ।।
আল সায়বানি দোলা: আইয় সুইয় কর মেলা: উল্যানিতে সোয়ামী-সতিনী।
বিরচিল ক্ষেমানন্দ: সনকা করিয়া দ্বন্দ্ব: ঘরে হৈতে বার্‍্যায় বাণ্যানী।।’’[৪২০]

এই কথা শোনার পরও সনকা তাঁর স্বামীর আচরণে কোন দোষ নেই বলে বিশ্বাস করেছে।

মনসার কোপে যখন তার ছয়পুত্র একে একে মৃত্যু কোলে ঢোলে পড়েছে, তখন অভিমানে শোকে সনকা তার স্বামী সহবাস পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। নারীর পরম কাঙ্ক্ষিত সম্পদকে সনকা বর্জন করেছে অনায়াসে। আবার এও বলা যায় সনকা পুরুষ শাসিত সমাজকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এবং পুত্রবধূগনের সমব্যাথিনী হয়ে তাদের অভিভাবকত্বের দ্বায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। এই কাহিনিকে এক এক জন কবি এক একভাবে বর্ণনা করেছেন। পুত্র-হারা মায়ের করুণ হাহাকারে বাঙালি সমাজ সেকালের মত আজও কেঁদে চলেছে।

যেমন-

‘‘সনকা বাণ্যানী কান্দে, নাহি বান্ধে চুল। ধূলায় ধূসর তনু, কান্দে শোকাকুল।
ধ্যায়া গিয়া নাড়া কয় শুন সদাগর। বিষ খায়্যা মৈল তব ছয়টি কুঙর।।’’[৪২১]

‘‘কেহ বলে আছে আছে কেহ বলে নাই।
পুত্র পুত্র বলি তবে কান্দেন সোনাই।।
ছয় পুত্রের তরে কান্দে ভূমে দিয়া গড়ি।

*** ***

কান্দে সোনাই বিষাদ ভাবিয়া।
কোথায় পুত্র যাও হৃদয়ে শেল দিয়া।।’’[৪২২]

কিংবা-

‘‘সোনাই বলে কেনে বিক্রম করিলা।
আমারে ছাড়িয়া তোমরা কোথাএ চলি গেলা।।
কান্দে সোনকা রাণী পুত্র পুত্র বলি।
একে কালে ছএ পুত্র কারে দিলাম ডালি।।
জন্মাবধি দুঃখ মুই না পাইলাম মনে।
একেকালে হৃদয় শেল দিলা ছএ জনে।।
ঘরেতে গিয়া আমি কার মুখ চাইব।
এই দুঃখ মনে পাইলে কাহারে ডাকিব।।’’[৪২৩]

‘‘পুত্রের বদন রামা নেহালিয়া চায়।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে চেতন না পায়।।
নাসিকা-বদনে কিছু নাহি পায় শ্বাস।
পড়িল ধরণীতলে হইয়া হুতাশ।।
কান্দে কান্দে সনকা হইয়া ব্যাকুলী।
কে হরিয়া লৈল পুত্র সোনার পুথলি।।
একে কালে কোন পাপে হৈল যমদণ্ড।
স্বর্ণগিরি ভাঙ্গি জেন হৈল খণ্ডখণ্ড।।’’[৪২৪]

এত দুঃখ সনকা সহ্য করতে পারছে না, তাই বিধাতাকে সনকা বারবার বলেছে আমাকে মৃত্যুকোলে পতিত কর। দেবী মনসাকে সনকা গালি দিয়েছে।

‘‘নিষ্ঠুর পদ্মার নাগে পুত্র মোর দংশে।
তর্পণ করিতে ক্ষিতি না থুইল বংশে।।
অনাথিনী করি পুত্র এড়ি জাহ মোরে।
কেন বা পাপিষ্ঠ প্রাণ আছয়ে শরীরে।।
বারেক পৃথিবী মোরে দেহ তো বিদার।
তথি প্রবেশিয়া হব শোকসিন্ধু পার।।’’[৪২৫]

‘‘কান্দে সনা বানিয়ানী দুই চক্ষে পড়ে পানি
মুষ্টা হানি চূর্ণ করে হিয়া।
শোকে অচেতন মন দূর গেল পরিধান
মস্তক হানিল শিলা দিয়া।।’’[৪২৬]

এবার আর পতি-সেবা পরায়ণী রূপে সনকাকে দেখা গেল না। পুত্র হারাবার পর সনকার হৃদয়ে এতদিনের পুঞ্জিত ক্ষোভ দ্বিগুন আগুনে জ্বলে উঠেছে। এমনকি স্বামীর ‘দম্ভদোষ’-এর জন্য আজ সনকা তাঁর ছয় পুত্রকে হারিয়েছে। স্বামীর চরিত্রের প্রতিও আজ দোষারোপ করেছে সনকা। সনকা বলতে লাগল-

‘‘মনসার নিন্দা শুনি রানী বলে রোষে।
সর্বনাশ হৈল রাজা তোর দম্ভদোষে।।
হরিল ব্রহ্মজ্ঞান কুবুদ্ধি তোমার।
ধন্বন্তরি ধনা মনা মৈল ধুন্ধমার।
যদি রাজা পূজ তুমি মনসাকুমারী।
কেন পুত্র মরিবেক রূপের মুরারি।।’’[৪২৭]

শোকাভিমানে সনকা স্বামীসঙ্গ পরিহার করেছে। নারী জীবনের সবচেয়ে কাঙ্খিত সম্পদ হল স্বামীর সোহাগে সোহাগিনী হওয়া। কিন্তু সনকা তাঁর ছয়পুত্র খেকো স্বামীর সাথে সহবাস ত্যাগ করেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন নারী শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের সামগ্রী বা সন্তান উৎপাদনের কারখানা ঘর। সেই সন্তান উৎপাদনে জননী হয়ে সমাজে সৌভাগ্য বলে বিবেচিতা। কিন্তু স্বামীর বিরুদ্ধে যাবার মত শক্তি সনকা পেয়েছে যখন তাঁর একে একে ছয়টি পুত্র মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। এর থেকে প্রতিবাদ আর কিইবা হতে পারে একজন নারীর ক্ষেত্রে।

‘‘চান্দরে বুলিছে বাপ গায়ের আগুনে।
ছএ পুত্র খাইল তার জেহি প্রতি দিনে।।
ছএ পুত্র খাইছে সোনাঞী পাইয়াছে বড় তাপ।
তে কারণে সোনাঞী চান্দরে কহিছে বাপ।।
সেহি হইতে চাঁদ সোনাঞীর হইছে এক দিসা।’’[৪২৮]

যদিও সনকা জানে যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের কোন না কোন পুরুষের অভিভাবকত্বের মাধ্যমে দিন কাটাতে হয়। নারীর নিজের কোন অস্তিত্ব পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় স্বীকৃত নয়। এই ধ্রুব সত্য কথা যেন সনকার ছয় পুত্রবধূর কণ্ঠে শোনা যায়। তারা মনে করেছে শ্বশুরের অবর্তমানে কীভাবে তারা অভিভাবক হীন দিন কাটাবে। তাই ছয় পুত্রবধূদের আবদার রক্ষার্থে এবং ভাবীকালের কথাকে মাথায় রেখে সনকা তাঁর স্বামীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে। তারা বলেছে দেবরকে আমরা পুত্র-স্নেহে বড় করে তুলব।

‘‘ধরিয়া সোণাঞীর চরণ কান্দে জত বধুগণ
শুন রাউলাইন আমার বচন।

আমরা বড় অভাগিনী   না দেখিলাম পুত্রখানি
দেওর হইলে করিব পালন।।
বেদ পুরাণে বোলে   লতা সিদ্ধি রক্ষা পাইলে
জস মহিমা রহে সংসার।
পিত্রি লোকের পিন্ড আসা জলপানির পর্ত্তাসা
ইহা পরে কি বুলিব আর।।
বৃদ্ধ সসুর অভাবে   দাড়াইব কার আগে
রই হেন আর নাহি স্থান।
দেওরখানি হয় জবে   পালন করিব তবে
অন্তকালে করিব পিন্ড দান।।
নারায়ণ দেবে কয়,   সুকবি বর্ল্লভ হয়,
সোন সোনাঞী বচন আমার।
বধু সবের বচনে   জাও তুমি সামির স্থানে
এহি পুত্রে করিব উর্দ্ধার।।
হাতে পায়ে ধরিয়া বধু সকলে বুঝায়।
অলঙ্কার পরি সোনাঞী চান্দোর কাছে জায়।।’’[৪২৯]

সনকা পুত্রবধূদের সংগত আবদারকে শিরোধার্য করে এবং তাদের প্রতি সমব্যথিনী হয়েই চাঁদের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সনকা তথা ছয় পুত্রবধূরা তো জানে চাঁদ সদাগরের জেদের জন্যই সনকার ছয় পুত্র মনসা মেরেছে। তাই শোকে-দুঃখে অভিমানে এই স্বামী সহবাসকে মন থেকে মেনে নিতে পারছে না।-

‘‘অলঙ্কার লইয়া আইল সোনাঞীর সাক্ষাতে।
সিচিয়া ফেলায়া সোনাঞী লাগিল কান্দিতে।।’’[৪৩০]

স্বামীর বিরুদ্ধে শুধু ক্ষোভ বা অভিমানে নয়, নব যৌবনা ছয় পুত্রবধূর বৈধব্য যন্ত্রণার কথাকে মাথায় রেখে বুদ্ধিমতী সনকা বোধ হয় স্বামী সহবাস ত্যাগ করেছে। কিন্তু স্বামী চাঁদ স্ত্রী সনকার অঙ্গীকারকে মান্যতা না দিয়ে আবার চলে এল সনকার সঙ্গে সহবাস করতে।

‘‘হস্তিনির প্রতি জেন হস্তি উপস্থিতা।
মহাসাল বৃক্ষে জেন আউজাইল লতা।।
বাহু তুলি চন্দ্রধরে করে আলিঙ্গন।
লাজে মুখ ঢাকী সোনাঞী বুলিল বচন।।

লাজ নাহি চান্দো তোর মুখে পাকা দাড়ি।
ঘরেতে জাগয় মোর ছয় বধু রাড়ি।।
হেন মতে চান্দো সোনাঞ্জী হইল কতক্ষণ।
ভ্রমর রূপে পদ্যাবতী আইলা তখন।।
সোনাঞ্জীর দিগে চাহিয়া পদ্যা হানিল কামবাণ।
কাম ভাবে চান্দো সোনাঞ্জীর আকুল পরাণ।।
কামাতুর হইয়া চান্দোর স্থির নহে মন।
সোনাঞ্জীর সহিতে চান্দো ভূঞ্জিলা রমণ।।’’[৪৩১]

দূরদর্শিনী সনকা ভবিষ্যতে আরও অকল্যাণের আশঙ্কায় অধীরা। এরপর দেখা যায় চাঁদ বণিক দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য যাত্রায় বের হবার জন্য তৈরী হলে সনকা স্বামীকে বারবার নিষেধ করেছে। কিন্তু স্বামী-পুরুষ সদাগর তো আর স্ত্রী-নারী সনকার কথা ধরতে পারে না। তাই চাঁদ স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত না করে বেড়িয়ে পড়ল বাণিজ্য যাত্রায়।

‘‘সনকাএ বোলে প্রভু শুন গুণমনি।
ই ধন সম্পত্য প্রভু তোমার নিছনি।।
খাইবার কেহ নাই যত আছে ধন।
কি কার্য্যে যাইবে প্রভু দক্ষিন পাটন।।
না কর পরাণে ডর নাই পদ্মাবতী।
বিদেশে মৈলে প্রভু আমার কিবা গতি।।’’[৪৩২]

দৈবে সনকা জানতে পেরেছে চাঁদ যদি বাণিজ্যে যায় তবে তাঁর কপালে রয়েছে ঘোর বিপদ। তাই সনকা বারবার স্বামীকে বাণিজ্যে যেতে নিষেধ করেছে।

‘‘বোলে সনা মনে গুণি দৈবজ্ঞের বাক্য শুনি
অভাগিনীর প্রাণ কাঁপে ডরে।
শুন প্রভু প্রাণনাথ যোড় করি বলি হাত
বসিআ থাকহ মোর ঘরে।।’’[৪৩৩]

স্বামী সদাগর যখন বাণিজ্য যাত্রায় বের হওয়ার জন্য মনঃস্থির করেছে তখন সনকা অন্তঃসত্ত্বা। সনকা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, কলঙ্কিনী-দ্বিচারিণীর হাত থেকে রেহাই পেতে স্বামীকে গর্ভপত্র লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করে।

‘‘চান্দ পাটনে যাবে জানিল নিশ্চয়।
সোনেকা মঙ্গল কার্য্য করে অতিশয়।।

সোনাই বোলে কথা শোন প্রাণেশ্বর।
পদ্মার বরে পুত্র হইল আমার উদর।।
বৃদ্ধকালে দোচা[।]রিণী বলিবে আমারে।
তবে কি বলিব আমি লোকের গোচরে।।
কোন কালে নাহি তোমার অন্য মতি।
সর্ব্ব লোকে সংসারে জানে তুমি বড় সতী।।
এত শুনি চান্দো গর্ভ পত্র লিখি দিল।
রন্ধন করিতে সোনাই তখনে চলিল।।’’[৪৩৪]

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যে পাই-

‘‘হেনো কালে সনকা বলয়ে বিদ্যমানে। পঞ্চ মাস গর্ভ মোর কেহ নাহি জানে।।
লোকধর্মাচারে পাছে হয় অপমান। তবে পত্র দেহ রাজা সভা বিদ্যমান।।
পঞ্চ মাস গর্ভ জবে সনকা রমণী। হেন কালে পাটনে চলিলা নৃপমুনি।।
পুত্র হয় থোবে নাম লক্ষিন্দর বালা। দুহিতা হইলে নাম থুইয় জয়মালা।।’’[৪৩৫]

যদি সনকা তাঁর স্বামীর কাছ থেকে এই গর্ভপত্র লিখে না নিত তাহলে সনকার জীবনে নেমে আসতে পারত কঠিন সঙ্কট। চাঁদ সদাগর যখন বাণিজ্য যাত্রা শেষে বাড়িতে এসেছে তখন পুত্র লখিন্দরকে দেখে সনকার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছে। সনকাকে অনেকাংশে পতিতা বলতে কুণ্ঠাবোধ করেনি চাঁদ। কিন্তু সনকা যে দূরদর্শিনী বুদ্ধিমতী নারী তাই তাঁর স্বামী সদাগরের এহেন সন্দেহকে ক্ষণিকের মধ্যে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

‘‘কহ ২ সোনাই তুমি কহত সর্ত্তর।
কথাকার কুমার তর মন্দির মাঝার।।
বিষ্ণু ২ জপি বোলে সোনকা সুন্দরি।
দুরাইক্ষর বাক্য কেনে বোল অধিকারি।।
পূর্ব্ব জত কথা তর নাহিক স্মরণ।
জাত্রা কালে কৈলা তুমি রিতু অপক্ষণ।।
তাহাতে জন্মিল পুত্র নামে লক্ষিন্দর।
আজি কেনে না চিন আপন কোঙর।।
চান্দো বোলে স্মরণ নাহিক আমার।
শ্রীকলা পাতিয়া চাহ আমাক ভাড়িবার।।
চান্দোর সুনিঞা তবে নিষ্ঠুর বচন।

পত্র ফেলাইয়া তারে দিলা ততক্ষণ।।
বাম হাত দিয়া তবে পত্রখান লইল।
প্রদিপ নিকটে নিঞা চাহিতে লাগিল।
দিন ক্ষেণ মাস পুনি সাক্ষি চারিজন।
দেখিলেক পত্রে আছে সোমাইর লিখন।।
পত্র চিনি চন্দ্রধর হরসিত হইল।
লখাই কোলেত লইয়া চাহিতে লাগিল।।’’[৪৩৬]

সনকা হাজার অপবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। পুরুষের অঙ্গুলি-হেলনকে তিনি কোনভাবে মেনে নিতে পারেনি। সমাজ-বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে সনকা অনেক বেশি তৎপর। সনকা জানে স্বামী-সোহাগিনী হয়েও আজ স্বামী চাঁদের প্রতি যে ব্যবহার করছে তাঁর জন্য একদিন সে ফল ভোগ হয়ত করবে। তবুও সনকা নিজের কর্তব্য থেকে বিন্দুমাত্র সরে দাঁড়ায়নি। একেই তো বলে প্রতিবাদ। প্রতিবাদিনী সনকা আজ নিজের স্বামীত্বকে স্বীকার করেও না করার ভঙ্গিমায় সমাজকে পথ দেখিয়েছে। হাজার হাজার স্বামী সোহাগিনী নারীর কর্ণধার হয়ে সনকা বলে দিলেন যথেচ্ছারকে কোনভাবে মেনে নেওয়া যায়না। তাই হে বঙ্গললনা রমণীকুল তোমরা তোমাদের স্বীয় মর্যাদাকে নিজের করে তোলার জন্য তোমাদের নিজের ভিতরকার আমিত্বকে জাগ্রত কর। এই আমিত্বর গুণেই ব্যক্তিত্বকে চিনে মেনে নেওয়া যাবে।

ছয় ছয়টি পুত্র সন্তান হারিয়েও মা সনকা সপ্তম পুত্র লখিন্দরকে একদিকে মাতৃ-স্নেহ অপরদিকে পিতৃ-স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেনি। পিতার অবর্তমানকে বুঝতে দেয়নি সনকা। সমস্ত শিক্ষায় পারদর্শী করে তুলেছে লখিন্দরকে। সনকা আদরের সন্তান লখিন্দরের কোন অন্যায় আবদারকে মাথা পেতে নেয়নি। তাই তো দেখি বিনা কারণে যখন খেলার সঙ্গীকে লখিন্দর প্রহার করেছে তখন সনকা স্নেহের আধিক্যে লখিন্দরকে আশ্রয় না দিয়ে শাসন করেছে। এই শাসনের ভয়ে লখিন্দর মায়ের কাছে যেতে শঙ্কা বোধ করত। আবার জগজ্জীবনের কাব্যে এও দেখা যায় লখিন্দর তার মামীমা কৌসল্যাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে। ধর্ষিতা কৌসল্যা সনকার কাছে এসে সকল কথা বলতে লাগলে সনকা কিন্তু পুত্র লখিন্দরের পাশে দাঁড়িয়েছে। এহেন গর্হিত কাজকে সনকা কেমন করে মেনে নিল তা ভাবতে অবাক লাগে। কিন্তু সনকার করার কিছু ছিল না। নিজ স্বামীর পদ-মর্যাদাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই সনকা পুত্র লখিন্দরের এহেন গর্হিত কর্মের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানায়নি। পুত্র লখিন্দরের এই গর্হিত কাজ যদি সমাজের সম্মুখে চলে আসে তাহলে চাঁদের পদ মর্যাদা হেয় হয়ে যাবে। তাই সনকা পুত্র লখিন্দরকে কিছু না বলে কৌসল্যাকে বলে-কয়ে এবং নানা বস্ত্র-আভরণ-অলঙ্কার দিয়ে বাড়িতে

পাঠিয়ে দিয়েছে আর বলে দিয়েছে এই ঘটনা যেন কেউ না জানে। এখানে সনকা পুত্র লখিন্দরকে প্রশয় দিয়েছে।

‘‘খসায়া মাথার চুল ডুবাইল জাতি কুল
কুন লোকে কহিবেক ভাল।
পুছিলে তোমার ভাই কি কহিব তার ঠাই
না রহে পুরাণ গাছের ছাল।।’’[৪৩৭]

এভাবে কৌসল্যা যখন সনকাকে একে একে সমস্ত ঘটনা বলতে লাগল তখন মা সনকা লখিন্দরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছে-

‘‘সনা বোলে শুন বেটি ঢেট মুরূদারি নটী
না বোল শিশুকে কিছু মন্দ।
গন্ধবানিয়ার বালা ঢেট নহে আলা-ভোলা
বদনে দুগ্ধের আছে গন্ধ।।’’[৪৩৮]

এ কেমন সনকা? যার মধ্যে প্রতিবাদিনী রূপের পরিচয় পাই সেই সনকা সমাজের সবচেয়ে গর্হিত কাজকে অনায়াসে মেনে নিয়েছে শুধু কি নিজ-পুত্র লখিন্দর বলে? কেমন করে বলতে পারলে-

‘‘যে হৈল সে হৈল মাও চুপে চাপে ঘরে যাও
পহ্রিয়া সুবর্ণ অভরণ।।
সন্তোষ করিয়া তাক বস্ত্র দিল পহ্রিবাক
আর দিল সুবর্ণ অলঙ্কার।’’[৪৩৯]

এইভাবেই বুঝি সমাজের উঁচু তলার বাসিন্দা বলে হাজারও ভুল-অপরাধ করে কিংবা ধর্ষণের মত ঘৃণ্য কাজ করে পার পেয়ে যায়। এরপর সনকা স্বামী সদাগরের কাছে গিয়ে সমস্ত বলার পর, সদাগর সিদ্ধান্ত নেয় পুত্র লখিন্দরকে বিয়ে দেবে।

‘‘কোসল্যার হস্ত ধরি করিল বিদায়।
শীঘ্রগতি সনকা স্বামীর আগে যায়।।
স্বামীকে কহিল সনা বিবরণ কথা।
শুনি চম্পলাপতি হেট কৈল মাথা।।
সাধু বোলে পুত্র যদি করে অনাচার।
বিভা দিব পুত্রকে করিলাম অঙ্গীকার।।’’[৪৪০]

বিয়ের রাতে লখিন্দরের মৃত্যুযোগ রয়েছে জেনে মা সনকা কোন মতেই সপ্তম পুত্র লখিন্দরের বিয়েতে রাজি নয়। যখন লখিন্দর বিয়ের জন্য বায়না ধরেছে তখন সনকা বলেছে-

‘‘সনা বোলে তুমি মোর প্রাণ সব ধন।
সত্য সত্য বোলিলাম তোমায় বচন।।
বালা বোলে বিভা দিতে কর অঙ্গীকার।
তবেত জননী আমি ঘুচাই দুয়ার।।
সনকায় বোলে ই কথা না কহিয় বাপ।
বিভা রাত্রেতে বাছা খাইবে কাল সাপ।।
দ্বার ঘুচাহ বাছা কর স্নান ভোজন।
দাসী করি দিব একশত নারীগণ।।’’[৪৪১]

এই বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন সমাজের আসল পরিচয় ফুটে উঠল। আমরা তো ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখতে পাই কোন জমিদার তখনই জমিদার যখন সেই জমিদারের বাড়িতে নটী-নৃত্যাসর বসে। আর চাঁদ সদাগর তো বণিক সমাজের কর্ণধার তাঁর বাড়িতে নটীদের সমাগম সে তো আর দোষের কিছু নয়। মা সনকা জানে এই সমাজে পুরুষের বহু নারীকে ভোগ করার অধিকার রয়েছে। তাই সনকা ‘‘দাসী করি দিব একশত নারীগণ’’[৪৪২] -এর মত কথা বলতে পারল।

বিয়ের রাতে লখিন্দরের মৃত্যুযোগ থাকায় সনকা পুত্র লখিন্দরকে বিয়ে দিতে রাজি ছিল না। চাঁদ যদিও বলেছে লোহার বাসর ঘর নির্মাণ করে দিবে। আর একটাই তো রাত সেই রাতে প্রহরী সেজে আমরা সকলে রাত জেগে থাকব। কিন্তু সনকা জানে দেব-মনুষ্যের বিবাদে দেবতাদেরই জয় হয় আর পরাজয় হয় মনুষ্য সমাজের। এই পরাজয়ের আশঙ্কায় ভীত হয়ে সনকা কোন মতে লখিন্দরের বিয়েতে রাজি হতে চাইছে না।

‘‘চন্দ্রধর চলি গেল বাড়ির ভিতর।
কহিতে লাগিল কথা সোনাইর গোচর।।
তাহা সুনি সোনকা দুই হাতে কুটে হিয়া।
বারয় বৎস্যরে পুত্রেক করাইম বিহা।।
ইহ পুত্র নহে মোর দেখিলো সপন।
বিহা কৈলে কাল রাত্রে হইব মরণ।।
চান্দো বোলে সুন প্রিয়া না চিন্তিয় তুমি।
বিসহরি মুড়াণ কার্য্য করিয়াছি আমি।।
লোহার গৃহ করিয়াছি অধিক সুসার।
কাল রাত্রিত পুত্র বধু থাকিব তাহাত।।
ঠাক কটক দিয়া রাখিব জতনে।

কি করিতে পারে তারে নাগের পরাণে।।
চান্দোর বচনে সোনাঞি না পাতিয়ায় মনে।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে চান্দোর বিদ্যমানে।।
তোর মুখের দোসে মোর ছয় পুত্র মরে।
ইহ পুত্র দিলো তোরে নেও মারিবারে।।

*** *** ***

বিনে নির্ব্বন্ধ মরণ নাহিক সংসারে।
আঙ্গা দেও মাও মোরে বিহা করিবারে।।
লখাইর বচনে সোনাঞির লাগিলেক দয়া।
আঙ্গা দিলা বাপু তুমি কর গিয়া বিহা।।’’[৪৪৩]

পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে এবং চাঁদের নিজের সংকল্প থেকে এক বিন্দু সরে দাঁড়ায়নি। এক্ষেত্রে সনকার আর কিছু করার নেই। তাই বাসর রাতে যখন বেহুলার কান্না সনকার কানে এসেছে তখন ব্যাকুল হৃদয়া সনকা দৌড়ে গিয়ে পুত্র-পুত্রবধূর লোহার বাসর ঘরে চলে গেছে।

‘‘জগরে লাখের সদাগর।

নিসা ভাগ রাত্রি জায় বধু কান্দে উর্চ্চরায়
কি কারণে লোহার বাসর।।
চৈতন্য পাইয়া সদাগর সনকারে দিল চড়
কাচা ঘুমে কেন চেওয়ালি।
বয়সের পুত্রবধু বচন সুনিতে মধু
রঙ্গ রসে করে নানা কেলি।।
সুনিঞা চান্দোর বানি সনকা বুলিল পুনি
পুত্রবধু কিবা রঙ্গ জানে।
হাতে করিয়া ঝারি বাইর হইল সনকা নারি
জায় সোনাঞি বেউলা বিদ্যমানে।।

*** *** ***

কান্দে ২ বধু সাহের কুমারী।
ঘুচাও লোহার বাসর লখাইরে চাইহারী।।’’[৪৪৪]
‘‘সনকা শুনিল তবে বেহুলা-ক্রন্দন।

ত্রাসে কম্পবান অঙ্গ চমকিত মন।।
নিশ্চয় লখাই লিয়া হইল প্রমাদ।।
মনসাকুমারী (কোপে) গেলো বিসম্বাদ।।
সনকা বলেন শুন দাসী ঝাউয়াবতি।
কেনো বধূ কান্দে জানি আইস শীঘ্রগতি।।’’[৪৪৫]

‘‘ প্রাণনাথ কোলে কান্দে বেহুলা নাচনী। ঘর হৈতে শুনে তাহা সনকা বাণ্যানী।।
ক্রন্দন শুনিঞা তার শুকাইল হিয়া। পুত্রবধূ দেখিবারে আইল ধাইয়া।।
বেহুলা নাচনী বড় কান্দে উচ্চস্বরে দুর্ল্লভ লখাই মৈল লোহার বাসরে।।
দেখিয়া বিদরে হিয়া চক্ষে পড়ে পানি। মরা পুত্র কোলে করি কান্দেন বাণ্যানী।।’’[৪৪৬]

পূর্বে ছয় ছয়টি পুত্র সন্তান হারাবার পর আজ সপ্তম পুত্র লখিন্দরকে হারিয়ে সনকা চাঁদ সদাগরের উপর এতদিনের পুঞ্জিত ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন।

‘‘পুজিবারে য়ানিলাম সোনার ঘটবারি।
দেসের দুস্মন মুনিসা চান্দো অধিকারি।।
পুনি ২ বুলি সাধু বিবাদ না কর।
তোর দোসে হারাইলাম ছয় কোঙর।।

*** *** ***

ছয় পুত্র মরণে লাগীল জত তাপ।
তুমি পুত্র লাগিয়া সাগরে দিব ঝাপ।।
না রহিব ২ রার্য্য চম্পক নগরে।
কর্ণে কুন্ডল দিয়া মাগী খাইব সহরে।।
তবে বোলম বসুমতি দিদার দেও মরে।
মরূক সোনোকা নারি জাউক পাতালে।।’’[৪৪৭]

লখিন্দরের মৃত্যু চাঁদ সদাগরের জন্য হয়েছে। তাই সনকা স্বামী চাঁদকে দেশের দুস্মন বলতেও দ্বিধা করেনি। সংসারে যেকোন অশান্তির জন্য সব সময় নারীকেই কাঠ গড়ায় দাঁড় করানো হয়। এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় সনকা পুত্রবধূ বেহুলাকে দায়ী করেছে-

‘‘উর্চ্চ কপালি বধু চরণ দাতি।
আমার পুত্র লখাই খাইলা তোমার নিজপতি।।’’[৪৪৮]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তো আরও একটু এগিয়ে গিয়ে ক্রমান্বয়ে সনকাকে দিয়ে বেহুলাকে গালি দিলেন-

‘‘কার শাপ হৈল তোরে কেবা দিল গালি। সীথায় সিন্দূরে তোর না পড়িল কালি।।
পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি। পাএর আলতায় তোর না পড়িল ধূলি।।
খন্ড কপালিনী তুঞি চিরণিয়া দাঁতি। বিভা দিনে পতি খালি না পোহাল্য রাতি।।’’[৪৪৯]

বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখি সনকা পুত্র শোকে দিশেহারা হয়ে ভুমিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর-

‘‘হিতাহিত জ্ঞান নাহি শোকেতে ব্যাকুলী।
কোপ মনে সোনকাএ বেউলারে পাড়ে গালি।।
সোনকাএ বলে বধূ তুই বড় রূপসী।
মোর পুত্র খাইলি বড়ই রাক্ষসী।।
বড় রূপসী তুই গুণের সীমা নাই।
চান্দের বং নাশ করিতে ছিল কোন ঠাই।।
নিশ্চএ জানিলাম তুমি নিশাচর জাতি।
বিহার রাত্রি স্বামী খালি এ বড় অখ্যাতি।।
দূরে জাও রাক্ষসী এথা কি কারণ।
খাইয়াছ মোর বাছা সুন্দর লক্ষণ।।
দূরে যাও বধূ তুই এথা হৈতে চল।
লোকের সঙ্গে ফন্দি তোর কিছু নাহি ফল।।’’[৪৫০]

এরপর সনকা একেবারে বাস্তবের মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। সনকা তো আগেই জানে, যে যদি লখিন্দরকে বিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বাসর রাত্রেই তাঁর প্রাণ যাবে। তাই সমস্ত দুঃখ-শোক ভুলে গিয়ে এবার বাস্তববাদী সনকা ক্ষণপূর্বে বেহুলাকে যেভাবে গালি এবং লখিন্দরের মৃত্যুর জন্য দোষারোপ করেছে তাকে নিজেই খন্ডন করে বলতে লাগল-

‘‘এত বুলি কান্দে সোনাই কষ্ট করি মনে।
লক্ষিন্দরের বধু আমি রাখিব কেমনে।।
সুগঠিতা সুরূপা বধু চন্দ্র বদনি।
বচন মধুর জেন কুকীলের ধনি।।
পিঙ্গল লোচন নহে খঞ্জনিঞা আখি।
চিরণদসন নহে ভ্রমরা কেলকেশী।।
হিয়া উখড় নহে পিষ্ট নহে উশ্চ।

বিধবার লক্ষণ বধুর নহে দুই কুচ।।
বিযুগ কঙ্কন নহে খড়ম চরণ।
জে বুলিমু এহি বয়সে পতির মরণ।।’’[৪৫১]

স্নেহময়ী মা সনকা এই যুবতী সুলক্ষণা অকাল বিধবা পুত্রবধূকে কীভাবে আগলে রাখবে এই দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়েছে। সনকা ভালভাবে জানে যে দেবতার সঙ্গে স্বামীর বিবাদে তাঁর সপ্তম পুত্র লখিন্দরকেও হারাতে হল। তবুও সনকা বলেছে, বিধির বিধান কে খণ্ডিতে পারে। সনকা বিধাতাকে অভিশাপ দিতে ছাড়েনি-

‘‘এহি কর্ম্ম করিবার আমারে যুয়াএ।
খাখার রাখিব আমি দেবের সভায়।।
জেহি বিধি লিখিয়াছে দুঃখিনির কপালে।
সাপ দিব আমি বিধাতা উপরে।।
সাপ দিয়া বিধাতারে করো ভস্ব রাসি।
বিধাতারে কি বলিব মুঞি কর্ম্ম দুসি।।’’[৪৫২]

বাস্তববুদ্ধি সম্পন্না সনকা এবার নতুন সঙ্কটে পড়ল। এত সুন্দর রূপবতী বেহুলাকে কী করে আগলে রাখবে। এ দিকে সনকা তো জানে তাঁর পুত্রবধূ লখিন্দরকে নিয়ে কলার মান্দাসে করে সাগরে পাড়ি দিবে। তাই সনকা যে কোন প্রকারে বেহুলাকে এই কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বলেছে। বলে চলেছে আর যে ছয় বধূকে যেভাবে রাখা হয়েছে বেহুলা তাকেও সেইভাবে সনকার বুকের মধ্যে আঁকড়ে রাখবে। তাঁর হৃদয়ের সবটুকু মমত্ব দিয়ে বেহুলাকে ভালবেসে যাবে এই ভাবে নানা অজুহাতে বেহুলার যাত্রাপথ রুদ্ধ করতে চেয়েছে। বেহুলা যদি কাছে থাকে তাহলে মৃত লখিন্দরের স্মৃতিটুকু তার পাশেই থাকবে বলেও সনকা বেহুলাকে মরা স্বামীকে নিয়ে যেতে বারণ করেছে। সনকা চরিত্রের মধ্যে অসীম মমত্ববোধের পরিচয় পাই যখন ডোমিনীর ছদ্মবেশে বেহুলা কাছে এসেছে। দৈব নির্ভর সমাজে বাস্তবকে মেনে নেওয়ার মধ্যে রয়েছে দূরদর্শিতার পরিচয়। যা খুঁজে পাই সনকার মধ্যে। তাই তো বেহুলা যখন স্বামীকে নিয়ে কলার মান্দাসে বের হয়ে যাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তখন সনকা পথে বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

‘‘তুমি শিশু সীমন্তিনী: জলে ভাস্যা যাবে কেনি: প্রাণহীন পতি লয়্যা কোলে।
কালসাপে যারে খায়: সে নাকি পরাণ পায়: প্রতীত গিয়াছ কার বোলে।।
শুন কুল-কলঙ্কিনী: জলে ভাস্যা যাবে কেনি: বিধবা হইলে শিশুকালে।
দেখিয়া তোমার মুখ: বিদরিয়া যায় বুক: অবনী তিতিল নেত্র-জলে।।’’[৪৫৩]

ডোমিনীবেশে বেহুলাকে দেখামাত্র সনকা ভেবেছে বেহুলা বুঝি ডোমের উপ-পত্নী রূপে জীবন ধারণ করবে কিন্তু সনকা ডোমিনী বলে তাকে ফিরিয়ে না দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। বধূ বেহুলা যতই অনাচারী বা দ্বিচারিণী হোক না কেন তবুও পুত্রবধূর সমস্ত কালিমাকে অনায়াসে দূরে রেখে তাকে বুকে আঁকড়ে রাখবার জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছে।

''ডোমনি দেখিয়া সোনাই সানন্দিত মন।
এই পুত্রবধু মোর না জাএ খন্ডন।।
দুর্ব্বলি সুন তুমি আমার বচন।
পূর্ব্বের জথেক কথা নাহিক সরণ।।
কথা পাতি ডোমনি রাখিবা যে তোমি।
বিপুলার পরিক্ষা গিয়া দেখি য়াসি আমি।
সোনাই বোলে ডোমনিরে থাকিঅ চাহিয়া।
জাবত আসিএ আমি থাকিবা চাহিয়া।।''[৪৫৪]

সাত সাতটি পুত্র সন্তান হারাবার পর রিক্তা জননী সনকা আর ইহ জীবনের মত মা ডাক শুনতে পারবে না। তাই পুত্রবধূ বেহুলাকে পুত্র লখিন্দর তাঁকে যে মা বলে ডাকত বেহুলা বাড়িতে থেকে লখিন্দরের মা ডাকের শূন্য স্থানটি পূর্ণ করুক বলে মিনতি করেছে। কিন্তু তাতেও কর্ণপাত না করে মরা স্বামীকে জিইয়ে আনবার জন্য বেহুলা বেরিয়ে পড়ল। রক্ষণশীলা সনকা জানে একবার যে মরে যায় সে আর কখন জীবিত হয়না। তাই বাস্তববুদ্ধি সম্পন্না সনকা বলেছে-

''সনকা কান্দিয়া বলে আল অভাগিনী। এ তিন ভুবনে এহা কোথাহ না শুনি।।
শিশু যুবা অবলা যাহার পতি মরে। বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে।।
কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে। প্রতীত কাহার মনে পতি জীয়াইবে।।''[৪৫৫]

মধ্যযুগীয় ধর্ম্মাচারকে মাথায় রেখে সনকা পারত বিধবা পুত্রবধূকে সংসারে আগলে রেখে বৈধব্য জীবন যাপন করাতে কিন্তু সনকা এখানে অনেকখানি উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। বেহুলা তার মৃত স্বামীকে পুনর্জীবিত করার সংকল্পে বেড়িয়ে পড়ল। সনকাকে বেহুলা যাবার আগে বলে গেল-

''বেহুলা বিনয় করে সনকার তরে। মরা পুত্র জীয়ন্ত পাইবে নিজ ঘরে।।
কড়ার তৈলেতে রামা প্রদীপ জ্বালিয়া। শাশুড়ীর তরে যায় বিশেষ বলিয়া।।
কড়ার তৈলেতে দীপ ছমাস জ্বলিবে। তবে সে জানিবে মনে লখীন্দর জীবে।।''[৪৫৬]

সনকা দৈবে বিশ্বাসী হয়ে বেহুলার কথামত সব কাজ করেছে। যখন কাহিনির শেষাংশ এসে উপস্থিত তখন দেখা যায় বেহুলা তার শুধু নিজ স্বামী লখিন্দরকে জীবিত করে নয়, ছয় ভাসুরের প্রাণ এবং

শ্বশুরের হারানো সম্পদের দ্বিগুন সম্পদ নিয়েও হাজির হয়েছে। তখন সনকার আনন্দের সীমা নেই। সনকা উল্লাসে আজ আত্মহারা-

‘‘দেখিয়া শুনিঞা মনে বাড়িল উল্লাস। হাথ বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ।।
বেহুলারে ধন্য ধন্য সর্ব্বলোকে বলে। মরা পতি জীয়াইল কোন্ তপোবলে।।’’[৪৫৭]

কাহিনির শেষান্তে উপনীত হয়ে সনকা চরিত্রের বলিষ্ঠতম রূপটি আমাদের সম্মুখে ভেসে উঠেছে। রামায়ণের সীতার মত বেহুলাকে দিতে হয়েছে সতীত্ব নির্ণয়ের পরীক্ষা। বেহুলা তার সতীত্ব নির্ণয়ের জন্য নানা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কর্ণধার আর কিইবা করতে পারে! পুরুষত্বের জাহির দিয়ে অবলা নারীর উপর একেরপর এক অত্যাচার তো পুরুষের ধর্মে পরিণত হয়েছে। চাঁদ সদাগর কেন তার থেকে ব্যতিক্রম হবে? আমরা তো রাম রাজত্বের অংশীদার হিসেবে বেঁচে রয়েছি। রামের ক্রিয়া-কলাপ আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপস্থিত। রাম যেহেতু সীতার সতীত্ব নিয়ে কটুক্তি করেছিল, চাঁদও তাই করল। রাম যদিও বা সীতার ছিলেন স্বামী আর চাঁদ সদাগর হলেন বেহুলার শ্বশুর। শ্বশুর সদাগরের কীর্তি-কলাপ সম্বন্ধে আমরা আগেই অবহিত হয়েছি। সুন্দরী রূপসী কন্যা দেখে কামানলে দগ্ধ হয়ে চাঁদ যে তাঁর মহাজ্ঞান হারিয়েছে। রূপসী যৌবনবতী নারীর সঙ্গ নিতে দেখা গেছে এই কাব্যের ভিতর। আবার এও দেখা গেছে সব হারিয়ে যখন চাঁদ একটু খানি পয়সা পেয়েছে তখনই তাঁর সাধ জেগেছে নটী বাড়ি যাবার। সেই চাঁদ আজ নিচ্ছে বেহুলার সতীত্ব-পরীক্ষা। এই দেখে সনকা কোনভাবে নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। সারা জীবনের পুঞ্জিত ক্ষোভকে এক লহমায় বের করে দিয়ে বলল-

‘‘সোনাই বোলে সুনরে নিরভুদ সদাগর।
তোর দোসে হারাইলু পুত্র লক্ষিন্দর।।
তখনে না জান তোমি পতিব্রতা সতি।
কিরূপে যানিল ধন জিয়াইয়া পতি।।

*** ****

দুরবুদ্ধি হইল সাধু পাতিলে জঞ্জাল।
কাকের বাসাতে কুকিল থাকে কতকাল।।’’[৪৫৮]

স্বামী চাঁদের দেওয়া সতীত্ব নির্ণয়ের পর যখনই বেহুলা লখিন্দরকে নিয়ে অন্তর্হিতা হয়েছে, আ-জীবন দুঃখিনী সন্তান বিরহিনী সনকা তৎক্ষণাৎ নিজের আমিত্বকে জ্বালিয়ে স্বামী সদাগরকে একের পর এক কথা শুনিয়েছে। রিক্তা-শূন্যা হয়ে মা সনকার আজ শুধুই হাহাকারের ধ্বনি আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে এপার বাংলা ওপার বাংলার মাতৃ-হৃদয়ের শোকাচ্ছন্ন সঙ্গীত রোল আজও ধ্বনিত হয়ে রয়েছে। সনকা

তাঁর রক্তক্ষরা অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছে এত দিনে সত্যি সত্যিই তাঁর প্রাণের ধনকে কেউ হরিয়ে নিয়ে চলে গেল। আজ সনকা চিরতরে লখিন্দর হারা। তাই-

‘‘পুত্র ২ বোলি সোনাই ভূমিতে পরিল।
মুকে রাও নাহি য়াইসে মহশ্চিত হইল।।
অচেতন হইল সোনাই হইল হতাস।
কণ্ঠে প্রাণি নাহি রএ বুকে নাহি সয়াস।।
ছও বদু মিলিয়া তবে মাথে ডালে পানি।
হের য়াইসে লক্ষিন্দর উট ঠাকুরাণি।।
চেতনা পাইয়া সোনাই চক্ষু মেলি চাই।
কথাএ মোর পুত্রবদু প্রাণের লখাই।।
কি হইল ২ বলি পুসাএ রজনি।
চাহিতে হারাইনু পুত্র মুই অবাগিনি।।[৪৫৯]

সনকা পুত্র হারা হয়ে পাগলের মত বিলাপ করছে। সনকার ক্রন্দন শুনে চাঁদ সদাগর দৌড়ে এসেছে। স্বামীকে দেখা মাত্র সনকা নিজেকে কোনভাবেই সংযত রাখতে পারেনি। তাই স্বামী সদাগরকে বলতে লাগল-

‘‘সোনাঞি বোলে, ‘‘শুন রে নির্বোধ, সদাগর।
তোর দোষে হারাইলু পুত্র লক্ষ্মীন্দর।।
তখনে না জান তুমি পতিব্রতা সতী।
কিরূপে আনিল ধন জীয়াইয়া পতি।।
হেন জ্ঞান মনেতে যে না হইল তোরে।
না জানি কেমন দোষ দিয়া গেল মোরে।।
দুর্বুদ্ধি হইল সাধু পাতিলে জঞ্জাল।
কাকে বাসাতে কোকিল থাকে কত কাল।।
মানুষ ম্লেচ্ছ জাতি উপকার নাই।
এহা জানি অন্তরীক্ষ হইল লখাই।।
দেবপুরে গেল সাধু জিয়াইবার য়াসে।
এথ দিন ছিল আমি মনের ভরসে।।
আজি সে মরিল মর পুত্র লক্ষিন্দর।
বিফল জিবন মর কাটারি করি ভর।।’’[৪৬০]

৫ মনসামঙ্গল কাব্যে মুখ্য নারী চরিত্রগুলির অবস্থান বিশ্লেষণ

বেহুলা: শুধু মধ্যযুগে নয়, আধুনিক কালের সমাজও দুঃখের সমস্ত দায় চাপিয়ে দেয় নারীর উপর; তবে এও ঠিক নারীর মধ্যে দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে অসীম। যখন নারীর দুঃখের বোঝা বইতে বইতে পীঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে তখনই সে হয়ে উঠেছে বিদ্রোহী- প্রতিবাদী। এরই জ্বলন্ত উদাহরণ বেহুলা। মনসা মঙ্গলের বেহুলা একদিকে রক্তে-মাংসে গড়া মানবী বেহুলা। অন্যদিকে ত্যাগ-তিতিক্ষায় অজেয়া বেহুলা। মানবী বেহুলার মধ্যে দেখতে পাই স্নেহ-মায়া-মমতায় একেবারে আদর্শবতী বাঙালি ঘরের রমণীর সমস্ত গুণাবলী। আবার এও দেখা যায় এই বাঙালি ঘরের মানবী বেহুলা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা এবং দৈববিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধং দেহী রণমূর্তি ধারণ করে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কাব্যের মহান চরিত্র চাঁদ সদাগরকে দিয়ে মনসা হাজার চেষ্টা করেও তাঁর উদ্দেশ্যে পুষ্প-জল দেওয়াতে পারেনি কিন্তু আমরা দেখি যেখানে একজন দেবী একজন বণিক সমাজরের কর্ণধার সদাগরকে দিয়ে পূজা করাতে পারেনি অথচ একজন সাধারণ মানবী বেহুলা তাঁর শ্বশুর চাঁদকে দিয়ে পূজা দেওয়াতে সামর্থ্য হয়েছে। কিন্তু এই পূজা দেওয়ানোর মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানবী বেহুলা কী করে সংগ্রামী বেহুলায় রূপান্তরিত হল সে কাহিনিই আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। মনসা তাঁর কাজকে চরিতার্থ করার জন্য বেহুলাকে তো নিজেই নিয়ে এসেছেন কাব্য-মধ্যে। বলা যায় দেব এবং নরের মধ্যে যে বিরোধ তাকে নিষ্পত্তি করার জন্যই বেহুলার আগমন ঘটেছে। এই বেহুলাকে শুধু মাত্র দেবতারাই প্রশংসিত করেনি বরং মানব চরিত্র যতজন ছিল তারা সকলেই এবং পাঠক বর্গ বেহুলার প্রশংসায় মুখরিত হয়েছে। মনসা এবং সদাগরের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে মনসামঙ্গলের কাহিনি যতই এগিয়েছে ততই মনে হয়েছে এই বুঝি মনসা হেরে গেল, সত্যিই মনসা হেরে গিয়েছেন আর হেরে যাবার পর পিতৃদেব মহাদেবের আদেশকে শিরোধার্য করে কাহিনির মধ্যে আগমন ঘটল বেহুলার। বেহুলা এসে সমস্ত চরিত্রকে দূরে ঠেলে দিয়ে নিজেই তার উচ্চাসনটিকে সবার উপরে নিয়ে গেল। বলা ভাল, মনসামঙ্গলের কাহিনি শুধুমাত্র দেবী মনসার বিজয়মাহাত্ম্য নয়, বেহুলারও বিজয়মাহাত্ম্য। মনসামঙ্গল কাব্যখানি দেবী মনসার মঙ্গল গানে মুখরিত নয়, মানবী-কন্যা বেহুলার জয়গানের ধ্বনি আকাশে-বাতাসে গুঞ্জিত হয়ে পাঠকের হৃদয়ে আলোড়িত। এরই জন্য বোধ হয় বাংলা সাহিত্যের লেখক গোপাল হালদার বলেছেন-

> ‘‘ট্রাজেডির নায়কের মতো দৃঢ়তা আর মহিমা আছে এই চাঁদ বেনের চরিত্রে। আর ট্রাজিক নায়িকার মতোই সাহস ও সহজাত সৌন্দর্য আছে বেহুলার চরিত্রে। তাদের পাশে অন্যেরা ম্লান হয়ে যায়। এ কাহিনীকে মনসার বিজয়ও ততটা বলা যায় না, এখানে আসলে বিজয় বেহুলারই। কারণ, ক্রূর আক্রোশময়ী মনসা দেবী সে দিনের অত্যাচারী, স্বৈরতন্ত্রী রাজশক্তির মতো শেষ পর্যন্ত যথেচ্ছ শক্তির দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেন; ভক্তি বা শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময় তিনি উদ্রেক করতে পারেন না। অবশ্য, মনসাও দেবতার সমাজে বড় নির্যাতিতা, স্বর্গের

> উচ্চবর্গের চক্ষে অপাঙ্‌ক্তেয়া। আপনার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি তাঁকে আদায় করতে হয় অক্লান্ত সংগ্রাম করে, অন্য পথ নেই। অনেক সংগ্রাম-সংঘর্ষের ফলে তবেই হিন্দু সমাজের নিম্নবর্গের অধিকারহীন সাধারণ মানুষ স্বীকৃতি আদায় করে কায়েমি স্বার্থের ও কায়েমি হিন্দু চিন্তার অধিকারী উচ্চবর্গের কাছ থেকে।’’[৪৬১]

সমগ্র মনসামঙ্গল কাব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বেহুলা অল্প সময়ের জন্য কাব্য মধ্যে আবির্ভূতা হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে এলেও সমস্ত কবি কুলের মত সমস্ত পাঠক-বর্গ বেহুলার ভূমিকায় মুগ্ধ। বেহুলা কাব্যে না এলে মনসামঙ্গলের কাহিনি কখন-ই সার্থক হয়ে উঠত না। বেহুলার দৌলতেই চাঁদকে দিয়ে মনসা পূজা করাতে পেরেছেন। বলা ভাল মনসামঙ্গলের কাহিনির সুখময় সমাপ্তি ঘটেছে বেহুলার আগমনেই। এরই জন্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন-

> ‘‘কবিত্ব দেখাইয়া পাঠক-বর্গকে সন্তুষ্ট করা যায়, এরূপ অংশ মনসার ভাসানে বড় বিরল; কিন্তু গল্পের আগাগোড়া পড়িলে পাঠকের চক্ষু মধ্যে মধ্যে অশ্রুপূর্ণ হইতে পারে, এবং বেহুলা সতীর সুন্দর রূপে চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যাইতে পারে। আমরা যখন এই পুঁথি প্রথম পড়িয়াছিলাম, তখন মানবী বেহুলাকে দেবী বলিয়া বোধ হইয়াছিল; বেহুলার পাতিব্রতের কথা পড়িতে পড়িতে ভাবিয়াছিলাম-বাঁধুলী, তিল ফুল ও চতুর্দ্দশীর চাঁদ দিয়া কবিগণ সচরাচর যে সব সুন্দরী সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাদের অনেকে বেহুলার বাঁদী হইবার যোগ্যা নহে। শ্রাবণমাসে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্বদা ভাসান গান উপলক্ষে নৌকা লইয়া ক্রীড়া হইত; সেই সব গানের মূল লক্ষ্য ছিল বেহুলা;- সেই গীত নানা রাগ রাগিণীতে উজ্জ্বল হইয়া পল্লী-বধূগণের হৃদয়ে হৃদয়ে বেহুলা সতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিত;- আমরা এখন রেবেকা ও কসেটির রূপে মুগ্ধ হইয়া ঘরের খাঁটি সোণার মূর্ত্তিকে পূজা করিতে ভুলিয়াছি।’’[৪৬২]

বেহুলা তার চারিত্রিক দাঢ্যতার গুণে এবং অসামান্য কার্য ক্ষমতার গুণেই একইসঙ্গে রোষানলে প্রজ্জ্বলিত মনসাকে যেমন জয় করেছে তেমনি হিমালয়ের মত অটল-অচল হৃদয়ের অধিকারী শ্বশুর চাঁদ সদাগরকে বশীভূত করেছে। দৈব নির্ভর সমাজের কবিরা বেহুলাকে একজন আদর্শবতী নারী হিসেবে অঙ্কন করেছেন। দৈবের বিধানকে চরম ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছে। এ কেমন কবিকুল সমাজ, যাঁরা একজন অতি সাধারণ নারী বেহুলাকে দিয়ে এরকম কৃচ্ছ্রসাধন করালেন। বেহুলা রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া তাকে একদিনের জন্যও স্বামী সঙ্গ না করিয়ে বরং মৃত স্বামী লখিন্দরকে সঙ্গে করিয়ে কলার মান্দাসে নিরুদ্দেশ্যে পাঁড়ি দেওয়ালেন। স্বামী সোহাগে সোহাগিনী কবি-কুলের আদর্শলোকের নারী বেহুলা কঠিন-কঠোর আত্মসংযম ও সংগ্রামের মাধ্যমে নিজের কাঙ্খিত জীবনের পরম সার্থকতাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আর তাই বেহুলা সেকালের মত আধুনিক সমাজের আজও মহিয়সী নারী। বলা চলে বিদ্রোহিনী নারী সমাজের অগ্রদূত। এই অগ্রদূত

নারী বেহুলা দৈবের বিধানকে এক লহমায় পরাভূত করেছে। তৎকালীন সমাজের কর্ণধারেরা যে নারীকে শুধু ভোগের সামগ্রী কিংবা সন্তান উৎপাদনের কারখানা ঘর করে রাখতে চেয়েছে তাদেরকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নিজের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের দ্বারা নিজের অধিকারকে করায়ত্ব করেছে। দৈবের বিধানকে পরাভূত করতে বেহুলা কুণ্ঠাবোধ করেনি। কারণ বেহুলার ব্যক্তিত্ব এবং তেজোদীপ্ত আচরণের জন্যই দৈব বিধান পরাহত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন-

‘‘নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্ত ধৈর্য্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে?
শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ?
কেননা ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্গাপাশে,
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ?’’[৪৬৩]

এরই প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পাই নারায়ণ দেবের ‘পদ্মপুরাণে’র বেহুলার মধ্যে-

‘‘জদি বেউলা মম সতি   সাহসে জিয়াব পতি
জেন জস ঘোসয়ে সংসারে।
জাইব দেবের পুরি   রঞ্জাইব বিসহরি
আমি জাইয়া জিনিব মনসারে।।
বেউলা বোলে প্রহরি   মাঞ্জসে হইল চুরি
ঝাটে জানাও সসুরের ঠাই।
নারায়ণ দেবে কয়   সুকবি বর্ল্লভ হয়
কাল নাগে দংসিল লখাই।।’’[৪৬৪]

বেহুলা ‘‘রূপে গুণে একধন্যা’’[৪৬৫] অনন্যা নারী। সঙ্গীত-নৃত্যে পারদর্শিনী হওয়ায় নাম ‘বেহুলা নাচনী’। ব্যবহারের জন্য বেহুলা সখীদের কাছে নয়নের মণি। ভাই আর ভাই-বৌদের কাছে বেহুলা আদরের ধন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের বেহুলা পিতা-মাতার কাছে স্নেহ-পুত্তলি। কিন্তু বেহুলা বহুদিন যাবৎ অনুঢ়া। বিয়ের প্রস্তাব ঠিক করতে গিয়ে এত সুন্দর রূপবতী-গুণবতী বেহুলাকে আত্মহত্যার মত পথকে বেছে নিতে হয়েছে। সতী নারী বেহুলা লৌহকলাইকে ভাতে পরিণত করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। যদিও দেবী মনসার কৃপাবলে অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে। কিন্তু এই বেহুলাকে কবিরা তাঁদের কলমের আঁচড়ে একেবারে সতী নারী রূপে অঙ্কন করেছেন। বেহুলার রূপের পরিচয় পাই যখন বেহুলা তার সখীদের সঙ্গে নিয়ে মুক্তাসারে স্নানে চলেছে-

‘‘বাপে সাজাইয়া দিল স্নানে করে মেলা।
মুখখানি পূর্ণিমার চন্দ্র ছয়ে দন্ত ছোলা।
আগে নহে যায় বেউলাগ পাছে না যায় লাজে।
রহিয়া রহিয়া মঙ্গল গাহে সখীগণের মাঝে।।
চাচর চিকুর শোভে তিলক ললাটে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মেঘের নিকটে।।
দশনে মুকুতা পাতি গ অধরে তাম্বূল।
নাসিকার শোভা জেন জিনি তিল ফুল।।
নিতত্ব বিস্তার যেন নয়নে কাজল।
কমল উপরে যেমন ভ্রমর উঝল।।
ক্ষীণকটী আর স্তন হিয়ায়ে শোভে বড়ি।
সরোবর মধ্যে যেন কমলের কড়ি।।’’[৪৬৬]

মনসার ছলা-কলার জালে বেহুলাও জড়িয়ে পড়েছে। যে বেহুলা রূপে-গুণে অনন্যা তাকে দেবী মনসার শঠতার মধ্যে পড়তে হয়েছে। বেহুলার লঘু অপরাধে মনসা যে শাস্তি দিয়েছেন তাতে মনসাকে দেবী বলতে কুণ্ঠা বোধ হয়। এ মনসা তো দেবী নয়, এ মনসা প্রতিহিংসা পরায়নী। কিন্তু বেহুলা তো তেমন কোন অপরাধ করেনি যার জন্য মনসা বেহুলার বাসর রাতে স্বামীকে মেরে ফেলবেন। আসলে ক্ষমতাকে পাওয়ার আশায় সামান্য ভুলের জন্য কঠিনতম শাস্তির কবলে পড়তে হল বেহুলাকে। তাহলে দেখা যাক বেহুলার কী অপরাধ। প্রত্যেক কবি তাঁর নিজ নিজ কাব্যে এই ঘটনার মধ্যে কিছু কিছু রঙিনতার ঝলক সৃষ্টি করেছেন। নারায়ণ দেবের কাব্যে দেখা যায় বেহুলা বাল্য বয়স থেকে মনসার ভক্ত। একদিন রাত্রে মনসা স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন-

‘‘উঠ ২ বিপুলা কতেক নিদ্রা জাও।
আমি পদ্যা আসিয়াছী চক্ষু মেলি চাও।।
কালি প্রভাতে জাইয় তির্থ মুক্তাসর।
মনের বাঞ্ছিত তোমারে দিব বর।।’’[৪৬৭]

মনসার স্বপ্নাদেশকে শিরোধার্য করে এবং মা-বাবার অনুমতি নিয়ে বেহুলা গেছে মুক্তাসারে স্নান করতে। কিন্তু বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখি বেহুলাকে তার মা মেনকা বলেছেন-

‘‘পর পুরুষ দেখিতে তোমার হইছে মন।
কপট করিয়া এত কান্দ কি কারণ।।
আমার ঠাই না বিকায়ে তোমার নারীকলা।
পরপুরুষ চাহিতে স্নানে হইল মেলা।।’’[৪৬৮]

এরপর পিতা সাহের অনুমতি নিয়ে মুক্তাসারে স্নান করতে গিয়েছে বেহুলা। যাবার আগে বেহুলার পিতা তাকে সতর্ক করে বলেছেন-

‘‘সাহে বলে রাজপথে জঞ্জাল বিস্তর।
স্নান করিয়া শীঘ্র আসিয় সত্বর।।’’[৪৬৯]

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে লখিন্দরের মত মনসা বেহুলাকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিয়ে করার জন্য সম্মতি আদায় করেছে। ব্রাহ্মণী বেশধারী মনসা বেহুলাকে বলেছে-

‘‘ছাড় খেলা শিশুমেলা সাহের নন্দিনী।
বিবাহের কার্য্য তুমি চিন্তহ আপনি।।
বয়ঃক্রম হৈল তার পয়োধর ভার।
এমন বয়সে বোলো স্বামী নাহি কার।।
তোমার ছোট জন হৈল ছাওয়াল পুয়াতি।
তুমি হেন সুন্দরী তোমার নাই পতি।।
এমন বয়সে তোকে বিভা না দেয় বাপে।
না মিলিবে স্বামী তোর পূর্ব্বজন্ম পাপে।।’’[৪৭০]

এ কথা শোনারপর ব্রাহ্মণীকে বেহুলা বলেছেন আমার গতি করুন। বেশ সুযোগ বুঝে মনসা বলেন-

‘‘বালী বোলে ঠাকুরাণী কর মোর গতি।
কি বুদ্ধি প্রকারে আমি পাবো নিজ পতি।।
ব্রাহ্মণী বোলে বালী ছয় ঘাটিকে যাঅ।
তাতে স্নান করিলে স্বামীর বর পাঅ।।’’[৪৭১]

প্রতিটি মঙ্গল কাব্যে দেখা যায় মুক্তাসারে স্নান করার সময় দেবী মনসা বেহুলার সামান্য ভুলের জন্য অভিশাপ দিয়েছেন-

‘‘স্নান করয় বেউলা আপনার মনে।
মায়া বেসে পদ্যা জায় কিছুই না জানে।।
খন্ডাইতে না পারি দৈবের জে বাণি।
বিধুবার গায়ে গেল গোড়ালিয়া পানি।।
কোপ করি বিধুবায় বুলিল বচন।
কথাকার পাপিষ্ট ছার হেন অভাজন।।

***　***　***

এতখানি রাগ তোমার প্রথম বয়সে।
ব্রাহ্মণ না চিন তুমি বণিক জাতির দোসে।।
কাল রাত্রিত বিধুবা তুমি হইবা নিশ্চয়।
প্রিথিবিত তোমার জেন বংস নাহি রয়।।
কোপ করি বুলিলেক কুমারির আগে।
কালরাত্রিত প্রভু তোর খাউক কালনাগে।।’’[৪৭২]

বিপ্রদাসের কাব্যে রয়েছে-

‘‘অবধান নাহি করো দেখিয়া ব্রাহ্মণী। কোন গর্বে মোর অঙ্গে দিলা তো গোড়ানি।
জানিবি পশ্চাতে চূর্ণ হবে অহঙ্কার। শাপ দিনু বিবা-রাত্রে খাইবা ভাতার।।’’[৪৭৩]

‘‘খসায়া সভার বস্ত্র রাখে এক স্থানে।
ঝাপাঝাপি করিয়া নাবিল সর্ব্ব জনে।।
সখীসঙ্গে জলক্রীড়া করে বানিয়ানী।
বিধবার গায়ে পড়িল পায়ের পানি।।
বিধবায়ে বোলে ওঠে ঢেট মুরুদারি।
কাহার ঝিয়ারি তুমি কাহার বৌহারি।।
তোর পায়ের পানিতে ভরিল মোর অঙ্গে।
বিভারত্রি স্বামী তোর পড়িবেক ডঙ্কে।।’’[৪৭৪]

‘‘ঘাটের কিনারে বুড়ী রহিল বসিয়া। বেহুলা নাচনী যায় হাসিয়া হাসিয়া।।
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ে বেহুলা নাচনী। মনসার অঙ্গে লাগে গোড়ালির পানি।।

***　***　****

বুড়ী বলে সে সব আমার কর্ম্মদোষ। দুজনে করিব স্নান হয়্যা পরিতোষ।।
কার হাথে কিবা উঠে দেখিব এখন। প্রতিজ্ঞা করিয়া ডুব দিল দুইজন।।
মনসার হাথে উঠে শঙ্খ-চন্দন। বেহুলার হাথে উঠে ভূষণ কঙ্কণ।।
ভূষণ কঙ্কণ দেখি দেবী দিল শাপ। বাসরে মরিব পতি পাবে মনস্তাপ।।’’[৪৭৫]

আবার দেখা যায় কোন কোন কবি বেহুলাকে এই সামান্য অপরাধের জন্য গুরু দণ্ড দেওয়ার ফলে বেহুলাও ছদ্মবেশিনী মনসাকে ছেড়ে কথা বলেনি।

‘‘বেহুলা কহিল বুড়ী তুমি নহ ভাল। না দেখ আপন দোষ মোরে মন্দ বল।।
মধ্যঘাটে আছ তুমি পথ আগুলিয়া। শ্রমবশে পড়ি আমি জলে ঝাঁপ দিয়া।।’’[৪৭৬]

বিজয় গুপ্তের ‘পদ্মাপুরাণে’ দেখি যতি বেশধারী মনসাকে বেহুলা যে ভাষায় কথা বলেছে তাতে বেহুলার সাহসিকতার বাহবা দিতেই হয়। যদিও এই সাহস এসেছে মনসার সেবিকা বলে। যতি বেশধারী মনসাকে একেবারে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে বেহুলা। বেহুলার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দেখি অল্প বয়সে বিধবা হলেও তাদের মনের মধ্যে যে রতি-সুখ ভোগ করবার জন্য বাসনা জাগে তা ফুটে উঠেছে। এমনকি বছরে বছরে গর্ভপাতের কথাও উল্লেখ করেছে।

‘‘মিছা গালি দেও ব্রাহ্মণী।
নহে যায়ে চরণ গোলানি।।
তোমার গাইলে আমার হবে কি।
সহায়ে আছে মহাদেবের ঝি।।
নাম ধর তুমি যতি হেটে মাছ উপরে লতি
মৎস্য খাইয়া কর যতিপানা।
বাপ মোর অধিকারী সে ফল ফলাইতে পারি
সম্ভাদিয়া মৎস্য করম মানা।।
ভাই আছে লক্ষ জন ধরিয়া দিব আলিঙ্গন
যতিপানা যাবে ছারে খারে।
খাড়া দেখি দুই স্তন পুরুষের যায় মন
বেড়াও তুমি পুরুষ অন্বেষণে।।
বাপের পুখরি মোর তাথে কিবা দায় তোর
মিছা গালি কেন দিলা আমা।
সুখে করি জল কেলি তাহে মোরে পাড় গালি
ভাল মতে শাস্তি দিব তোমা।।

যদি হই শুদ্ধমতি রক্ষা করবে পদ্মাবতী
তোমার গাইলে কি হইব আমা।
চিত্ত দিয়া শোন বসি আমি মনসার দাসী
যতি দেখি খেমিলাম তোমা।।
অনুমানে বুঝি বোলে তোমার পাপের ফলে
অল্প বয়েসে মরিল ব্রাহ্মণ।
যতি বেশ নহে দেখি অসতীর মধ্যে লেখি
পুরুষ চাহিতে বেড়াও ঘন ঘন।।
যত যতি সন্ধ্যা করে তারা সব রহিছে ঘরে
রাজপথে কেন অকস্মাৎ।
যার তার ঘরে যাও মৎস্য লুকাইয়া খাও
বৎসরে বৎসরে গর্ভপাত।।’’[৪৭৭]

ব্রাহ্মণী-যতি বেশধারী মনসা বেহুলাকে অভিশাপ দিলেও বেহুলা ভয় পায়নি। কারণ তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে আছে সতীত্বের তোজোত্তাপ। বেহুলা জানে সতী নারীর পতি মরতে পারে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশী মনসার সঙ্গে বেহুলা সতীত্বের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে আর তাতে বেহুলারই জয় হয়েছে।

‘‘বেউলা বলে যতি তুমি শোন দিয়া মন।
মোর তরে শাপ তুমি দিলা কি কারণ।।
এক কালে দুই জনে জল মধ্যে যাই।
ডুব দিয়া দুই জনে কোন বস্তু পাই।।
ডুব দিয়া দুই জনে জলে দিল ঝিম।
বেউলা পূর্ব্বেত রইল মনসা পশ্চিম।।
হাত সার দিয়া বেউলা জল ঘরে যায়ে।
শঙ্খ সিন্দুর বেউলা জল মধ্যে পায়ে।।
হাত সাড়া দিয়া যতি উঠে একে কালে।
আতপ তন্ডুল ঘৃত পাইলেক জলে।।
এহ দেখি সর্ব্বজন হরষিত হইল।
সাধু সাধু করি সবে বেউলা প্রশংসিল।।’’[৪৭৮]

বেহুলা চরিত্রের মূলধন হল সতীত্ব। এই সতীত্বের জোরেই বেহুলা সেকালের মত আজকের রমণীকুলের কাছে একজন সতী নারী। এই বেহুলা সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর মতই প্রাতঃস্মরণীয়া। চাঁদ সদাগর পুত্র লখিন্দরের জন্য কন্যা দেখতে এসে, মেয়ে বেহুলার সতীত্ব পরীক্ষা করার জন্য লোহার চাউলের ভাত রাঁধতে বললে, তা বেহুলা এক লহমায় করে ফেলেছেন। সতীত্বের জোরেই বেহুলা অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে। যদিও এ সবই সম্ভব হয়েছে দেবী মনসার কৃপা বলে। মনসার এক নিষ্ঠ সেবিকা হওয়ার ফলেই বেহুলা মানবী থেকে ক্রমান্বয়ে যেন দেবীত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। আবার বেহুলার রয়েছে মৃতকে বাঁচিয়ে তোলার ক্ষমতা। যখন দেখা যায় চাঁদ সদাগর একটি মরা শোল নিয়ে এসেছে। তারপর বেহুলাকে চাঁদ বলেছে-

> ‘‘চান্দো বোলে মোর কথা শোন গুণবতী।
> মরা সউল জিয়াইয়া তুমি দেও শীঘ্রগতি।।
> মরা সউল জিয়াইতে (যদি) পারহ আমার।
> তবে সে পৃথিবীতে ধন্য জনম তোমার।।’’[৪৭৯]

এই কথা শোনার পর বেহুলা-

> ‘‘এতেক শুনিয়া বেউলা চান্দের উত্তর।
> মন্ত্র পড়ি জল দিল সউলের উপর।।
> ততক্ষণে মরা (সউল) বাঁচিয়া উঠিল।
> তাহা দেখি সদাগর হরষিত হইল।।’’[৪৮০]

বেহুলার মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা দেখে আনন্দিত হল চাঁদ সদাগর। তখন চাঁদ স্থির করল-

> ‘‘মরিলে জিয়াইতে পারে হারাইলে পাই।
> হেন গুণবতী কন্যা ত্রিভুবনে নাই।।
> তাহা দেখি সদাগর হরিষ অন্তর।
> সউল লইয়া গেল সোমাই পন্ডিত গোচর।।
> হেন গুণবতী কন্যা বড় ভাগ্যে পাই।
> অবশ্য করাব বিহা সুন্দর লখাই।।
> সোমাই পন্ডিতে বলে তুমি ভাগ্যবান।
> লখাইর যোগ্য বধূ বহু গুণবান।
> রূপে বিদ্যাধরী বধূ গুণের নাহি অন্ত।
> এই বধূ বিহা কৈলে লখাই ভাগ্যবন্ত।।’’[৪৮১]

তৎকালীন সমাজের কর্ণধার চাঁদ সদাগর। বেহুলা মরা শোল মাছকে জীবিত করার পরও চাঁদ আবার বেহুলার সতীত্ব পরীক্ষায় অবতীর্ণ হল। চাঁদ লোহার কলাই-এর ভাত খাবে বলে স্থির করলে বেহুলাকে মনসা স্বপ্নে জানিয়েছেন কীভাবে লৌহ কলাই সিদ্ধ হবে। আবার দেখা যায় লৌহ কলাই-এর ভাত সিদ্ধ হচ্ছে না দেখে বেহুলা মৃত্যুর জন্য উদ্যত হলে মনসা এসে এই অসাধ্যকে সাধন করে তুলেছেন।

"বিপুলাকে পরক্ষিতে চায় চন্দ্রধরে।
কোন মতে ভাত বেউলা না পারে রান্ধিবারে।।
আপনার কার্য্য সিদ্ধি চিন্ত বিসহরি।
বেউলার তরে নামে পদ্যা রথে ভর করি।।
ডাক দিয়া বোলে সুন বিপুলা মাও।
ফুটিল লোহার চাউল সরা মেলি চাও।।
দেবধ্বনি সুনি বেউলা সানন্দিত মন।
সরা ঘুচি চায় তবে ফুটিয়াছে অর্ন্ন।।"[৪৮২]

"মনে অনুতাপ করি করিল ক্রন্দন। লোহার কলাই গেল করিতে রন্ধন।।
বেহুলার তরে মাতা মনসা প্রত্যক্ষ। কাঁচা মাটি আনিঞা সাজাল্য তিন ঝিঁক।।
আড়াই হালা কাঁচা বেণা আঁওহাঁড়ি সরা। ছবুড়ি কলাই লোহা তাহে দিল ভরা।।
মনে মনে জপ করে মনসার ধ্যান। মনসা চিন্তিয়া মনে জ্বালিল উনান।।
আড়াই উকাল জ্বালে আড়াই নিমেষে। লোহার কলাই রামা রান্ধিল হরিষে।।
মনেতে মনসা তারে করিল কল্যাণ। লোহার কলাই হৈল অন্নের সমান।।
লোহার কলাই যদি করিল রন্ধন। চাঁদেরে আনিঞা দিল সায়ের নন্দন।।"[৪৮৩]

বেহুলা তার সতীত্বের জোরেই লোহার কলাইকে ভাতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা একটি প্রতীক নিয়ে এসেছে। পাঠককে যেন জানিয়ে দেওয়া হল- সামনে বিপ্লব আসছে আর সেই বিপ্লবের কর্ণধার বেহুলা। এই বেহুলার দ্বারাই নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। আসবে নতুন ঊষার আলো। সেই আলোয় আলোকিত হয়ে বঙ্গবাসী সকলে বেহুলার জয়গানে মুখরিত হবে।

বেহুলা আজন্ম মনসার সেবাদাসী। এই সেবাদাসীর বিয়েতে মনসা উপস্থিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই আগ্রহ প্রকাশের ভিতর মনসার ছলনাময়ী ভয়ঙ্করী রূপের পরিচয় পাই। নেতা থেকে শুরু করে দেব-দেবী সকলে ভীত হয়ে পড়েছেন। কারণ তাঁদের সকলের ধারণা, না জানি কী করে মনসা বিয়ের আসরে। তবুও মনসা বেহুলা-লখিন্দরের বিয়ের ছাদনা তলায় এসেছে উনকোটি সাপকে সঙ্গে নিয়ে। মনসার উদ্দেশ্য এই সাপের দর্শন করিয়ে লখিন্দরকে অচৈতন্য করে ফেলা।

‘‘উনকুটী নাগ লয়া জয় বিসহরি।
লখাইর সিরের উপর রহিল সিগ্র করি।।
চান্দোয়া উড়ায় নাগে নাসিকার বায়।
ডর পাইয়া লক্ষিন্দর ডাহিনে বামে চায়।।
আচভিতে লখাই দেখিয়া কাল সাপ।
ঢলিয়া পড়িল লখাই বুলিয়া বাপ ২।।
সাহে রাজা চিন্তিত হইল লইয়া প্রজাগণ।
এথায় বিপুলা তবে বিরস কৈলা মন।।
সুমিত্রার ক্রন্দনে বৃক্ষের পাত ঝরে।
চান্দোর ক্রন্দনে জেন ভাঙ্গা ঢোল পড়ে।।’’[৪৮৪]

বেহুলা যেহেতু মনসার ভক্ত এবং আজন্ম সেবিকা তাই বেহুলা ভাবল মনসার প্রসাদ লাভ করে স্বামী লখিন্দরকে জীবিত করে তুলবে। কিন্তু মনসা প্রথমে লখিন্দরের মৃত্যুর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছে। মনসা জানিয়ে দেয় বেহুলার স্বামী কোন ডাকিনী যোগিনীর হাতে নিহত হয়েছে। কিন্তু বেহুলাও তো ছাড়বার পাত্রী নয়, তাই মনসাকে যখন বেহুলা স্ত্রীবধের জন্য দায়ী করবে বলেছে তখন মনসা সেবিকা বেহুলার প্রতি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তুলেছেন।

‘‘স্তন কাটী লইনু হাতে   রক্ত পড়ে ধারাস্রোতে
তবু মোরে না হইল দয়া।
সনগ অস্তিকের আই   যদি মরে লখাই
ইহ লোকে না বসিমু বিহা।।
জিবনের কিবা আসা   ক্রপা কর মনসা
না রাখিয় আপনা খাখারী।
পুরূস বধ হইল তথা   স্ত্রি বধ দিমু এথা
দেখ গলে ভাজাই কাটারি।।
গলায়ে কাটারি দিতে   মনসা ধরিল হাতে
স্ত্রীবধ বারণ কারণ।
হাসি বোলে পদ্যাবতি   বুঝিলাম তোমার মতি
জিব লখাই স্তির কর মন।।
পদ্যা দিল সঙ্খ জল   জিব তর লখিন্দর
হ্রিদয়ে লাগাইল কাটা স্তন।’’[৪৮৫]

বেহুলার এবার বিয়ের পালা সাঙ্গ হল। এবার তার শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার পালা। শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার আগে বাঙালির ঘরোয়া চিত্র অঙ্কন করেছেন মনসা মঙ্গলের সকল কবিবর্গগণ। এখানে বেহুলা যেন আমার-আপনার ঘরের কোন রমণী, যে চলেছে পিতৃ-পরিচয়কে দূরে রেখে নিজ স্বামীর পরিচয়ে। বেহুলার মা-বাবা-ভাই-সখী সকলে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় দিয়েছে।

বেহুলা চলে এল শ্বশুরের গৃহে। আজ বেহুলা-লখিন্দরকে রাত যাপন করতে হবে সান্তালি পর্বতের লৌহ বাসর ঘরে। কারণ চাঁদ জেনেছেন বিয়ের বাসর রাতে লখিন্দরের মৃত্যু ঘটবে সাপের দংশনে। এরই জন্য সান্তালি পর্বতে লোহার প্রাসাদ গড়েছেন পুত্র এবং পুত্রবধূর বাসর শয্যা উদ্‌যাপনের। এখানে বেহুলা পড়লেন আবার কঠিন সঙ্কটে। বেহুলা সতীত্বের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। আজ বাসর রাত। এই রাতটির জন্য নারী-পুরুষ সকলের কাছেই বহু প্রত্যাশিত, বহু প্রতিক্ষিত, বহু-কাঙ্খিত এই রাতটি জীবনে একবারই আসে। কিন্তু বেহুলার ক্ষেত্রে এই রাতটিই চরম পরীক্ষার। স্বামী লখিন্দরকে আজ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। বেহুলা তার নিজ দায়িত্ব পালন করতে সদা-সচেতন। নিজের সত্য পালন করতে বেহুলা কঠিন সংযমের পরিচয় দিয়েছে। লখিন্দররের কামানলের বহ্নি-শিখা প্রজ্জ্বলিত হলেও বেহুলা সেই মিলন আনন্দ থেকে বিরত থেকেছে।

‘‘প্রিয়া দেও মোরে আলিঙ্গন   খুদায়ে আকুল মন
অহি ভিক্কা মাঙ্গম তোর ঠাই।।-
বেউলা বোলে প্রভু তুমি   তোমাকে বুঝাব আমি
বুর্দ্ধি জ্ঞানে তুমি বৃহস্পতি।
খেমাতে করিয়া চিতা   লোব কর কর মুহিত
প্রভু খেমা কর না মাঙ্গ ছুরতি।।
লখাই বোলে সসিমুখি   তোর রূপ জৌবন দেখি
রূপে গুণে ভুঞ্জি আনন্ধীতা।
স্বামির বাক্য নিন্ধা করি   তাড় নানা ছল করি
তরে কোন ছারে বোলে পতিব্রাথা।।

***   ***   ***

বেউলার বদনে চুম্বন দিলেন প্রচুর।
লখাইর গালে লাগিয়াছে বেউলার সিথের সিন্দুর।।
অধরের মৈর্দ্ধে জেন শোভে বানির ফুল।
নঞান কাজল গালে বিস্তর লাগিল।।

বেউলার কাজল লখাইর লাগিয়াছে গালে।
সোসধর জিনিঞা জেন অতি সোভা করে।।
আকাসে লাগিছে জেন চন্দ্রগ্রহণ।
বেউলা বোলে সুন প্রভু আমার বচন।।
আজুকার মতে প্রভু খেমা কর মন।’’[৪৮৬]

সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী বেহুলার কাছে, স্বামী লখিন্দর লোহার বাসর ঘরে ভাত খেতে চেয়েছে। কিন্তু বাসর ঘরে না আছে জল, না আছে চাউল। রান্না করার মত কোন দ্রবাদি নেই। তবুও প্রভু স্বামী লখিন্দর ভাত খেতে চেয়েছে বলে তিনটি নারকেল দিয়ে উনুন বানিয়ে বরণ ঘটের চাল এবং পূর্ণ ঘটের জল দিয়ে ভাত রান্না শেষ করেছে। রান্না শেষ হওয়ার আগে দেখে লখিন্দর ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন স্বামীকে কেমন করে ডাকবে তাই হাতের কঙ্কণ দিয়ে যখন থালাতে ঘা দিয়েছে সেই শব্দে লখিন্দরের ঘুম ভাঙে আর তারপর লখিন্দর ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করে।

‘‘তিন দিকে দিল বেউলা তিন নারিকেল।
চাউল যুখিয়া বেউলা হাঁড়িতে দিল জল।।
*** *** ***
হাঁড়ি হৈতে ভাত বেউলা লামাএ তখানি।।
এই রাত্রে হৈল বিহা নাহি পরিচএ।
গাএ হস্ত দিতে বেউলা প্রাণে বাসে ভএ।।
সাহের কুমারী বেউলা নানা বিদ্যা জানে।
হস্তের কঙ্কণ দিয়া থালেতে ঘা হানে।।
কাসার জে থাল গোটা বাজে ঘন ঘন।
নিদ্রা হৈতে লখিন্দর পাইল চেতন।।
উদরে দারুণ ক্ষুধা শানত নাহি চিত্তে।
গন্ডূষ করিয়া লখাই খাএ আস্তে বেস্তে।
সকল অন্ন খাইলেক হাঁড়িতে নাহি ভাত।
ভৃঙ্গারের জল দিয়া পাকালিল হাত।।’’[৪৮৭]

খাওয়া-দাওয়া শেষে লখিন্দরের জেগেছে রতি-সুখ আস্বাদনের। বেহুলাকে নানাভাবে প্রলোভন দেখিয়ে যৌন ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু বেহুলা জানে বাঙালি সংস্কৃতিতে এই রাতে স্বামীর সঙ্গ-সুখ লাভ থেকে বিরত থাকতে হয়, তাই বেহুলা স্বামী লখিন্দরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে সঙ্গ লিপ্সা থেকে বিরত রেখেছে।

‘‘শোন শোন আগ বেউলা সাহের কুমারী।
আলিঙ্গন দেও মোরে বানিয়া সুন্দরী।।
সাহের কুমারী বেউলা রূপের সীমা নাই।
হস্তে ধরি বসাইল সুন্দর লখাই।।
বেউলা বলে না বুঝি এমত দুরাচার।
বিহার রাত্রি কথা কব কেমত প্রকার।।
বেউলা বলে না শুনিছি এমত দুরাচার।
বিবাহ রাত্রিতে নাহি এমত ব্যবহার।।’’[৪৮৮]

এই রাতের জন্য সকলে অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে। বেহুলা-লখিন্দরও ছিল। দাম্পত্য জীবনের ঊষালগ্ন এই বাসর রাত। এই বাসর রাতের সুখস্মৃতিই সুদীর্ঘ জীবন চলার পাথেয়। এই পাথেয়কে শিরোধার্য করে দাম্পত্য জীবনের পথ চলা। কিন্তু বেহুলার জীবনে এ রাত চরম পরীক্ষার রাত। এই রাতেই বেহুলার স্বামীকে ছলনাময়ী মনসা বধ করবে।

শুধু বেহুলার কাছে নয়, মনসার কাছেও এ রাতের জন্য বহু পথ অতিক্রান্ত করতে হয়েছে। এই রাতের জন্য দেবী মনসাকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। নিজের জীবনকে বাজি রেখে এবং নিজের নীতি-নৈতিকতার সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে এসেছে এই রাত। আর কিছু পথ অগ্রসর হলেই জীবনে নেমে আসবে সার্থকতা। কঠিন কৃতকার্যে ব্রতী মনসা। এই রাতের কৃতকার্যতার উপরেই নির্ভর করছে মনসার প্রতিষ্ঠা লাভের। যদি বিয়ের রাতে লখিন্দরের মৃত্যু না ঘটাতে পারে তাহলে লখিন্দরের জীবনে আর কোন দিনই মৃত্যু ধেয়ে আসবে না। লখিন্দরের শব দেহকে নিয়ে যদি মনসা গাঙুড়ের জলে ভেসে ভেসে দেব সভায় পৌঁছিয়ে দেবতাদের বেহুলা নৃত্য-গীতে মুগ্ধ করে স্বামী সহ ছয় ভাসুরের প্রাণ ফিরিয়ে এনে চাঁদকে দিয়ে মনসাকে পূজা দিতে না পারে, তবে তো মনসার ইহ জীবনের সমস্ত সাধনা বিফলে যাবে। এই পূজা পাওয়ার পরই মনসা দেবলোকে মর্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আর যদি পূজা না পায় তাহলে দেবলোকে-মর্ত্যলোকে মনসাকে কেউ মেনে নেবে না। তখন মনসাকে নিজের জন্য এবং মনসার ছেলে-পিলের জন্য আ-জীবন দাসীবৃত্তি করেই অন্ন জোগাতে হবে। মনসা একে একে নাগদের প্রেরণ করতে লাগলেন, আর সকলে ফিরে আসছে দেখে মনসা রেগে আগুন হয়েছেন। অন্যদিকে বেহুলা তার উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে নাগেদের পরাস্ত করেছে। শুধু উপস্থিত বুদ্ধি নয়, বেহুলার মধুর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে অনেক সাপই লখিন্দরকে দংশন করতে পারেনি। কাউকে ‘খুড়া’, কাউকে ‘জেঠা’, ‘দাদা’ বলে সাপদের বশীভূত করেছে।

‘‘পুষ্প পান দিয়া দেবী পাঠাইল তারে। বঙ্করাজ ফণী গেল প্রথম প্রহরে।।

*** *** ***

ব্যথিত হইয়া বলে মধুর বচনে। কাঞ্চনের বাটি দিল কাঁচা দুগ্ধ সনে।।
বেহুলা কহিল খুঁড়া কোথা আছ তুমি। তোমা সভানা দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি।।
অবিরত মনে কত গুণিব হুতাশ। আমার কালিনী বাপ না করে তপাস।।
মনে কিছু না করিহ সেই অভিমান। কাঞ্চন বাটিতে কর কাঁচা দুগ্ধ পান।।

*** *** ***

দুই পর রাত্রি যবে গগন-মন্ডলে। কালদন্ড ফণীরে পাঠাল্য হেনকালে।।

*** *** ***

ব্যথিত হইয়া বলে মধুর বচনে। কাঞ্চনের বাটি দিল কাঁচা দুগ্ধ সনে।।
বেহুলা কহিল জেঠা কোথা আছ তুমি। তোমা সভা না দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি।।

*** *** ***

দুই নাগ বন্দী হৈল দুই পর রাতি। তবে ত উদয়কাল পাঠাল্য জগতী।।
বিষম লোহার ঘরে গেল উদয়কাল। সাঁতালি পর্ব্বতে দেখে লোহার দেয়াল।।
কপাটের আড়ে থাকি উঁকি দিয়া চায়। বেহুলার নিদ্রা নাঞি দেবী কৃপায়।।
কপাটের আড়ে দেখি ভুকল ভুজঙ্গ। চমকিত বেহুলার বহিল তরঙ্গ।।
ব্যথিত হইয়া বলে মধুর বচনে। কাঞ্চনের বাটি দিল কাঁচা দুগ্ধ সনে।।
বেহুলা কহিল কে দাদা আইলে ত। এতদিনে জানিনু বাপের আছে পো।।
রাত্রিদিন কান্দি আমি না দেখি নায়রে। আমি অভাগিনী বন্দী লোহার বাসরে।।
মনে কিছু না করিহ সেই অভিমান।। কাঞ্চন বাটিতে কর কাঁচা দুগ্ধ পান।।
এতেক শুনিঞা সর্প বড় লজ্জা পায়্যা। কাঁচা দুগ্ধ পান করে হেঁট মুন্ড হয়্যা।।
বেহুলা কেবল মাত্র মনসার দাসী। সর্পের গলায় দিল সুবর্ণ সাঁড়াশি।।''[৪৮৯]

রাত্রি আর এক প্রহর বাকি, লখিন্দরকে দংশন করতে না পারলে লখিন্দর অমর হয়ে যাবে। আর চাঁদের কাছে পরাজিত হলে আ-জীবন মনে হয় চাঁদের বাড়িতেই দাসীবৃত্তি করে মনসাকে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করতে হবে। একে একে সমস্ত নাগদের প্রেরণ করেও যখন মনসা তাঁর কাজ সফল করতে পারছেন না তখন বহু ঈপ্সিত সাধনার ফলকে হারাবার উপক্রমের মুখে মনসা ব্যাকুল হয়ে আর্তনাদ করেছেন।

''কান্দে নরনাগমাতা ভাবিয়া অন্তর।
জিনিতে না পারিলাম আমী বাদুয়া সদাগর।।
তিন প্রহর রাত্রি জায় আছে এক প্রহর।
রজনি পহাইলে লখাই হইব অমর।।

উনকুটী নাগ আমী আছাড়ে মারিমু।
চান্দোর বিবাদে আমি পাতালে পসিমু।।
বেটা নিরবধি গাইল পাড়ে বেঙ্গখাউক কানি।
কত বা সহিব আমার দেবের পরানি।।
বিপাকে ঠেকীল নেতা কিবা হয়ে জানি।
চান্দোর দাসি কর্ম্ম করি রহিয়া খাইব পানি।।''[৪৯০]

অবশেষে একমাত্র ভরসা কালনাগিনি। এই কাল নাগিনিকে সুদূর কালীদহ থেকে নিয়ে এসে মনসা তাঁর কার্যোদ্ধারে পাঠিয়েছেন। প্রথমে কালনিগিনিও নিষ্পাপ লখিন্দরকে দংশন করতে চাননি। কিন্তু সর্বস্ব-হারা মনসার ব্যাকুলতায় এবং কালনাগিনিকে বহু সম্পদের অধিকারিণী করে দেবার লোভ সংবরণ করতে না পেরে লখিন্দরকে দংশন করেছে। এভাবেই মনসার প্রতিষ্ঠা লাভের প্রথম সোপানটি নির্মিত হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে মনসা একজন নারী হয়ে আর একজন নারীর, যে মনসারই আজন্ম ভক্ত-সেবিকা সেই বেহুলার স্বামী লখিন্দরকে দংশন করতে বুকে এতটুকুর জন্যও দরদ এল না। এমনকী ভক্ত-সেবিকার বৈধব্যের জন্য ক্ষণিকের তরেও হৃদয়-যাতনা হল না। বরং বলা ভাল মনসা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রথম সোপান তৈরির আনন্দে বিভোর হয়ে গেলেন। উৎফুল্লা মনসা আনন্দে আত্ম-হারা হয়ে গেলেন।

''নাগিনী করিল ঘাঅ কাঢ়ে বালা কাল রাঅ
রথের পরে নাচেন ব্রহ্মাণী।
পুরিল মনের সাধ সাধিনু বিষমবাদ
সংসারে পাইব পুষ্পপানি।''[৪৯১]

বেহুলার জীবনে এবার শুরু হল আর এক নতুন অধ্যায়। কালনাগিনি বাসর রাতে স্বামী লখিন্দরকে দংশন করেছে। তাই দেখে বেহুলা নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না। কিন্তু মনসা যে লখিন্দরের স্বামীকে মেরেছে তা তার অবগত। বুদ্ধিমতী বেহুলা কাল নিদ্রায় মগ্ন হয়ে যাওয়ার সময় লখিন্দরকে দংশন করেছে কালনাগিনি। হঠাৎ রাত্রি শেষ হবে এমন সময় জেগে দেখে, স্বামী লখিন্দর জীবিত নেই। লখিন্দর মারা গিয়েছে। যে রাত্রিটি ছিল দাম্পত্য জীবনের ঊষালগ্ন, জীবনের পথ-চলার পাথেয়, সেই আনন্দ-ঘন রাতটি বেহুলার কাছে তথা বাঙালি ঘরের কাল-রাত্রি। আজও বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতিতে এই কাল রাতের ভীতি সর্বজন বিদিত। বেহুলা দেখে একটি সাপিনী বাসর ঘরে রয়েছে, সেই সাপটিকে সুবর্ণের জাঁতি দিয়ে মারলে সাপটির লেজ কাটা যায়। সেই লেজটিকে বেহুলা আঁচলে বেঁধে রাখে। শোকের ছায়ায় নিমগ্ন হয়েও বেহুলা তার স্থির উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় যেভাবে দিয়েছে তাতে বেহুলা অতুলনীয়া।

‘‘বেহুলা নাচনী জাগে শেষভাগ রাতি। সাপিনীর পেল্যা মারে সুবর্ণের জাঁতি।।
পুচ্ছ কাটা গেল তার আড়াই অঙ্গুলি। সাপিনী পলায়্যা গেল ব্যথায় আকুলি।।
বান্ধিয়া কালির পুচ্ছ নেতের আঁচলে। ব্যগ্র হয়্যা বেহুলা প্রভুরে করে কোলে।।
শ্বশুর করিল বাদ তোমার লাগিয়া। অভাগিনী কি করিব রজনী জাগিয়া।।’’[৪৯২]

সতীত্বের গুণেও আজ স্বামীকে রক্ষা করতে পারল না বেহুলা। এখন বেহুলার আক্ষেপের অন্ত নেই। কীভাবে লোক-সমাজে বেহুলা মুখ দেখাবে তা ভেবে পাচ্ছে না। তাই তো দেখি-

‘‘কালিনী খাইল পতি। প্রাণনাথ কোলে সতী।।
কি হৈল কি হৈল মোরে। কান্ত কেন হেন করে।।
বদন চাঁদের জুতি। কালিয়া হইল অতি।।
বদনে নাহিক বাণী। অভাগিনী কিবা জানি।।
প্রভুর বদন চায়্যা। দগধে দারুণ হিয়া।।
কপালে কি মোর ছিল। বিভারাতি পতি মৈল।।
নরলোকে কব কি। বেহুলা বান্যার ঝি।।
মঙ্গল বিভার নিশি। মুখ পূর্ণমার শশী।।
খাইল এ হেন পতি। কে মোরে বলিব সতী।।
বদনে বদন থুয়্যা। নয়ানে নয়ান দিয়া।।
চরণ যুগলে ধরি। ক্ষেণে ক্ষেণে কান্দে নারী।।
কখন শ্রবণ-মূলে। মোরে সাথে লহ বলে।।
তোমা বিনে জীলে আমি। কলঙ্কে পূরিব ভূমি।।
পতিহীন যেই জীএ। করে করি বিষ পিএ।।
ধরিতে না পারি ছাতি। উঠ উঠ প্রাণপতি।।
তোমা বিনে নহে ভাল। এহকাল পরকাল।।
তোমা বিনে নাঞি জানি। তুমি মোর নীলমণি।।
কুবেশ আকার রামা। মনে নাঞি দেই ক্ষমা।।
করুণা করিয়া কান্দে। কেশপাশ নাহি বান্ধে।।
ক্ষেমানন্দে কহে কবি। রাজীবে রক্ষহ দেবী।।’’[৪৯৩]

লখিন্দরের মৃত্যুর জন্য বেহুলা দায়ী নয় কিন্তু বাঙালি সমাজ তো যে কোন অঘটন, বিপদ-আপদ ঘটলেই নারীকেই দোষারোপ করতে ছাড়েনা। বেহুলার ক্ষেত্রেও একই জিনিস দেখা যায়। একদিকে স্বামী হারিয়ে বেহুলা পাগলিনীর মত উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় রয়েছে, তারপর শ্বশুর-শাশুড়ি থেকে

শুরু করে সকলে এই মৃত্যুর জন্য বেহুলাকেই দায়ী করা করেছে। যদিও শ্বশুর চাঁদ, শাশুড়ি সনকা জানে মনসার সঙ্গে বিবাদের ফলেই সপ্তম পুত্র লখিন্দরের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু প্রথমেই দেখা যায় শাশুড়ি সনকা বেহুলাকে কীভাবে দোষারোপ করে গালি পেরেছে-

‘‘পুত্রশোক দিতে বাছা তুমি আস্যাছিলে। দুর্ল্লভ লখাই মোর না জানি কি কৈলে।।
হাপুতির পুত্র মোর বাছা লখীন্দর। তোমা লাগি গড়াইনু লোহার বাসর।।
কার শাপ হৈল তোরে কেবা দিল গালি। সীঁথার সিন্দুরে তোর না পড়িল কালি।।
পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি। পাএর আলতায় তোর না পড়িল ধূলি।।
খণ্ড কপালিনী তুঞি চিরণিয়া দাঁতী। বিভা দিনে পতি খালি, না পোহাল্য রাতি।।’’[৪৯৪]

এখানে শেষ নয়। বেহুলাকে তার শাশুড়ি লখিন্দরের মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছে।

‘‘উর্চ্চ কপালি বধু চিরণ দাতি।
আমার পুত্র লখাই খাইলা তোমার নিজপতি।।’’[৪৯৫]
‘‘হিতাহিত জ্ঞান নাহি শোকেতে ব্যাকুলী।
কোপ মনে সোনকাএ বেউলারে পাড়ে গালি।।
সোনকাএ বলে বধূ তুই বড় রূপসী।
মোর পুত্র খাইলি বড়ই রাক্ষসী।।
বড় রূপসী তুই গুণের সীমা নাই।
চান্দের বং নাশ করিতে ছিল কোন ঠাই।।
নিশ্চএ জানিলাম তুমি নিশাচর জাতি।
বিহার রাত্রি স্বামী খালি এ বড় অখ্যাতি।।
দূরে জাও রাক্ষসী এথা কি কারণ।
খাইয়াছ মোর বাছা সুন্দর লক্ষণ।।
দূরে যাও বধূ তুই এথা হৈতে চল।
লোকের সঙ্গে ফন্দি তোর কিছু নাহি ফল।।’’[৪৯৬]

আজ বেহুলার সাথে কেউ নেই। একেই বলে সমাজ-বাস্তবতা। সবাই জানে লখিন্দর মারা গিয়েছে চাঁদ আর মনসার বিবাদের ফলে। কিন্তু হায়রে নারী! এদের কপালে তো শুধু অপবাদ আর দোষারোপের বহ্নি-শিখা জ্বালিয়ে রাখা হয়, কারণ এরা যে নারী। নারী বলে এদের নেই যে কোন স্বীকৃতি। সমাজ বাস্তবতায় এদেরকে কেউ স্বীকার করবে না, করতে পারে না। নারী বলে এরা সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয়। অপাঙ্‌ক্তেয়ের স্থান আমাদের সমাজের কেউ স্বীকার করেনি কেউ করবে না। মধ্যযুগীয় সমাজ তো আরও পারবে না। এরা যে পুরুষের দাসত্বে নিজেকে বলি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। সমাজের বুকে

যারা স্বীকৃতির দাবিদার তাদের কথা কেউ বলে না। তারা শুধু শোষিতা-নির্যাতিতা। এই নারীদের ভোগ করাই শুধুই পুরুষের মহিমা। যত পারো ভোগ করো। ভোগ থেকে পিছুপা হও না। তুমি যে পুরুষ, তোমার অধিকার রয়েছে যত বেশী নারীকে ভোগ করবে, ততই বাড়বে তোমার সমাজের আধিপত্য। হায়রে সমাজ! কী বলতে কী বলি, বললেই হয় তো, কপালে নেমে আসবে মাওবাদী, নতুবা সমাজ দ্রোহিতার তক্মা। কষ্ট লাগে। কষ্টে ক্লান্তিতে দূর অমবস্যার ছায়া হাজির হয়েছে। তাই নারীকে যদি অধিকার দিতে আমাদের কুণ্ঠাবোধ হয়, তবে তো সমাজের পুরুষেরা, যে পুরুষালি মনোভাবে তাদেরকে সরিয়ে রাখা হয়েছে, সেই পুরুষালির অধিকারে তাদের স্বীকৃতি দেওয়াই তো পুরুষেরই কর্তব্য-ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কারণ, হে পুরুষ তোমার পুরুষালি মনোভাবের পরিচয় কে দেখবে? নারী যে আজ তার কর্তব্য পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধা। নারীকে তার নিজের জায়গাটা যদি দিতে পারে পুরুষ, তবে পুরুষ নারীকে দিয়ে নারীর কর্তব্য পালন করতে পারবে। কিন্তু পারবে কী? পুরুষের জেহাদি ঘোষণা নারী কেন মেনে চলবে? তাদের নিজস্বতা বলতে তো অনেক কিছু আছে। পুরুষ কেনই বা ভুলে যাবে? ভুল বলে যদি ভুল হয় তবে নারী যা পারে তা পুরুষের পক্ষে কখনই সম্ভবই না। নারী তার সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে পুরুষকে আগলে রাখতে পারে। আর পুরুষ তার ক্ষণিক আনন্দের জন্য একে একে হাজার হাজার নারীকে ভোগ করে চলছে। ইতিহাসের পাতা খুললে বিবেকের বাণী অনেক দূরে সরে যায়। ইতিহাসে কতটা বিবেক আছে সন্দেহ হয়। বিবেকের বাণী নিভৃতে নীরবে কাঁদে। হায় রে পুরুষ, আর কত, আর কত দূরে নিয়ে যাবে গভীর অরণ্য মাঝে? অরণ্যের অরণ্যানীর সুধা পাবে নাকি কখনও? কষ্ট হয় পুরুষ বলে! ধিক্কার জানাই এই পুরুষালি মনোভাবের কঠিন নিয়ম-ব্রতকে। তবুও নারী-বেহুলা নিজেকে পুরুষের কাছে সমর্পিত করে পুরুষের বিবেক-বাণীকে দংশন করেছে। এ নারী বেহুলা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত না করে, তবুও পুরুষের মাথা হেঁট করিয়ে ছেড়েছে। আজ বেহুলা পুরুষের শত বাঁধা-বিঘ্নকে ক্ষণিকের মধ্যে ধূলিসাৎ করে দিয়ে স্বামী লখিন্দরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল গহীন সাগর-মাঝে। শ্বশুর চাঁদ বেহুলাকে হাজারও অপবাদ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। শুধু পুরুষ নয়, নারী হয়ে শাশুড়ি সনকা একেরপর এক অপবাদ দিয়েছে বেহুলাকে। কিন্তু বেহুলাও ছেড়ে কথা বলেনি। সে শাশুড়ি হোক কিংবা শ্বশুরই হোক মিথ্যাচারকে মাথা পেতে মেনে নেওয়ার মত রমণী বেহুলা নয়। যখন শাশুড়ি লখিন্দরের মৃত্যুর জন্য বেহুলাকে দায়ী করেছে তখন বেহুলা শাশুড়িকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে বলেছে-

“আমাকে রাক্ষসি বাউলান বোল তুমি কিসে।
আর জে ছয় ভাসুর মৈল সেহ কী আমার দোসে।।
কাহার দোসে কাটা গেল লক্ষের বাউগান বাড়ি।
কাহার দোসে মৈল উঝা ধনন্তরি।।

আপনে না জান মর কাল সাসুড়ি।
পদ্যার বাদে হইবা তোমরা কড়ার ভিকারী।।’’[৪৯৭]

বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখা যায়, যখন শাশুড়ি সনকা বেহুলাকে বলেছে লোকের সঙ্গে ফন্দি করে তার লখিন্দরকে মারা হয়েছে তখন বেহুলা যে ভাষায় কথা বলেছে তাতে পূর্বের উক্তির মত শ্বশুর চাঁদকে নিশানা করা হয়েছে।

‘‘সোনকার কথা শুনি বেউলার প্রাণ উড়ে।
বৃথা কেন দোষ তুমি দেওত আমারে।।
বেউলা বলে শাশুড়ি তুমি পরম দেবতা।
আমারে বলহ কেন হেন ছার কথা।।
নাগিনী দংশিল লখাই মোরে কর রোষ।।
আর ছএ পুত্র মরে সেবা কার দোষ।।
পাটনেতে চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিল ধন কড়ি।
সেই কালে মাতা আমি ছিলাম কার বাড়ি।।
ধন গেল কড়ি গেল ডিঙ্গা মধুকর।
সপ্ত দিবা ভাসে শ্বশুর জলের ভিতর।।

*** *** ***

শ্বশুরের এত দুঃখ দিলেন বিধাতা।
সে কালেতে কার দোষ দিলা অগ মাতা।।
কপালের লেখা মাগ খন্ডান না জাএ।
স্বামীর শোকেতে আমার প্রাণ ফাটি জাএ।।’’[৪৯৮]

জগজ্জীবনের কাব্যেও দেখি, অন্যান্য মনসামঙ্গল কাব্যের কবির মতই বেহুলা তার শাশুড়ির মিথ্যা অপবাদকে মাথায় পেতে নেয়নি।

‘‘বালী বোলে শাশুড়ী না দিহ অপযশ। কাটা ঘাএ কত ঘস জামিরের রস।।
মরিল পুত্র তোমার মোর কুলক্ষণে। আর ছয় পুত্র তুমার মরিল কেমনে।।
দেবতা মনুষ্যে হইব নিরন্তর বাদ। কুশলে থাকিতে কেন মনে কর সাধ।।
আমি নাই মারি বালাক মারিল ব্রহ্মাণী। সাপুড়ার মধ্যে দেখ এদুষ্ট নাগিনী।।’’[৪৯৯]

বেহুলা সমস্তকিছুকে মাথা পেতে নিয়ে স্বামীকে পুনর্জীবিত করে তোলার জন্য গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে ভেসে চলল। একেই বলে নারীর ত্যাগের মহিমা। এই ত্যাগের দৌলতে নারী তার আপন ভাগ্যকে জয় করে নিতে পেরেছে। বেহুলাও পারল। বেহুলার ঐকান্তিক প্রয়াসের কাছে ‘দৈবের বিধান’

নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বেহুলা পতিব্রতা নারী, সে স্বামীর প্রাণ যমের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবে। বেহুলার আত্ম-প্রত্যয়ে দেখে দেবতাকুল থেকে মনুষ্যকুল সকলে অবাক হয়ে যায়। যখন বেহুলা বলে-

‘‘জদি বেউলা মম সতি সাহসে জিয়াব পতি
জেন জস ঘোসয়ে সংসারে।
জাইব দেবের পুরি রঞ্জাইব বিসহরি
আমি জাইয়া জিনিব মনসারে।।’’[৫০০]

জগজ্জীবনের কাব্যেও বেহুলার এই সাহসিকতার পরিচয় মেলে। বেহুলা বলেছে-

‘‘শ্বশুরের বিবাদে মরিল গুণমণি। ত্রিভুবনে কহিবেক বালী কুলক্ষণী।।
বালী বোলে আমি তবে বেহুলা সুন্দরী। মরা স্বামী লইয়া যাব শঙ্করের পুরী।।
সভাতে পদ্মার আগে করিব ক্রন্দন। জিয়াইব প্রাণনাথ ভাসুর ছয় জন।।
ফিরিয়া আসিব আমি পুরী চম্পাবতী। ত্রিভুবনে জানিবেক বালী মহাসতী।।’’[৫০১]

আজ বেহুলা জেগে থেকেও যখন স্বামী লখিন্দরকে বাঁচাতে পারল না তখন তার খেদের অন্ত নেই। এই খেদ মানবী বেহুলার এবং নিজের পরাজয়ের খেদ। বেহুলার সতীত্ব পারেনি স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখতে। বেহুলার সতীত্বের দৃঢ় বিশ্বাসে আঘাত হেনেছে মনসা। তাই বেহুলা আরও বেশী দৃঢ়-চেতা হয়ে মরা স্বামীকে জিঁইয়ে আনার জন্য গহীন-সাগরে পাঁড়ি দেবে বলে মনঃস্থির করেছে। কারণ তার মনে পড়ে যায় সরোবরের স্নানের ঘটনা কিংবা শোল মাছটিকে বাঁচিয়ে তোলার ঘটনা। এমন কি লোহার কলাইকে ভাতে পরিণত কিংবা বিবাহের ছাদনা-তলার লখিন্দরের চেতনাকে জাগিয়ে তোলার মত সমস্ত ঘটনা যখন একে একে বেহুলার মনে পড়েছে তখন তার সতীত্বের লেলিহান বহ্নি-শিখার উত্তাপ-অনুভবে স্থির করে, গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে মৃত স্বামীকে সঙ্গে করে যমের কাছ থেকে স্বামীকে বাঁচিয়ে আনবে। এ সব কিছুই সম্ভব হয়েছে বেহুলার সতীত্বের জোরে। তাই বেহুলা শ্বশুর সদাগরকে বলেছে-

‘‘আমার বচন শুন: কেহ না কহিঅ দুন: শুনহ শ্বশুর সদাগর।
নিশ্চয় কহিলুঁ দড়: কলার মান্দাস গড়: জীয়াইব কান্ত লখীন্দর।।
শুনি মনে সভাকার: লাগে বড় চমৎকার: কেহ কেহ হাসিয়া হাসিয়া।
কেবা জানে মহাজ্ঞান: মড়া কোথা পায় প্রাণ: কোথা যাবে জলেতে ভাসিয়া।।
বেহুলা কান্দিয়া কয়: ব্যগ্র হয়্যা অতিশয়: ঝাট গড় কলার মান্দাস।
জীয়াইব মৃত পতি। রাখিব কুলের খ্যাতি: কহি সত্য নহে উপহাস।।’’[৫০২]

বেহুলা শ্বশুর চাঁদকে অনুনয় করে কলার মান্দাস গড়ে দেবার জন্য। কিন্তু চাঁদ সদাগর এই কথা শোনার পর বেহুলা চরিত্রের ওপর দোষারোপ করে বলেছে-

‘‘চান্দে বলে দুষ্ট বধূ না বলিয় আর।
অগ্নিতে পুড়িয়া লখাই করি ছারখার।।
ভাসাইলে হবে যাহা তাহা বোলম মুই।
অবশ্য লখাইর সঙ্গে যাবা বাঁ[া]ক দুই।।
***   ***   ***
কুলে কুলে যাবা তুমি লাগ পাইয়া ঘাটে।
লখিন্দর জলে ফেলি তোমা নিব ঠেটে।।
যার ঘরে যাবা তুমি তার প্রাণেশ্বর।
শিয়াল শকুনে খাবে মোর লখিন্দর।।’’[৫০৩]

শুধু শ্বশুর নয়, শাশুড়ী সনকাও তাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি-

‘‘প্রথম বয়েস তোর আছ বার বৎসর
কেমনে ছাড়িয়া দিব তরে।।
পুত্র সোকে প্রাণ পোড়ে কি বোল বুলিলা মোরে
না জাইয় তুমি মরুয়ার সনে।
অর্ন্ন পতি জদি পাইয়া জাইবা লখাই ছাড়িয়া
খাইব লখাই শ্রীকাল সকুনে।।’’[৫০৪]

শ্বশুর বেহুলাকে বাড়িতে বসে দ্বিচারিণীর জীবন-যাপন করতে বললে, বেহুলাও ছেড়ে কথা বলেনি। চাঁদ জানে বেহুলা রূপবতী মহিলা তাই পুরুষ-শাসিত সমাজের পুরুষের লোলুপতার শিকার বেহুলা হতে পারে। বেহুলার সেই শক্তি নেই, যে শক্তির জোরে বেহুলা নিজেকে রক্ষা করবে। চাঁদ তাই বলেছে বাড়িতে বসেই দ্বিচারিণীর জীবন-যাপন করুক বেহুলা। এহেন কটাক্ষের কথা শোনার পর যেকোন নারীর মত বেহুলাও রেগে গিয়েছে। কিন্তু এই রাগের মধ্যেও বেহুলা শ্বশুরকে সম্মান দিতে ভুলে যায়নি। সহ্য-শালিনী বেহুলা বলল-

‘‘তুই দেখি কহিলে শ্বশুর মুই দেখি শুনিলু।
এমন কথায় তোর বাপের মাথা মুড়াইলু।।’’[৫০৫]

বেহুলার এ হেন দুঃখের দিনে তার পাশে কেউ নেই। বিপদের সময় সব থেকে আপনজন মা-বাবা-ভাই। কিন্তু মা-বাবার কাছে সংবাদ পাঠানোর মত লোক বেহুলার নেই। বেহুলা যে কৃত-সংকল্প

নারী। এই দুসংবাদ সে মা-বাবাকে জানাবেই। তাই বেহুলা শ্বেতকাকের ঠোঁটে, জামাতা লখিন্দরের বরণের আংটি দিয়ে, সে তার চরম বিপদের বার্তা প্রেরণ করেছে।

‘‘শ্বেতকাক ঘন ডাকে বিপরীত বাণী। তাহারে আরতি করে বেহুলা নাচনী।।
বসিয়া চাঁপার ডালে শুন শ্বেতকাক। লোহার বাসরে হৈল আমার বিপাক।।
মনসা সহিত বাদ করে সদাগর। কালসর্পে খাইল মোর কান্ত লখীন্দর।।
তখনি মরিল পতি কালিনীর বিষে। জলেতে ভাসিনু তার জীবন-উদ্দিশে।।
প্রাণনাথ লয়্যা কোলে জলে ভাস্যা যাই। এক নিবেদন কাক করি তোর ঠাঁই।।
জলেতে ভাসিয়া যাই তাহে নাহি তাপ। অতি দূর দেশান্তরে আমার মা-বাপ।।
এমত ব্যথিত হেথা নাহিক আমার। আমার বাপের বাড়ী কহে সমাচার।।
শ্বেতকাক বলে আমি যাইতে পারিব। তথায় মনুষ্য-ভাষা কেমতে কহিব।।
বেহুলা তাহারে বলে জোড় দুই পুটে। মাণিক-অঙ্গুলির কাক লয়্যা যাহ ঠোঁটে।।
সুবর্ণে বান্ধাব ঠোঁট রূপা দিয়া পাখ। আমার বাপের দেশে চল শ্বেতকাক।।
প্রাণনাথ কোলে লয়্যা জলে ভাস্যা যাই। কহিঅ মাএর তরে আর দেখা নাই।।’’[৫০৬]

বেহুলা জানে মেয়ের যাতনা মা অল্পতেই বুঝতে পারবে। মেয়ের দুঃখে দুঃখিনী হয়ে মা যাতে বেশী ক্রন্দন না করে, তা বেহুলা তার শপথবাক্যে উচ্চারণ করেছে-

‘‘কহিয়া মায়ের ঠাই বুলিয় বচন।
আমার সবদ জদি করয়ে ক্রন্দন।।
ছয় মাস থাকুক মায়ে চিত্যে ক্ষেমা দিয়া।
দেবপুর হনে প্রভু আনম জিয়াইয়া।।’’[৫০৭]

বেহুলা অমিত শক্তির অধিকারিণী। নিজের সংকল্প থেকে পিছুপা হতে রাজি নয়। সে এমনও বলেছে লখিন্দরকে বাঁচিয়ে না তোলা পর্যন্ত জলও গ্রহণ করবে না এবং কেউ যদি তাকে অবমাননা করতে আসে তাহলে আত্মহত্যা করে সেই অবমাননাকারীর উপর আত্মহত্যার দায় চাপিয়ে দেবে।

‘‘বেউলা কৈল উর্ত্তর জাবত না জিয়ে লক্ষিন্দর
তাবত না খাইব অর্ন্ন পানি।
জে করিব মোরে বল বধ দিব তার উপর
আমি তখনে তেজিব পরানী।।’’[৫০৮]

সকল কবির কাব্য মধ্যে বেহুলার জীবনে একদিকে কারুণ্যের ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত অপরদিকে দৃঢ়-সংকল্পা তেজোদীপ্তময়ী বেহুলার পরিচয় মেলে। নিজ দায়িত্ব পালনে বেহুলা সদা-সচেতনা। সাগর যাত্রা অংশে বেহুলা পাঠকের অশ্রু-বারিকে আটকাতে পারেনি। কিন্তু বেহুলা একবারের জন্যও কাঁদেনি।

সে তার মনের জোরে জয় পেতে এগিয়ে চলেছে। যাবার আগে সকলের মত শাশুড়ি সনকাকে যেভাবে বলেছে তাতে তাকে দায়িত্ববতী বলতে আমাদের এতটুকু কুণ্ঠা হয় না। নিজের জীবনে স্বামী-সঙ্গ সুখ না ঘটলেও শাশুড়িকে সেবা-যত্ন করতে পারল না বলে তার আক্ষেপের অন্ত নেই।

‘‘সাত পাঁচ ভাবি বেউলা যুক্তি করে সার।
শাশুড়ির পায়ে বেউলা করে নমস্কার।।
বেউলা বলে মাও তুমি প্রভুর জননী।
তোমা সেবা না করিলাম মুই অভাগিনী।।
চরণে মেলানি দেও প্রভুর সঙ্গে যাই।
চারি নিদর্শন আমি তোমা স্থানে দেই।।
হের দেখ সাইল ধান সিজান শুখান।
ভাজা কলই দেখ করে ঠন ঠন।।
আর দেখ হরিদ্রা সিজান শুখান।
এই তিন দ্রব্য দেখ থুইলাম বিদ্যমান।।
সিজান ধানেতে যদি মেলয়ে অঙ্কুর।
তবে জানিবা বেউলা গেল দেব পুর।।
সিদ্ধ হরিদ্রায়ে যদি মেলিলেক গেজ।
তবে জানিলা বেউলা সাধিল নিজ কাজ।।
ভাজা কলই যদি মেলিলেক পাত।
তবে জানিবা বেউলা জিয়াইল প্রাণনাথ।।
আকসালে চড়াইছি ভাত হেটে নাহি জ্বাল।
সম্পূর্ণ জ্বাল দিয়া এড়িছি চিরকাল।।
বিনে জ্বালে ফোটে যদি সেই ভাত হাঁড়ি।
তবেসে জানিবা বেলা দেশেতে বাহরি।।
বেউলার বচনে সোনাই পড়িল ভূমিত।
মেলানি মাগিয়া বেউলা চলিল ত্বরিত।।
সকল প্রণাম করি চড়িল মাজুষে।
সতী সতী ধন্য ধন্য সকলে প্রশংসে।।’’[৫০৯]

আমরা এও দেখি, বেহুলা সাগর-মাঝে যাওয়ার আগে সনকা যখন তাকে নিষেধ করেছিল তখন বেহুলা যে কথা গুলি বলেছি, তার মধ্যে ফুটে ওঠে সতী নারীর সতীত্বের কথা।

‘‘বিফুলায়ে বুলে যায় এ কুনু বেভার:
সুখে ঘরে থাকিতে কি ফল বিধবার।
স্বামী যে নারীর গতি স্বামী সে দেবতা:
স্বামী বিনে অন্ন যত সে সকল বৃথা।
স্বামী জপ স্বামী তপ স্বামী সে পালক:
স্বামী বিনে আর আমার নাইক রক্ষক।’’[৫১০]

এবার যাত্রার পালা। বেহুলার ভাসান যাত্রা। বেহুলার ভাসান যাত্রায় বাঙালি সমাজ যেভাবে কেঁদেছে আর কোন কবির কাব্য-পাঠে এমন করে কাঁদেনি। বাঙালির অশ্রু-নির্ঝর কাব্য মনসামঙ্গল। বাঙালির কান্না-বারি বেহুলার ভাসান-যাত্রার পাতায় পাতায় বিদ্যমান। বাঙালি মায়ের আজও আদরের ধন বেহুলা। বেহুলার সতীত্বের জোরেই মরা স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সতীত্বের জেহাদী ঘোষণায় দেবতারাও লুণ্ঠিত হয়েছেন। দেবতাদের নয়নের মণি হয়ে বেহুলা তার মরা স্বামী সহ ছয় ভাসুরের প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে। আজ গাঙুর নদীর জল বাঙালি মায়ের চোখের জলে ভরপুর। এই বাঙালি মায়ের চোখের জলের হিসেব দিতে বেহুলা সাগরে পাঁড়ি দেবার আগে নিজের সতীত্বের চরম পরীক্ষায় নিজেই অবতীর্ণ হল। এই শেষ বারের মত সতীত্বের পরীক্ষা দিতে ভুরাতে বসে বলল-

‘‘যদি সতী হম মি পতিব্রতা নারী:
আপনে উজাইয়া ভুরা যাউক দেবপুরী।।’’[৫১১]
‘‘জদি সতি হই আমি পতিব্রাথা নারি।
আপনে উজায়া ভুরা জাও দেবপুরি।।’’[৫১২]

দেখা গেল, বেহুলার সতীত্বে ভুরা উজানে পাঁড়ি দিল।

‘‘সতি কন্যার বাক্যে ভুরা আপনে উজায়।
দুই কুলের প্রজাগণে রহিয়া রঙ্গ চায়।।’’[৫১৩]
‘‘সতী কন্যা বাক্যে ভুরা উজাইয়া যাএ:’’[৫১৪]

এভাবেই মানবী বেহুলা সাগরে বেড়িয়ে পড়ল। বাঙালির হৃদয়ের ধন বেহুলা অনেক তিরস্কার-অপবাদের ঝড়-তুফানকে ঝেড়ে ফেলে নিজের অদম্য ইচ্ছা শক্তি এবং সতীত্বের জোরে গাঙুরের জলে কলার ভেলায় ভেসে গেছে। বেহুলা কর্তব্য পরায়নী নারী। নিজের কর্তব্য থেকে কখন পিছুপা হয়নি। তাই সাগর-মাঝে ভেসে যাওয়ার সময় বেহুলা তার স্বামীর পিতা অর্থাৎ গুরুজনের গুরুর বিনা অনুমতিতে তো আর যাত্রা করতে পারে না, তাই শ্বশুরের কাছে অনুমতি নিয়েছে এভাবে-

‘‘কান্দিয়া সুন্দরি বেউলা স্থির কৈল মন।
বিদায়ে হইতে গেলা সসুরের চরণ।।

বাপের অধিক তুমি সসুর দেবতা।
তোমার চরণে আমি কি কহিব কথা।।
জদি আজ্ঞা কর বাপ দেবপুরে জাই।
এহি নিবেদন বাপ করোঁ তোমার ঠাঁই।।
তাহা সুনি সদাগর বুলিলা তখনি।
জল মৈর্দ্দে কেমনে জাইবা একাখিনি।।
বেউলা বোলে রান্ধিয়াছি লোহার কালাই।
মড়া প্রভু জিয়াইব ইকোন বড়াই।।
বিধুবা ব্রাহ্মণির বাক্য পরক্ষিবার তরে।
এহি কার্য্যে বাপ আমি জাইব দেবপুরে।।
এক বাক্য আসির্ব্বাদ জে করিবা তুমি।
তোমার মনের দুঃখ খণ্ডাইব আমি।।’’[৫১৫]

এবার রয়েছে তার মত আরও ছয় জন জা। জায়েদের প্রতিও তো বেহুলার কর্তব্য রয়েছে। তাই জায়েদের কাছ থেকেও অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে। এবার বেহুলা জায়েদের প্রতি-

‘‘বিনয় বেবহারে বেউলা বোলান করিল।
ছয় বধূর গলা ধরি কান্দিতে লাগিল।।
একমনে আসির্ব্বাদ জে করিবা তুমি।
তোমাগরে বিধবার দুঃখ খন্ডাইব আমী।।’’[৫১৬]

বেহুলা শুধুমাত্র নিজের স্বামীর প্রান ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী নয়, সে ছয় জায়ের ছয় স্বামী অর্থাৎ বেহুলার ছয় ভাসুরের প্রাণও ফিরিয়ে আনবে বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধা। আবার এও দেখা যায় ছয় জাকে অনুরোধ করেছে যাতে করে শাশুড়ি সনকা কিংবা শ্বশুর চাঁদ সদাগর কোন রূপ কষ্ট না পায়-

‘‘শ্বশুর শাশুড়ীর পায়ে নমস্কার করে।
সভার সাক্ষাতে বাক্য বোলে ধীরে ধীরে।।
অহে শ্বশুর বাপ ফিরিঞা ঘরে যাও।
শাশুড়ী সহিতে ঘর যাহ ছয় জাও।।
আপনার সাধ্য নহে কপালের লেখা।
ভাগ্য থাকে ফিরিঞা হইবে আর দেখা।।
আর ছয় পুত্রশোক সহিলে যেমতে।
ই পুত্রশোক মাঅ সহিঅ তেমতে।।

জন্মিলে মরণ মাত্র আছে একবার।
আগ পাছে মরিবে এড়ান আছে কার।।
ছয় জাও তুমরা ফিরিয়া যাও ঘরে।
মন দেহ শাশুড়ী কান্দিয়া যেন না মরে।।
ঘরে যাত্র তুমরা জ্ঞাতি সর্ব্বজনে।
বিদায় হইনু বাপু তোমার চরণে।।
মন দিঞা বুঝাবে শ্বশুর সদাগরে।
অনাথ না হয় যেন চম্পালি নগরে।।''[৫১৭]

ছয় জায়ের কাছে বিদায় নেবার পর পাড়া-পড়শী সকলের কাছে বিদায় নিতেও ভোলেনি বেহুলা। বিদায় নেবার আগ মূহুর্তে বেহুলার ভাইয়েরা এসে এই যাত্রায় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্নেহের বাঁধনে। কিন্তু বুদ্ধিমতী বেহুলা কিশোরী হলেও তার সমাজ বাস্তবতার জ্ঞান প্রচুর। অকাল বিধবারা কেমন করে কালাতিপাত করে তা তার নখ-দর্পনে। বিনা অপরাধে সমাজের এই বৈধব্য নিয়ম-রীতি-নীতিকে কোনভাবে মানতে রাজি নয়, ভাইদের সে কথা জানিয়ে দিয়ে বলে-

''বেহুলা কহিল আমি হই কড়্যা রাঁড়ী। কত-না পেলাব আর নিরামিষ্য হাঁড়ি।।
মা-বাপের বাড়ী মোরে আর নাহি সাজে। সকল ভাউজ-সঙ্গে নিত্য দ্বন্দ্ব বাজে।।
নারিব সহিতে আমি দুরাক্ষর বাণী। কূলে দাণ্ডাইয়া দাদা আর কান্দ কেনি।।''

*** *** ***

বেহুলা কহিল দাদা না কান্দিহ আর। চাঁপাতলা পুত্যা রাখ মেলানির ভার।।
প্রভু জীয়াইতে পারি তবে সে আসিব। খাইয়া মেলানি ভার মাএরে দেখিব।।''[৫১৮]

বেহুলা বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু সে যে মনসার সেবিকা। মনসার পাদ-পদ্মে যদি স্থির থাকে মন, তাহলে সে সতীত্বের জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে আ-জীবন বেঁচে থাকতে পারবে। তাই বেহুলা চলল নিরুদ্দেশ্যে। স্বামী-হারা বেহুলা স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনবেই এই ছিল তার পণ। তাই অকুলে সাগরে দিল পাঁড়ি বেহুলা। মনসার আশীর্বাদের লক্ষ্যে বেহুলা বেড়িয়েছে দূর্গম যাত্রা-পথে। অথচ সেই মনসাই বেহুলাকে বারবার বিড়ম্বিত করেছে। বেহুলাকে ভয় দেখাবার জন্য কখনও কাক, শকুনের রূপে লখিন্দরের শব-দেহকে নিয়ে যেতে এসেছে। আবার কখনও শৃগাল, বাঘ সেজে লখিন্দরের দেহকে নিয়ে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু বেহুলার মনোবলের কাছে দেবী মনসাকে বারবার মাথা হেঁট করে ফিরে যেতে হয়েছে। বেহুলার অপরিসীম মনোবলের কাছে মনসা অনেকাংশে অসহায় হয়ে পড়েছে। বেহুলা নিজেই স্থির করেছে যদি স্বামীর একটি হাড়ও অবশিষ্ট থাকে তবুও তাকে বাঁচিয়ে তুলবেই।

‘‘বেউলা বোলে একখানি অস্থি জদি থাকে।
তথাপি জীয়াইব প্রভু দেখিব সর্ব্বলোকে।।’’[৫১৯]

মনসা ছলনাময়ী রূপে বেহুলার সম্মুখে এসেছে। বেহুলার মায়ের রূপ ধরে কন্যার যাত্রা পথকে ব্যাহত করার চেষ্টা চালিয়েছেন। বুদ্ধিমতী বেহুলার বুদ্ধির কাছে মনসাকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। বেহুলা এই ছলনাময়ী মাকে তার ছয় ভাই বৌয়ের নাম জিজ্ঞাসা করলে মনসা আনমনা হয়ে ফিরে গেছে।

‘‘বালী বোলে ভাসিয়া আইল নির্ণয়ে না জানি।
এতদূরে মাও তুমি আইলা একাকিনী।।
বেননী বোলেন যদি হঅ মোর মাঅ।
ছয়বধূর নাম তবে বলিবারে চাঅ।।
কহিথে না পারে পদ্মা নামের যত থি।
মনে মনে হাসে বালী হৈয়া আনন্দিত।।
বালী বোলে কত মায়া ধর পদ্মাবতী।
আমাকে ছলিতে পারে কাহার শকতি।।’’[৫২০]

বেহুলা কঠোর ব্রতের প্রতিজ্ঞা পালনে সুদৃঢ়া হয়ে আছে, কিন্তু মনসা বেহুলার এই কঠিন ব্রতকে ভাঙ্গতে গোয়ালিনী বেশে দুধ-দই খাওয়ানোর চেষ্টা করলে, বেহুলা এবারও মনসার ছলনাকে বুঝে গিয়েছে।

‘‘ভাসিয়া সুন্দরী কন্যা কতদূর যায়।
সেইখানে পদ্মা গোয়ালিনী রূপ হয়।।
ঘাটে রঞা ডাকে গোয়ালের নারী।
দধি দুগ্ধ খাঅ কন্যা নাহি নিব কড়ি।।
দধি দুগ্ধ না খাইবো বোলে বিদ্যাধরী।
বুঝিল তোমার মায়া শুন বিষহরি।।
কথা শুনি পদ্মাবতী মনে লাজ পায়।
ভাসিয়া সুন্দরী কন্যা কতদূর যায়।।’’[৫২১]

এবার মনসা এলেন বাঘ-রূপ ধারণ করে। কিন্তু বেহুলা আত্ম-হননের ভয় দেখালে মনসা তাঁর সংকল্প থেকে বিরত থাকেন। অন্যদিকে বেহুলা মনসার ছলনায় বার বার জয়ী হয়েছে। তারপর দেবী মনসা রাজকন্যার রূপ ধারণ করে অন্যায় জীবন-যাপনের কথা বললে বেহুলা দেবী মনসার মায়া বুঝতে পারে। কিন্তু একজন দেবী কী করে ভক্ত-সেবিকাকে অন্যায় জীবন-যাপনের কথা বলতে পারে! মনসা কী দেবী না কি অন্য গ্রহের কেউ? তবে বেহুলা তো জানে তাঁর আরাধ্যা মনসা শত বাঁধা-

বিঘ্নকে অনায়াসে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। তবুও মনসা ভক্ত বেহুলার একের পর এক পরীক্ষা নিয়ে চলেছেন। আর সব পরীক্ষায় বেহুলা শত-শতাংশে পাস করেছে।

‘‘ভাসিয়া সুন্দরী কন্যা গেল অন্যঘাটে। রাজকন্যা রূপ পদ্মা ধরিল কপটে।।
শতেক সুন্দরী সঙ্গে স্নান করে জলে। ভাসিয়া সুন্দরীর ভেলা সেই পথে চলে।।
কন্যা বোলে অহে সতী জলে রাখ ভুর। কাহার যুবতী তুমি ঘর কতদূর।।
মৃত্যু সঙ্গে বিদ্যাধরী ভাস কি কারণে। আমার গৃহতে চল যদি আছে মনে।।
(স্বামী চাহ স্বামী দিব যদি আছে চিত। দিব্য ঘর বাড়ি দিব অমূল্য বিচিত্র।।
বালী বোলে স্বামী মোর হৈল একজন। ঢেমন ভাতার দিতে আছে তুমার মন।।
আমার দুঃখের হিংসা নাহি লাগে কাক। আপনার স্বামী লৈয়া তুমি সুখে থাক।।
বালী বোলে কত মায়া পাত বিষহরি। তুমার মহিমা আর বুঝিতে না পারি।।
কথা শুনি পদ্মার লজ্জিত হৈল মন। বিরচিয়া গায় কবি জগত জীবন।।)’’[৫২২]

তৎকালীন সামন্তবাদী সমাজের মানসিক দৈন্যতা মনসামঙ্গলের পাতায় পাতায় বিধৃত হয়েছে। পুরুষ চরিত্রের বিকৃত রূপের পরিচয় মেলে বেহুলার ভাসান যাত্রার মধ্যে। নানা প্রলোভন দেখিয়ে বেহুলার সতীত্ব নাশ করতে এসেছে তৎকালীন পুরুষের দল। বেহুলা তার নিজের বুদ্ধির বলে, নিজের সাহসিকতার জোরে সতীত্বকে বিলিয়ে দেয়নি পুরুষের হাতে। বেহুলা তার ব্যক্তিত্বে অটল। এবার বেহুলা সত্যিকারের বাঁধার সম্মুখীন হয়েছে। দশ পাণির ঘাট অতিক্রান্ত হওয়ার পর দানী মধুসূদনের ঘাট এল। এই দানী মধুসূদন হল লখিন্দরের মামা। মামা আজও ভুলতে পারেনি তার স্ত্রীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছিল লখিন্দর। আজ সুযোগ এসেছে ভেবে লখিন্দরের স্ত্রীর প্রতিও মামা একই ধরনের ব্যবহার করবে বলে স্থির করেছে। একদিকে লখিন্দরের মামা মদুসূদন ঘাট-পারাপারের করগ্রাহী অপরদিকে প্রতিপত্তিশালী। তার উপরে রয়েছে প্রতিশোধের বহ্নি-জ্বালার উত্তাপ। পরিচয় পর্ব সেরে মধুসূদন বলেছে-

‘‘দানী বলে অহে কন্যা ভুরা রাখ জলে।
তুমাকে পাইল আমি বড় পুন্য ফলে।।
মোর নারী গিয়াছিল সরোবরজলে।
পথে লাগ পাঞা বালা হরিয়াছে বলে।
জানিয়া হরিল বালা সহোদর মামী।
সেই দুঃখ তুমাক হরিব আমি।।
জানিয়া করিব আমি মহা-মহাপাপ।
যেমতে খন্ডিবে আমার দারুণ মনস্তাপ।।

নৌকাতে চড়িয়া যায় সুন্দরীর পাশে।
দেখিয়া সুন্দরী কন্যা কম্পিত তরাসে।।’’[৫২৩]

একেই বলে সমাজ-বাস্তবতার আসল পরিচয়। যে লখিন্দর একদিন তার মামীকে জোর-পূর্বক ধর্ষণ করেছিল সেই ভাগ্নে লখিন্দরের রূপসী স্ত্রী বেহুলাকে পেয়ে মামা মধুসূদন আজ ধর্ষণ করতে উদ্যত হল তাই দেখে দেবী মনসা স্থির থাকতে না পেরে এগিয়ে এল ভক্ত-সেবিকা বেহুলাকে রক্ষা করার জন্য। দেবী মনসা এসে মধুসূদনের চোখ কানা করে দিয়েছে। তারপর অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর মনসা বলেন ঘাটের উপরে উঠে গেলে তার চক্ষুদান হবে। সেইমত মধুসূদন ঘাটের উপরে উঠলে তার কানা-চোখ ভাল হয়ে যায়।

পুরুষের বিকৃত কামানলের বহ্নি-শিখায় আজও দেখা যায় আমাদের তথা সারা বিশ্বে হাজার হাজার নারী হচ্ছে ধর্ষিতা। তেমনি মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের বেহুলার সতীত্ব নাশ করতে ধেয়ে এসেছে পুরুষের বিকৃত কামানলের দাবদাহ। সেই দাবদহে নিজেকে বিসর্জন দেয়নি বেহুলা। শত বিপদের মধ্যে পরেও বেহুলা তার ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দেয়নি। মনসার প্রতি অগাধ বিশ্বাসে আর নিজের সাহস-বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্বের মহিমায় নিজেকে রক্ষা করেছে। নারীর বিপদের কারণ তার রূপ-যৌবন। যৌবনের ডালি বেহুলার শরীরে-মনে। এই রূপবতী নারী বেহুলাকে দেখে গোদা প্রায় অচৈতন্য হয়ে যাওয়ার মত। শুধু পুরুষ হওয়ার দৌলতে গোদার ঘরে চার-চারটি স্ত্রী থাকার পরও বেহুলার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে তার ঘরের গৃহিণী করতে চেয়েছে।

‘‘গোদা বলে সীমন্তিনী: শুন গ আমার বাণী: অবজ্ঞা করিলে দেখ্যা গোদ।
আমার চরিত্র যত: তোমারে কহিব কত: অবলা তোমার অল্প বোধ।।
চারি নারী মোর ঘরে: অনেক বিলাস করে: খাসা গুয়া খায় পাকা পান।
সীঁথার সিন্দুর ভরা: সুখে ঘর করে তারা: জঞ্জাল গোদের মাত্র ঘ্রাণ।।
তুমি হৈলে পাঁচ নারী: সুখে লয়্যা ঘর কর: উপদেশে মিলাইয়া আনি।
এই নিবেদন রাখ: আমার মন্দিরে থাক: করাইব ঘরের গৃহিণী।।
মধুর বচন তোর: প্রাণ বিঘটিত মোর: চঞ্চল চরিত্র হৈল বড়।
মান্দাস রাখিয়া জলে: আইসহ মোর বোলে: তোমার চরণে করি গড়।।

***   ***   ***

পরিণামে হব ভাল: আমার মন্দিরে চল: কি কার্য্য বিরোধ-বাক্য হটে।।
বেহুলা ভাসিয়া যায়: গোদা চারিদিগে চায়: ব্যগ্র হয়্যা জলে দিল ঝাঁপ।
দারুণ গোদের ভারে: সান্তারিতে নাহি পারে: বেহুলা তাহারে দিল শাপ।।
বেহুলা শাপিল তাকে: গোদা পরিত্রাই ডাকে: গোদ লয়্যা নড়িতে না পারি।

নাকে মুখে জল খায়: গোদা ডাকে পরিত্রায়: পার কর সতী গ সুন্দরী।।’’[৫২৪]

বেহুলাকে দেখার পর গোদার জেগেছে বিয়ের সাধ। বেহুলা দেখল কোন উপায় নেই, তাই গোদাকে বলল যদি তার ঘরের স্ত্রী পুত্রদের তাড়িয়ে দিতে পারে তাহলে তাকে বিবাহ করবে।

‘‘গোদা বওলে এইখানে রহ বিদ্যাধরী।
যাবত করিয়া আসি তোমার মনোহারী।।
শীঘ্রগতি গেল গোদা আপনার বাড়ি।
লাথি দিঞা ভাঙ্গিল ভাতের যত হাঁড়ি।।
দুই ভার্য্যাকে বোলে তোরা বাহিরাঞা যাঅ।
দুই পুত্র লৈয়া তোরা ভিক্ষা করি খাঅ।।
তরাসে পলায়ে কাণী আর খুঁড়ী।
শয্যা হৈতে পলায় গোদার মাঅ বুড়ি।।’’[৫২৫]

গোদা কামুক পুরুষ। বেহুলা পুরুষের কামানলের বহ্নি-শিখা থেকে নিজেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। বেহুলা আর কি-ই বা করতে পারত। এইখানেই ফুটে উঠেছে পুরুষের আসল পরিচয়। পুরুষ হওয়ার দৌলতে ঘরে দু-দুজন স্ত্রী, (মনসামঙ্গলের কোন কোন কবি দু’জন আবার কোন কোন কবি গোদার চার জন স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন) দুটি পুত্র সন্তান থাকার পরও আবার জেগেছে বিয়ের সাধ। এমনকী বেহুলার রূপে পাগল-হারা হয়ে ঘরে গিয়ে স্ত্রী-পুত্রদের বের করে দিতে গোদার এতটুকু দরদ হল না। আবার ভাতের হাঁড়িকে লাথি মেরে ভেঙ্গে দেওয়ার মধ্যে পুরুষ-গোদার কামানলের বহ্নি-শিখার বহিঃপ্রকাশ বলতে দ্বিধা নেই। পুরুষের তো শত বিয়ে করার অধিকার রয়েছে, শুধু সমাজের উঁচু-তলার বাসিন্দাদের নয়, সমাজের একেবারের নিচু-তলার বাসিন্দাও এরকম করতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই গোদার অভিলাষ। এবার দেবী মনসা এলেন ভক্ত-সেবিকা বেহুলার বিপদের সময়। বেহুলাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য মনসা কুম্ভীরের রূপ ধারণ করেছে। কারণ বেহুলার পিছু ধাবমান হয়েছে গোদা। তাই দেখে মনসা এইরূপ দৈব-শক্তির আশ্রয় নিয়েছেন।

‘‘কন্যার সাক্ষাতে পদ্মা গেল সেইক্ষণে।
কুম্ভিরিণীরূপ পদ্মা ধরে সেইখানে।।
মঞ্জুষ ধরিতে গোদা মনে করে আশ।
মধ্যখানে কুম্ভিরিণী করিল গরাস।।
বাপ বাপ করে গোদা জীবন-তরাসে।
ভুরার উপরে কন্যা মনে মনে হাসে।।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে গোদা ক্ষণে তল যায়।

ঢোকে ঢোকে পানি খাঞা চক্ষু উলুটায়।।
গোদা বোলে অহে মাঅ তুমি বড় সতী।
তুমাকে ধরিতে হইল এতেক দুর্গতি।।’’[৫২৬]

একটু আগে যে গোদা বেহুলাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল এখন সেই গোদা মৃত্যুভয়ে বেহুলাকে মা বলে সম্বোধন করে নিস্তার পাওয়ার জন্য আকুল প্রার্থনা করলে বেহুলা গোদাকে বাঁচিয়ে শুধু দেয় না তাঁকে দারিদ্র-মোচন থেকে উদ্ধার করল।

‘‘বালী বোলে মনসা দেবী মিনতি আমার।
দুর্জ্জন গোদাকে তুমি কর প্রতিকার।।
বালীর স্তবনে পদ্মা ছাড়িল গরাস।
উপরে উঠিয়া গোদা ছাড়ে ঘন শ্বাস।।
গোদা বোলে অহে সতি তুমি মোর মাঅ।
অধম দরিদ্রকে বর দিয়া যাঅ।।
কন্যা বোলে অহে গোদা যাহ তুমি ঘর।
অমূল্য রত্নে তোর ভরিবে ভান্ডার।।’’[৫২৭]

এই কঠিন বিপদের মধ্যে পড়েও বেহুলার হৃদয়ে যে, সুকোমল বৃত্তিগুলি ছিল তা ক্ষণিকের জন্যও নিস্প্রভ হয়নি। তাই গোদার মত লোককে, যে তাকে ধর্ষণ করতে তথা বিয়ে করতে এসেছে তাকে বিনা-দ্বিধায় মাপ করে দিয়েছে। আবার দেখা যায়, পথের মধ্যে এক জুয়ারির দুঃখে দুঃখী হয়ে নিজের হাতের কঙ্কণ এবং পঞ্চাশ কাহন কড়ি দিয়েছে আর ‘‘জুয়া পাশ না খেলাও’-র কথা বলেছে।

‘‘ইহারে লইয়া বাপু জাও সিগ্র করি।
এহিক্ষণে দিব সে পঞ্চাস কাহুন কড়ি।।
এহি পঞ্চাস কাহুন কড়ি বাপু খাইয় বসিয়া।
প্রভু জিয়াইয়া জাইতে করাইব পঞ্চ বিহা।।’’[৫২৮]

লখিন্দরের দেহ পচে গিয়েছে। পচা শব দেহ থেকে ক্রমান্বয়ে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। বারে বারে মাছি এসে বসেছে পচা শব দেহে। বেহুলা তাই দেখে দুঃখে অস্থির হয়ে উঠেছে। বেহুলা ভেবেছে-

‘‘গলিয়া পচিয়া গেল সে তনু সুন্দর। আর কি পাইব প্রাণ কান্ত লখীন্দর।।
অবিরত মনে কত গুণিব হুতাশ। কুক্কুরঘাটায় ভাসে কলার মান্দাস।।’’[৫২৯]

গলিত মৃতদেহের ঘ্রাণে কুকুর জলে দিয়েছে ঝাঁপ। স্বামী লখিন্দরের দেহকে রক্ষা করতে পারছে না ভেবে বেহুলা অভিশাপ দেয়-

‘‘ছি ছি বলিয়া রামা গেল বহুদূর। কুম্ভীরে ধরিয়া খাকু দারুণ কুকুর ।।’’[৫৩০]

পথি-মধ্যে একাকিনী সুন্দরী রমণী বেহুলাকে দেখে জগাতি তাকে ‘কুলটা চরিত্র’ বলেছে। জগাতি লোভী কামুক পুরুষ। তার কামের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। তাই ‘‘কেহ বলে ঝাঁপ দিয়া ধর্‌য়া গিয়া আন।।’’[৫৩১] কিন্তু বেহুলার আসল পরিচয় পাওয়ার পর জগাতির দয়া হয়েছে এবং বেহুলাকে ‘পতিব্রতা সতী’ বলতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। অগ্রজ শঙ্খ সদাগর বেহুলাকে না চিনতে পেরে কামুক-দৃষ্টিতে দেখেছে। সুন্দরী রূপবতী বেহুলা রমণীকে দেখেই তার কামানল জাগ্রত হয়ে উঠল-

‘‘সাধু বোলে অহে কন্যা কথা শুন মোর।
প্রাণ ব্যাকুল হৈল রূপ দেখি তোর।।
তোমার যৌবন দেখি স্থির নহে মন।
হাতে ধরি বিদ্যাধরী দেহ আলিঙ্গন।।
যত ধন জন মোর সকল অধীন।
সুরতি অমূল্য ধন দিয়া মোকে কিন।।
তোমি বিনে অহে কন্যা কেহো নহে আর।
মদনসাগরে মোর ধরহ কণ্ঢার।। ’’[৫৩২]

বেহুলা বারেবারে কাকুতি মিনতি করলেও শঙ্খ সদাগর আজ ছাড়বার পাত্রী নয়। ধন ও জনবলে শঙ্খাই সদাগর বিপুল প্রতিপত্তিশালী। বহুদিন যাবৎ গৃহসুখে বঞ্চিত। আজ বেহুলার মত রূপবতী-যৌবনবতী নারীকে পেয়ে রতি-সুখ করতে যেকোন পথ অবলম্বন করবে এটাই পুরুষের ধর্ম। বেহুলা তাকে মা-বাবা বলে সম্বোধন করলেও শঙ্খ সদাগর বলেছে তাকে জোর-পূর্বক ধরে নিয়ে এসে ধর্ষণ করবে।

‘‘কন্যা বোলে অহে সাধু তুমি মোর বাপ।
আমাকে হরিতে চাহ না করিহ পাপ।।
সাধু বোলে বিদ্যাধরী কিসের মিনতি।
ধরিঞা হরিব বলে ভুঞ্জিব সুরতি।।
কন্যা বোলে ত্রিভুবনে মোর কেহ নাই।
পড়িল তুমার হাতে যে করে গোসাঞি।।
তুমি মোর মাতা সাধু তুমি মোর পিতা।
তুমার শরণ লৈলাঙ পাপিনী দুখিতা।।

*** *** ***

সাধু বোলে কন্যা মোকে না বলিহ পিতা।
রতি দিয়া রাখ প্রাণ শুন সুললিতা।।’’[৫৩৩]

শঙ্খ সদাগর আগা-গোড়াই পাপাচারে লিপ্ত। পাপীর কাছে হিতাহিত বাক্য বা পুরাণ-প্রসঙ্গ বাহুল্য মাত্র। পাপীকে হিতবাক্যে বশ করতে পারল না বেহুলা। শেষ পর্যন্ত বেহুলাকে শরণাপন্ন হতে হয়েছে দেবী মনসার কাছে। তাই দেবী দেখলেন বেহুলাকে যখন শঙ্খ সদাগর জোর-পূর্বক ধর্ষণ করতে এগিয়ে এসেছে তখন-

''পদ্মা বোলে অগ্নিহে মোর বাক্য ধর।
তুমি যাঞা বেননীর সত্য রক্ষা কর।।
ততক্ষণে চলে অগ্নি পদ্মার আদেশে।
বেড়িঞা রহিল যাঞা ভুরার চৌপাশে।।
মঞ্জুষ ধরিতে সাধু হাত বাঢ়াইল।
দুর্জ্জয় আনলে তার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িল।।''[৫৩৪]

এরপর শঙ্খ সদাগর বেহুলার পরিচয় পেয়ে নিজে ভীষণভাবে লজ্জিত হয়েছে। শঙ্খ সদাগর পাপ-বোধে আছন্ন হয়ে পড়েছে।

''কান্দে শঙ্খ সদাগর পাঞা মনস্তাপ।
না জানিয়া অধমে করিল এত পাপ।।''[৫৩৫]

এরপর দাদা শঙ্খের সঙ্গে পরিচয় শেষ হলে শঙ্খ সদাগর বলেছে সে যে পাপ কাজ করেছে তার থেকে নিস্তার কেমন করে পাওয়া যাবে? একথা শোনার পর বেহুলা যে উপদেশ দিয়েছে তাতে তাকে মানবী বেহুলা না বলে দেবী বেহুলা বলাই ভাল।

''যতেক অকথ্য কথা কহিলাঙ চিত্তে।
সে সকল পাপ রহিল খণ্ডিবে কেমতে।।
বালী বোলে না কান্দ দাদা শুন সদাগর।
প্রায়শ্চিত্ত করিহ দাদা উজানি নগর।।
উচ্চে দিঅ সরোবর নীচে দিঅ আলি।
ব্রাহ্মণকে দিহ ধেনু উত্তম দুধালি।।
অন্ন দেহ দাদা গ্রীষ্মকালে পানি।
বস্ত্রদান করিহ বিবস্ত্র জন আনি।।
ব্রাহ্মণকে আনি দাদা করাবে ভোজন।
তবে সে তুমার পাপ হৈবে বিমোচন।।''[৫৩৬]

এইভাবে বেহুলা পুরুষের প্রলোভনে পা না বাড়িয়ে নিজের সতীত্বে অটল থেকে নিজ কার্য সিদ্ধি করার জন্য এগিয়ে চলেছে। বেহুলার জীবনে আঘাত যত তীব্রভাবে ধাবমান হয়েছে, ততই

বেহুলা আর বেশী সংযত হয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর দিকে এগিয়ে চলেছে। আজ শত বাঁধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে শিয়ালঘাটা পেরিয়ে বেহুলা এসে পৌছাল ত্রিবেণী সঙ্গমে। যেখানে নেতা নিত্য দেবতাদের কাপড় কাচে। এই নেতা কাজের সময় শিশু পুত্রকে মেরে রাখে, আর কাজ শেষ হবার পর আবার ‘‘পুনরপি জীয়ায় জীবন’’[৫৩৭]। এবার বেহুলা বুঝি তার আসল সন্ধানে এসে উপস্থিত হয়েছে। বেহুলা দেবতাদের সভায় কেমন করে উপস্থিত হবে ভেবে কুল-কিনারার হদিশ খুঁজছে, এমতাবস্থায় বেহুলা নিজেই প্রত্যক্ষ ঘটনার উপলব্ধি নিয়ে পেল সমাধান সূত্র। অবশেষে ছয়মাসের সুদীর্ঘ সুকঠোর দিন-যাপনের পর বেহুলা এসেছে নেতার ঘাটে। বেহুলা নেতাকে চিনেছে নিজের বুদ্ধিমত্তায়।

‘‘দামাল পুত্রের পাকে: তাহারে মারিয়া রাখে: পুনরুপি জীয়ায় জীবন।।
সেই পুত্র সঙ্গে করি: রজকিনী সুরপুরী: চলি যায় আপনার সুখে।
বেহুলা দেবীর দাসী: ওকড়ার বনে বসি: এ সভ চরিত্র যত দেখে।।
মারিয়া জীয়ায় যদি: এই সে পরম নিধি: পাএ পড়ি করিব জিজ্ঞাসা।
এই সে আমার তরে: বিশেষ বলিতে পারে: যথা পূর্ণ হব মন-আশা।।
বান্ধিয়া মান্দাসখানি: যথা সেই রজকিনী: বেহুলা ধরিল তার পায়।’’[৫৩৮]

বেহুলা অনিদ্রায়-অনাহারে কালাতিপাত করার পর নিজের ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল-প্রভায় কঠিন বিপদের মাঝে পরেও নিজের কর্তব্যে ছিল অনড়। নেতাকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে দেব-সভায় কাপড় ধুয়ে দেবার অনুমতি গ্রহণ করেছে। আর এই দুঃখের অবসানের জন্য বেহুলা সুযোগ বুঝে দেবী পদ্মার কাপড়ে নিজের দুঃখ-কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছে। হায়রে মানবী বেহুলা! এমন দুঃখের দিনেও কেমন করে মনে রেখেছে আপন দুঃখের কাহিনি। নিজের দুঃখকে সকলের নজরে আনবার জন্য এমন দিন কেমন করে পাওয়া যায়? যা পেল মানবী বেহুলা থেকে দেবী বেহুলা।

‘‘বেহুলা কহিল মাসী তোমা করি গড়। তোমার বদলে আমি কাচিব কাপড়।।
নেত বলে কাচি আমি দেবতা-অম্বর। তুমি সে কাচিলে যদি না হয় সুন্দর।।
***   ***   ***
চরণে পড়িয়া তার করএ ক্রন্দন। বেহুলারে দিল নেত কাচিতে বসন।।
***   ***   ***
ধুবনীর বস্ত্র হৈল কাঁচড়ার ফুল। বেহুলার বস্ত্র হৈল সূর্য্য সমতুল।।
***   ***   ***
***   ***   ***
এতদিন কাচ তুমি দেবতা-অম্বর। আজি কেন দেখি বস্ত্র সহজে সুন্দর।।’’[৫৩৯]

বেহুলা তার নিজ-বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে নেতাকে ‘মাসী’ সম্বোধন করে নেতার কাছের মানুষ হয়েছে। বেহুলার সঙ্গে নেতার অন্তরঙ্গতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এই ‘মাসী’ সম্বোধনের মধ্য দিয়ে। নিজের মিষ্ট ব্যবহারের জন্য অতি সহজে নেতাকে আপন করে নিয়েছে বেহুলা। নেতার কাজকে লঘু করার জন্য বেহুলা নিজে কাপড় কাচতে উদ্যোগী হলে নেতা তুষ্ট হয়েছে। শুধু কাপড় কাচা নয়, কাপড় শুকানোতেও নেতাকে বেহুলা করেছে সহায়তা। বেহুলার কাচা কাপড় দেখে নেতা চমকে উঠেছে। যখন দেবতাদের সভায় সেই কাপড় নিয়ে হাজির হয়েছে নেতা তখন দেবতারা ধোলাই করা কাচা কাপড় দেখে সন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন দেবতারা অতি-উৎসাহের সঙ্গে জানতে চেয়েছে এই কাপড় কে কেচেছে। এসময় নেতা দেখিয়েছে অনেকটা চাতুরীপণা।

‘‘রজকিনী বলে হর নিবেদিব কি। মোর বাড়ী আসিয়াছে মোর বোনি-ঝি।
খানিকত বস্ত্র আজি কাচ্যাছিল তিনি। দেবগণে এত কথা কহে রজকিনী।’’[৫৪০]

এবার দেবতারা বেহুলাকে দেখতে চাইল। সেই সুযোগে নেতার পরামর্শে বেহুলা দেব-সভায় এসে নৃত্য-গীত পরিবেশন করল। বেহুলার নৃত্যে-গীতে সকল দেবতারা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। এই নৃত্য-গীতের বর্ণনায় পাই-

‘‘নাচে কন্যা বেহুলা নাচনী।
মুখে মন্দ মন্দ হাসি: ক্ষেণে রহি উঠি বসি: যেন নাচে ইন্দ্রের নটিনী।।
করে কাংস্য করতাল: বলে ধনী ভাল ভাল: কটিতে কিঙ্কিণী ঘন বাজে।
আসিয়া হরের কাছে: বেহুলা বন্ধানে নাচে: প্রাণপতি জীয়াবার কাজে।।
রহি রহি পাক মেলে: মরাল-গমনে চলে: মুখ যেন পূর্ণমার শশী।
খএর কাষ্ঠের খোল: বেহুলার মিষ্ট বোল: মোহ গেল যত স্বর্গবাসী।।’’[৫৪১]

এরপর দেবতারা তুষ্ট হয়ে সকলে বলেছে ‘‘ভাল নাচে বেহুলা নাচনী।।’’[৫৪২] দেবাদিদেব মহাদেব বেহুলার নৃত্য-গীতে সন্তুষ্ট হয়ে বেহুলার পরিচয় জানতে চেয়েছেন। তারপর একে একে বেহুলা তার নিজের পরিচয় দিয়েছে, কীভাবে তার স্বামী লখিন্দর মারা গিয়েছে এবং কেন মারা গিয়েছে সমস্ত-কিছু বলেছে। বেহুলা আজ সুদীর্ঘ ছয়মাস অনাহারে-অনিদ্রায়, কঠোর-কঠিন বিঘ্ন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে দেবতা সভায় হাজির হয়ে তার প্রাণ-পতির জীবন চেয়েছে।

‘‘মনসা সহিত বাদ করে তার বাপ। বিভা-রাতে প্রাণনাথে খাইল কালসাপ।।
তখনি মরিল প্রভু কালিনীর বিষে। জলেতে ভাসিয়া আসি জীবন-উদ্দিশে।।
যতেক দেবতাগণ করহ কল্যাণ। পুনরুপি মোর পতি পাকু প্রাণদান।।’’[৫৪৩]

বেহুলা শত বাঁধাকে অতিক্রম করে দীর্ঘ ছয়মাস জলে ভেসে আজ দেবপুরীতে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে, একমাত্র সতীত্বের জোরেই। কিন্তু এখানে এসে আবার তাকে দিতে হয়েছে সেই তথাকথিত

পুরুষ সমাজের কর্ণধারদের কাছে সতীত্ব পরীক্ষা। নারীকে তার নারীত্বকে প্রমাণ করতে হয়েছে বারেবারে একটা পরীক্ষার মাধ্যমে, তাহল নারীর সতীত্ব। কিন্তু শুধু পুরুষ নয়, সুযোগ বুঝে নারীও নেয় নারীর সতীত্বের পরীক্ষা। তাইতো দেখি নেতা বেহুলার সতীত্ব পরীক্ষা নিয়েছে। দেবতারা জানতে চেয়েছে বেহুলার বৈতরণী পার হওয়ার ঘটনা। তখন বিনম্র চিত্তে বৈতরণী পার হওয়ার ঘটনা বিবৃত করেছে-

‘‘বিপুলারে চাহে নেতা পরিক্ষা লইবার।
কেসের সাক দিয়া নেতা হয় আগুসার।।
বাউগতি নেতা দেবি হাটীয়া পার হইল।
বিপুলার নিকটে কথা কহিতে লাগিল।।
সাবধানে শুন কাথা বিপুলা সুন্দরি।
এহি দিকে পার হইয়া জাও দেবপুরি।।

*** ***

হাটীয়া পার হও বেউলা হাটীয়া হও পার।
আজিসে জানিব তোমার সতির বিচার।।
বেউলা বোলে চন্দ্র সুর্য্য তোমারা হইয় সাক্ষি।
তিলমাত্র পাপ দেহে আমি নাহি দেখি।।
অগ্নি আৎসাদিল বেউলা কৈল অন্ধকার।
নাস বেস করিয়া বেউলা হাটীয়া হইল পার।।’’[৫৪৪]

বেহুলা বৈতরণী পার হয়ে পৌঁছাল দেবপুরীতে। এখানে পৌঁছানোর পর বেহুলা পড়ল নতুন সঙ্কটে। যে দেবাদিদেব মহাদেব বেহুলার স্বামী লখিন্দরের পুনর্জীবনের বরপ্রার্থী, সেই দেবের দেব মহাদেব বেহুলার সতীত্ব নাশ করতে এগিয়ে এসেছে। মহাদেব বেহুলার নৃত্য-গীতে এবং রূপের মোহে পাগল-হারা হয়ে কামবাণে বিদ্ধ হয়েছে।

‘‘দেখিয়া বালীর রূপ মরমেতে মহাসুখ
বার্ত্তা পুছে ত্রিজগতপতি।
আগমন দেবপুর ঘর তোর কত দূর
কি কার্য্যে আইলা রূপবতী।।’’[৫৪৫]

কামের বহ্নিশিখার দাবদাহ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। নিজেকে মহাদেব কোনমতে স্থির রাখতে পারছেন না।

‘‘শিব বোলে অহে কন্যা কথা শুন মোর।
প্রাণ ব্যাকুল হৈল রূপ দেখি তোর।।
ত্রিভুবনে তোমার সমান রূপ নাই।
সাফল জননী তোর গর্ভে দিল ঠাই।।
শিব বোলে অহে কন্যা শুনহ বচন।
হাতে ধরি অহে কন্যা দেহ আলিঙ্গন।।
দুই স্ত্রী ছাড়িব পার্ব্বতী আর গঙ্গা।
তুমাকে লইয়া আমি হইব অর্দ্ধ অঙ্গা।।
যদি কন্যা দেহ রতি কহে ত্রিপুরারি।
অর্দ্ধ অঙ্গ হৈব তোর ত্রৈলোক্য অধিকারী।।’’[৫৪৬]

বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর কাব্য মধ্যে শিবকে যেভাবে অঙ্কন করেছেন তাতে এ কাব্যে তাঁরই শিষ্য চাঁদ সদাগরের কথা মনে করিয়ে দেয়। চাঁদ যেমন মনসার নটিনী রূপে পাগল-হারা হয়ে তাকে ভোগ করতে চেয়েছিল শিবও তেমনি বেহুলার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে ধর্ষণ করতে এগিয়ে এসেছে।

‘‘আমি হেন মনে লখি হইয়া চকোর পাখী
সুধাপান করি নানা রসে।
কহো লো যুবতী সতী জিয়াবো তোমার পতি
কমুন্ডল জলের পরশে।।
দেখিয়া যৌবন তোর কাম-সাগরেতে মোর
ডুবি মন হইল বিকল।
পশুপতি তোরে বলে নহে প্রাণ কামানলে
কৃপা করি হও অনুকূল।।
কটাক্ষে মদনশর ভেদিলেক অন্তর
অস্থির হইল মোর মন।
মহা ঔষধের বড়ি দেহ মোর অঙ্গে পড়ি
ঝাটো করি রাখো ত্রিলোচন।।
ভুজ অতি অনুপাম আলিঙ্গনে পুরে কাম
করহ-নিন্দিত সুবন্ধন।
বুকে কুচগিরি চাপ সঘন-নিতম্ব দাপ
অবিরত করো রতিদান।।’’[৫৪৭]

বেহুলা পড়েছে কঠিনতম সঙ্কটে। মহাদেবকে বাবা বলে সম্বোধন করলেও বেহুলার সতীত্ব নাশে এগিয়ে এসেছে।

‘‘বালী বোলে প্রভু তুমি ত্রিজগতবাপ।
আমাকে হরিলে প্রভু হবে বড় পাপ।।
শিব বোলে আমি কন্যা সংসারের সার।
কে করিবে আমার পাপপুণ্যের বিচার।।
যমে করে কন্যা পাপপুণ্যের বিচার।
যমের উপর কন্যা মোর অধিকার।।
বালী বোলে কেমতে জিয়াব প্রাণপতি।
পড়িলাম ভাঙ্গড়ার হাতে নষ্ট হৈল সতী।।’’[৫৪৮]

যখন বাবা বলেও নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে পারছে না, তখন বেহুলা তার নিজের বুদ্ধি বলে দেব সভায় সকল দেবতাদের কাছে করুণা ভিক্ষা চেয়েছে।

‘‘বালী বোলে দেবগণ কার মুখ চাঅ।
অভাগিনীর হিত কথা শিবকে বুঝাঅ।।
উচিত কহিতে কিবা মনে আছে ভয়।
উষাকে হরিতে প্রভু যোগ্য নাহি হয়।।’’[৫৪৯]

এরপর দেবতারা বুদ্ধি করে দেবী চণ্ডীকে নিয়ে আসে আর বেহুলা শিবের খাটের তলায় লুকিয়ে থেকে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছে। এ কেমন পুরুষ সমাজ! যিনি দেবের দেব মহাদেব, তিনি যদি এহেন গর্হিত কাজ করতে পারেন, তবে তো আমাদের চারপাশে একেরপর এক ধর্ষণের যে প্রতিচ্ছবি নজরে আসে তাকে পুরুষের অঙ্গুলি-হেলনে নারী মেনে চলতে বাধ্য হয়। যে নারী প্রতিবাদী হয়ে ওঠে সে নারীর তো রক্ষা নেই। পুরুষ তার পৌরুষকে দেখায় শুধু নারীর উপরে। আর নারী তাকে আজকের মত সেই মধ্যযুগেও কোন কথা না বলে মুখ বুঝে মেনে নেয়। কারণ তার তো করার কিছু নেই! যদি সে করে প্রতিবাদ তাহলে তো সেই নারীর কপালে জুটবে অজস্র অপবাদ। যা আমরা খবরের কাগজে কিংবা টিভির পর্দায় অহরহ দেখতে পাই।

বেহুলা পড়েছে আর এক নতুন সঙ্কটে। দেবাদিদেব মহাদেব বলেছেন স্বামী লখিন্দরের জীবন ছাড়া আর যে বর বেহুলা চাইবে তা তিনি দেবেন। বেহুলা যদি ধন-জন-মোক্ষ চায়, তাও মহেশ্বর দেবেন। কিন্তু বেহুলা তার স্বামীর প্রাণ ফিরে পেতেই আগ্রহী। অন্য কোন বর বেহুলা চায় না।

‘‘হাসিয়া কহেন কথা দেব ত্রিপুরারি।
সুখ মোক্ষ সম্পদ সকল দিতে পারি।।

শিবের বচনে বালী করে জোড় হাত।
ভাল আজ্ঞা কর প্রভু ত্রিজগতনাথ।।
বালী বোলে জানিয়া আমি লইল শরণ।
মোর মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি কর নারায়ণ।।
স্বর্গ বর না চাহু স্বর্গেতে মোর বাস।
অবশ্য যাইব আমি ইন্দ্রের সম্পাস।।
ধন বর না চাহু ধনের নাই কার্য্য।
চম্পলা নগর মোর শ্বশুরের রাজ্য।।
জনের কার্য্য নাই না চাহু জনবর।
জিঞা দেহ প্রাণনাথ চাহি এই বর।।’’[৫৫০]

এই কথা শোনার পর মহেশ্বর বেহুলাকে বলেন মনসা যাকে মেরেছে তিনি ছাড়া আর কেউ তার স্বামীকে জীবিত করতে পারবে না। অতএব বেহুলা মনসার শরণাপন্ন হলে তার প্রসাদেই স্বামীর প্রাণ ফিরে পাবে।

‘‘যাহারে মারিয়া রাখে জয় বিষহরি। কাহার শকতি তারে জীয়াইতে পার।।
সেই বিষহরি যদি করেন কল্যাণ। তবে সে তোমার পতি পায় প্রাণদান।।
যাহা সনে বিষহরি করেন বিবাদ। কেবা তারে দিতে পারে অভয় প্রসাদ।।
মনে মনে জপ তুমি মন্ত্র মনসার। মনসা-বিহনে তব নাহি প্রতিকার।।’’

এইকথা শোনার পর মহাদেবের মত সকল দেবতারা নেতাকে মনসাকে নিয়ে আসতে বলে। এবং বেহুলার অভিলাষকে পূর্ণ করার কথা বলে।

‘‘হরের বচনে বলে দেবগণ যত। মনসারে আনিবারে চল তুমি নেত।।
বেহুলার পূর্ণ কর মন-অভিলাষ। জগতে জগতী-পূজা হউক প্রকাশ।।’’[৫৫১]

বেহুলার অনমনীয় মনোভাবের কাছে দেবতারাও পরাভূত হয়েছেন। দেবতাদের আজ্ঞাকে শিরোধার্য করে নেতা সিজুয়া পর্বত থেকে মনসাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। স্বর্গে আসার আগ-পর্যন্ত মনসা বেহুলার সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু স্বর্গে আসার পর মনসা ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যেতে চাইছেন। কারণ আজ তাঁর মনে সংশয়ের বাতাবরণ তৈরী হয়েছে, পাছে যদি চাঁদ সদাগর তাঁর প্রিয় পুত্র লখিন্দরকে পেয়ে মনসার পূজা না করে তাহলে মনসাকে মর্ত্যলোকে আর কেহ পূজা করার আগ্রহ প্রকাশ করবে না। এই ভেবে মনসা শঠতার আশ্রয় নিয়েছেন। যদিও বেহুলা দেব সভায় কালনাগিনির লেজ হাজির করলেও মনসা মিথ্যাবাদীর মত মিথ্যার আশ্রয়ে জয়ী হবার চেষ্টা করেছেন। পারেননি মনসা। তাই মনসা

কালনাগিনির লেজকে অস্বীকার করেন। এমনকী এই লেজকে গুইসাপের বা কাকলাসের লেজ বলে নিজের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করেছেন।

‘‘সিবে বোলে শুন পদ্মা য়ামার উত্তর।
অবিলম্বে জিয়াইয়া দেঔ লখিন্দর।।
তাহা সুনি পদ্মা বোলে দেবের য়াগে।
তুহার প্রভু খাইছে য়ামার কোন নাগে।।
বেউলা বোলে কালনাগে প্রভু খাইল মর।
কাটা লেঞ্জ ফালাইয়া দিল সভার গোচর।।
তাহা দেখি পদ্মাবতি লাগে বুলিবার।
মায়া পাতি চাহে বেউলা য়ামাক ভাড়িবার।।
কাকলাসের লেঞ্জ কি হারৈলের লেঞ্জ।
গুহিলের লেঞ্জ কি সাপের লেঞ্জ।।’’[৫৫২]

এ ধরনের একের পর এক নানা মিথ্যা কথা বলেছেন মনসা। এমনকী বেহুলা এবং চাঁদ সদাগরকে তিনি চেনেন না বলেছেন। বেহুলাকে কটুক্তি করতেও আজ মনসার বিবেক দংশন হল না। মনসা বলতে লাগলেন-

‘‘বাদ পড়ুক বেউলার মুন্ড হউক ক্ষেয়।
কর্ম্ম দোষে মরে স্বামী মোর দোষ দেয়।।
এতেক দেবতা থুইয়া মোরে করে বাদ।
নৃত [্য] গীত করিতে বেউলার হহছে সাধ।।’’[৫৫৩]

‘‘মনসা আইলা মহেশ কহিলা
হেরো দেখো বিদ্যমান।
বিভারাতি মৈল লখাই দংশিল
বেহুলারো প্রাণধন।।
বৈলা পদ্মা কথা লখাইর কথা
আমি কিছু নাহি জানি।
কথো স্তব আরো করসি আমারো
এতেক গঞ্জিলা কেনি।।’’[৫৫৪]

একথা শোনার পর বেহুলা বলতে লাগল-

‘‘দেখ দেখ রে প্রভু সদাসিব পরম সানন্দে দেখ
বোলে বেউলা সভার গোচর।
নাগ থুইয়া খাটের হেটে আমাক ভাড়ে কপটে
এহি নাগে প্রভু খাইল মর।।
কালরাত্রি নিসাভাগে প্রভুকে খাইল নাগে
কাটা লেঞ্জ আছে তার সাক্ষি।
সোবন্তের খোল দিয়া আনিআছি বান্দিয়া
দেবগণে হাসে তাহা দেখি।।’’[৫৫৫]

এই হল মনসার কপটতার পরিচয়। যে নারী বেহুলা তার সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে একদিনের জন্যও স্বামীর সোহাগে সোহাগিনী হতে পারল না শুধুমাত্র শ্বশুর চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার বিবাদে আজ মনসার সেবিকা হয়েও বেহুলাকে অস্বীকার করে চলেছে। এমনকী একের পর এক মিথ্যার জটাজাল সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু বুদ্ধিমতী বেহুলার বুদ্ধির কাছে অর্থাৎ প্রমাণ স্বরূপ হিসেবে কালনাগিনির লেজকে সঙ্গে নিয়ে আসার ফলে-

‘‘লজ্জা পাইয়া বিসহরি রহিলা হেট মাথা করি
কোপ করি বোলে মহেশ্বর।
পদ্মা বড়ই নিদারূণ তুমি নিশ্চয় জানিলাম আমি
জাটে করি জিয়াও লখিন্দর।।’’[৫৫৬]

মনসার কপটতা ধরা পড়ার পর বেহুলাকে মনসা দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন-

‘‘শুন ল বাণ্যার বেটী বেহুলা নাচনী। তোমার শ্বশুর বলে চেঙ্গমুড়ি কানি।।
মোর সনে বাদ কর‍্যা রাখিয়াছে দাড়ি। গোস্যা কর‍্যা বুলে লয়্যা হিন্তালের বাড়ি।।
শাক এড়া ঢেরাপালা অনন্ত দশর। না করে আমার পূজা চাঁদ সদাগর।।
মনসার পূজা মানা প্রতি ঘরে ঘরে। অপমানে গালি পাড়ে প্রাণে যত পারে।।
ছয়পুত্র খাইলু তার ছয় বহু রাঁড়ী। কালীদহে কৈলুঁ তার সাত ডিঙ্গা বুড়ি।।
তবু নাহি মোর পূজা করে সদাগরে। অবশেষে খাইলুঁ তার পুত্র লখীন্দর।।
কেমনে আইলে তুমি দেবতা-সভায়। তোর অপমানে আমি পড়িলুঁ লজ্জায়।।’’[৫৫৭]

পিতা মহাদেবের কাছে মনসা চাঁদের সম্বন্ধে নানা অভিযোগ করে বলেছেন-

‘‘কান্দেন পদ্মা বাপের ধরিঞা চরণ।
সহন না যায় বাপু চান্দোর বচন।।

একে চান্দো মোকে না দেয় ফুলপানি।
আর বোলে মোকে বাপু বাপু বেঙ্গখকি কানী।।
যেবা নর পূজে মোকে নগর-ভিতরে।
মস্তক মুড়ায়া তাকে গ্রামের বাহির করে।।
আর বোলে মোকে বাপু ঢেমনভাতারী।
চান্দোর অপমান বাপু সহিতে না পারি।।’’[৫৫৮]

আজ মনসা কারুর কথায় কর্ণপাত করছেন না। স্বয়ং পিতা মহাদেবের কথায় নয়, আবাল্য মনসার সেবিকা হতভাগিনী বেহুলার কাকুতি মিনতিতেও নয়, শুধুমাত্র দেব-সমাজের মাঝে বেহুলা যদি চাঁদ সদাগরকে দিয়ে মনসাকে পূজা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় তবেই লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছে-

‘‘পদ্মা বোলে মোর দুঃখ কেহ নাহি বুঝে।
না জিয়াব বালাকে যাবত নাহি পূজে।।
সভার সাক্ষাতে বালী করুক অঙ্গীকার।
শ্বশুরের হস্তে পূজা করাবে আমার।।
দেবগণ বোলে বালী অঙ্গীকার কর।
পদ্মার পূজা করে যেন চান্দো সদাগর।।
অঙ্গীকার করি বালী বোলে দেবতারে।
দেয়াইব ফুলজল শ্বশুরের করে।।
পদ্মা বোলে সাক্ষী হঅ তুমার দেবলোক।
চান্দো বিবাদিয়া যেন পূজা করে মোক।।
দেবগণ বোলে পদ্মা না কর অন্যথা।
আমার পুষ্পের সাক্ষী হৈলাম সর্ব্বথা।
দেবতার বচনে পদ্মার আনন্দিত মন।’’[৫৫৯]

এই বলে ক্ষান্ত হয়নি বেহুলা বরং আর বলেছে যদি তার শ্বশুরকে দিয়ে মনসার পূজা না করাতে পারে তবে ক্ষণিকের জন্যও মর্ত্যলোকে থাকবে না। বরঞ্চ বেহুলা সকলকে নিয়ে আবার স্বর্গলোকে ফিরে আসবে। যাক বেহুলার প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হয়েছেন মনসা। কিন্তু লখিন্দরের হাঁটুর একটা হাড় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় বেহুলা স্বামীর অঙ্গহানির আশায় সুতীক্ষ্ম কাটারি দিয়ে নিজেকে হত্যা করায় উদ্যত হলে মনসা বেহুলাকে নিরস্ত্র করেছে এবং এর বিহিতও করেছে-

‘‘এখন দেখিল আমি স্বামী জিয়াবার চিহ্ন।
সুন্দর শরীরে প্রভুর অঙ্গ হৈল হীন।।
স্ত্রীহত্যা দিব আজি তুমার উপরে।
দেবলোকে যেমন পৌরুষ নাহি করে।।
কাটারি ধরিল বালী অতি তিখ্ন ধারে।
গলায়ে কাটারি দিয়া চাহে মরিবারে।।
চিন্তিত হইল পদ্মা ধ্যান করি চায়।
রাঘবে গিলিল অস্থি কি হইবে উপায়।।

*** ***

রাঘব চলিয়া গেল সমুদ্রের জলে।
বালাকে জিয়ায় পদ্মা মহাকুতূহলে।।’’[৫৬০]

বেহুলা শত বাধাকে দূরে রেখে ছয়মাস অনাহারে অনিদ্রায় কালাতিপাত করে দেবসভায় উপস্থিত হয়েছে। দেবতাদের নৃত্য-গীতে সন্তুষ্ট করে দেবতাদের আশীষে এবং মনসার আশীর্বাদে স্বামী লখিন্দরকে জীবিত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু লখিন্দর জীবন ফিরে পাওয়ার পর বেহুলা পড়ল আরও কঠিন সঙ্কটে। লখাই অপরিচিত পুরুষের মাঝে বেহুলাকে নৃত্য করতে দেখে তিরস্কার করেছে। সুকোমল হৃদয়ের অধিকারিণী বেহুলা স্বামী লখাইকে কোনরূপ কোন কটু বাক্য না বলে শুধু দেব সমাজের কাছে তার আর্তি জানিয়েছে। লখিন্দরকে দেবতারাই সব কথা বলেছে এবং নিরস্ত্র করেছে-

‘‘আমার বচন শুন এখানে আইলা কেন
স্বামী করি ভয় নাই তোর।।
এমত ডাকিনী তুমি এবে সে জানিল আমি
পাইল বিষম মনস্তাপ।
আছিলাম চম্পা পুরী এথা কেনে বিদ্যাধরী
কান্দিয়া মরিবে মাঅ বাপ।।
বালী বোলে দেবগণ শুন তোরা সর্ব্ব জন
দুঃখের উপরে মনস্তাপ।
যার সড়া পচা বাসে সগুনি শৃগালে আসে
আসিয়া গর্জ্জয়ে বনের বাঘ।।’’[৫৬১]

বেহুলা শুধুমাত্র নিজের স্বামীকে পেয়েই সন্তুষ্ট হয়নি। বেহুলার ছ’জন জা অকাল বৈধব্যের জ্বালায় দিশে-হারা হয়ে আছে, তাদের প্রাণও ফিরে পেতে চাইল মনসার কাছে। এরপর দেখা যায়

বেহুলা এবং লখিন্দর তারা দুজনে মিলে খোল বাজিয়ে নৃত্য করছে। এই নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে মনসা বেহুলা-লখিন্দরের প্রতি সদয় হয়ে বলেছে, তারা আর কি বর চায়? একথা শুনে একে একে বেহুলার ছয় ভাসুর সহ শ্বশুরের হারানো সমস্ত সম্পদ ফিরে পেতে চাইল। মনসা খুশি হয়ে এবং শর্ত রেখে বেহুলাকে তাঁর ছয় ভাসুর সহ শ্বশুরের সপ্ত ডিঙার সঙ্গে আরও সপ্ত ডিঙা অর্থাৎ চৌদ্দ ডিঙা সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছেন।

‘‘বেহুলা নাচনী বড় আনন্দিত মতি। ছয় ভাশুর চৌদ্দ ডিঙ্গা জীয়াইল পতি।।
নাএর নফর জীল বুদ্ধের কাণ্ডারী। পরিতোষে বরদান দিল বিষহরি।।
দেবতা-সভায় রামা হইল বিদায়। আট জনে গড় করে মনসার পায়।।
চৌদ্দ ডিঙ্গা চৌদ্দ জন বসিল কাণ্ডারী। এক ডিঙ্গা লখীন্দর বেহুলা সুন্দরী।।
ছয় ডিঙ্গা বেহুলার ছয়টি ভাশুর। সাধুপুত্র সাধু যেন ডিঙ্গার ঠাকুর।।’’[৫৬২]

সহানুভূতিশীলা বেহুলা শুধু মাত্র নিজের স্বামী, ছয় ভাসুরের প্রাণ কিংবা শ্বশুরের হারানো সম্পদ উদ্ধার করেই ক্ষান্ত হয়নি। অপরের প্রতি একান্ত সংবেদনশীলা বেহুলা চম্পক নগরীর সমস্ত অধিবাসীকে বাঁচিয়ে তুলেছে মনসার আশীর্বাদে।

‘‘চৌদ্দ ডিঙ্গায় আছে জন সত্তর হাজার।
একে একে জিআইল মারিআ হুঙ্কার।।’’[৫৬৩]

সত্য-পরায়ণী বেহুলা বলেছে যদি তার শ্বশুর মনসাকে পূজা দিতে সম্মত করতে না পারে তবে সে নিজে আত্মাহুতি দেবে। একেই বলে সত্যবাদিনী বেহুলা। বেহুলা তো পারত তার স্বামীকে পুনর্জীবিত করে ফিরে যেতে। কিন্তু আদর্শবতী নারী জানে, শুধু মাত্র নিজের স্বামীকে নিয়ে আনন্দে দিন-যাপন করা যায় না, চাই ভাসুর-শ্বশুর, প্রতিবেশী এবং ধনসম্পদ। সে তাই সমস্ত কিছুকে পেয়েও নিজের সংকল্প থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেনি। আসেনি বলেই বেহুলা মানবী হয়েও যেন দেবীত্বের আঁধারে ভূষিতা।

‘‘তমু ত শ্বশুর মোর বিপরীত বুঝে। এত বর পায়্যা যদি তোমা নাঞি পূজে।।
তবে না করিব রক্ষা আপনার প্রাণ। নিশ্চয় কহিল দেবী ইথে নাহি আন।।’’[৫৬৪]

এতদিনের কঠিন তপস্যার পরে আজ বেহুলা অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। তবুও তার মনের কোনে কোথাও যেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আশঙ্কা কাজ করেছে। সকলের আনন্দ-দাত্রী বেহুলা শ্বশুরের সুমতির জন্য সর্বোপরি মনসার পূজা দিতে যাতে সম্মত হয়, সেই জন্য বেহুলা মনসার পূজা করেছে।

‘‘উজানি প্রত্যক্ষমই নারিকেলডাঙ্গায়। মৃণময় বিষহরি ঠাকুরাণী তায়।।
বুহিএ লইয়া তথা বেহুলা নাচনী। নারিকেলডাঙ্গায় পূজে ভুজগ-জননী।।
গলায় বসন দিয়া মনসার আগে। শ্বশুর সুমতি হকু এই বর মাগে।।’’[৫৬৫]

বেহুলা অসাধ্য সাধন করে ডিঙ্গায় চড়ে একনিষ্ঠ পত্নীর মতো স্বামী লখিন্দরকে কীভাবে বাঁচিয়ে তুলেছে এবং এই পথ দিয়ে যাবার সময় যে যে ঘটনা ঘটেছে তার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছে। টেটনের বাঁকে যখন উপস্থিত হয়েছে তখন টেটন পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলে বেহুলা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। টেটনের কণ্ঠে বেহুলার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি শুনে স্বামী লখিন্দর তীর্যক ভাষায় কথা বললে, বেহুলা হয়েছে আহতা। কিন্তু বেহুলা নীরবে সবিনয়ে প্রকৃত সত্য ও তথ্যকে উদ্ঘাটন করে স্বামীর কৌতূহলকে নিবৃত্ত করেছে।

''দেবের বরে চলে ডিঙ্গা ত্বারিত গমনে।
টেটনার ঘাটে গিয়া মিলে ছয় দিনে।।
বেউলা বলে প্রভু মোর শোন নিবেদন।
যাবার কালে সত্য করি বলিছি বচন।।
বেউলার বচনে লখাইর লড়ে হিয়া।
ধন দিয়া টেটনারে করায়ে পঞ্চ বিয়া।।

*** ***

টেটনা মরিতে ছিল কলসী বান্ধিয়া।
যাবার কালে গেলাম তারে আশ্বাস করিয়া।।
ধন রত্ন দিয়া করাইব পঞ্চ বিয়া।
এখনে টেটনা দুই বাই দেও বিয়া।।
বেউলার বাক্য শুনি লখাই হরষিত হইয়া।
ধন রত্ন দিয়া করাইল পঞ্চ বিয়া।।''[৫৬৬]

এরপর বেহুলাকে একজন সাধারণ মানবী বলে মনে হয়। যখন উজানী নগর দিয়ে চলেছে তখন বেহুলা পিত্রালয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই পিত্রালয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ যে কোন সাধারণ নারীর মতই বেহুলা বলেছে। আর লখিন্দর বলেছে-

''উজানী নগর দিয়া চলিল সত্বর।।
বেউলা বলে প্রাণনাথ কহি তোমার ঠাই।
বাপ মা দেখি আসি যদি আজ্ঞা পাই।।
লখাই বলে যাও প্রিয়া উজানি নগর।
বিলম্ব না করিবা তথা আসিবা সত্বর।।''[৫৬৭]

বেহুলা জানে যদি সদাগর মনসার পূজা না দেয়, তবে স্বামীসহ ছয় ভাসুরকে কুলে অবতরণ করানো যাবে না। কিন্তু এ দিকে শ্বশুর বাড়ির কোন সংবাদ বেহুলা জানেনা। তাই স্বামীর অনুমতি নিয়ে

বেহুলা চম্পক নগরে যেতে চেয়েছে। লখিন্দরের অনুমতি নিয়ে পতি-প্রাণা বেহুলা গিয়েছে চম্পক নগরে। রক্তে-মাংসে গড়া মানবী বেহুলা শোকার্ত আপনজনদের দেখবার জন্য ছদ্মবেশে শ্বশুর গৃহে এসেছে। ডোমিনীবেশে আসার পর বেহুলার যে চরম অভিজ্ঞতা হল তা বড় বেদনা দায়ক। শাশুড়ি বেহুলাকে দ্বিচারিণী বলতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। বেহুলাকে বলেছে সতী।

‘‘ভাসাইলা লখিন্দর ফিরিয়া না আসিলা ঘর
লখাই আমার রহিল কোন খানে।।
বেউলার হাটন খানি বেউলার চরনা
বেউলার লক্ষণ চুল বান্দানা।
বেউলার পাটের শাড়ি আসিলা কোথা এড়ি
কহ তুমি হও কোন জনা।।
ফালাইয়া লখিন্দর বালা কেন ডোমের ঘরে গেলা
তোরে দেখি ডোমের লক্ষণ।
বানিয়া কুলের রাঁড়ি শঙ্খ সিন্দূর নহে পরি’’[৫৬৮]

শুধু শাশুড়ি সনকা নয়, ডিঙায় বা নৌকায় ফিরে এসে স্বামী লখিন্দরও বেহুলার সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। যে নারী বেহুলা ছয় মাস অভুক্ত থেকে নানা কষ্টের মধ্যে দিয়ে মনসার কৃপাবলে এবং নেতার সাহচর্যে দেবপুরীতে গিয়ে সতীত্বের গৌরবে সকলের প্রাণ-ধন-জন ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে, আজ সেই পুরুষ-স্বামী বেহুলার দিকেই অসতীর কালিমা লেপন করতে চেয়েছে বলে আজ তার দুঃখের অন্ত নেই। তবুও বেহুলা স্বামীকে কোনরূপ কোন কিছু না বলে শুধু একান্ত বিনম্রা হয়ে স্বামীকে অমূলক সন্দেহ দূর করতে নিজে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে চেয়েছে। আর জোড় হাতে মিনতি করেছে তার প্রতি কোন রূপ সন্দেহ না করার জন্য। বেহুলা তো পতি-প্রাণা রমণী। মাত্র কিছুক্ষণের জন্য স্বামীর অনুমতি নিয়েই তো শ্বশুর গৃহ সন্দর্শনে গিয়েছিল। কিন্তু এই অল্প সময়ের জন্য বেহুলাকে না দেখতে পেয়ে তৎকালীন সামন্তবাদী সমাজের কর্ণধার পুরুষ তো নারীর সতীত্বে দোষারোপ করবে। এটাই স্বাভাবিক। যে বেহুলা সুদীর্ঘকাল পুরুষ অভিভাবকহীন জীবন ধারণ করেছে, সেই বেহুলা তো অসতী হবেই বলে মনে করেছে তৎকালীন সামন্তবাদী পুরুষেরা। তাই শ্বশুর, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সকলেই বেহুলার সতীত্বের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। যদি সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে তবেই বেহুলা তার শ্বশুর গৃহে প্রবেশাধিকার পাবে এবং আত্মীয় পরিজনদের রান্না করে খাওয়াবার যোগ্য বলে বিবেচিতা হবে।

‘‘তবে চান্দ সদাগর বলিল বচন।
সকলের স্থানে চান্দ করে নিবেদন।।

ভোজন করিব সবে শুনি এই কথা।
বোলচাল নাহি কার হেট করে মাথা।।
ধনঞ্জয় নামে সাধু সবের প্রধান।
জো[ড়] হস্তে কহে কথা চান্দ বিদ্যমান।।
আপনে সকল জান শোন সদাগর।
মড়া লইয়া ছয় মাস ভাসিল সাগর।।
নানা কন্টক পথে আছে সাগরের পানি।
শুদ্ধ ভাবে আছে বেউলা নহে হেন জানি।।
বিনে পরীক্ষায় অন্ন না করিব ভোজন।
পরীক্ষা লইয়া শেষে যেবা লয়ে মন।।
প্রথমে পরীক্ষা দিব গৃত কাঞ্চন।
আর পরীক্ষা জৌত ঘর করিয়া নির্ম্মাণ।।
আর পরীক্ষা রাম দিলেন সীতারে।
এই তিন পরীক্ষায়ে শুদ্ধ হইতে পারে।।''[৫৬৯]

এই কথা শোনার পর বেহুলা নিজেকে আর স্থির রাখতে পারছে না। আজ তার হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। রক্ত-মাংসের মানবী বেহুলা সামন্তবাদী সমাজ-ব্যবস্থা দেখে অবাক। এ কেমন সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে নারীকেই শুধু সতীত্বের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। তবুও বেহুলা তার সতীত্বের জোরে বলেছে-

''এহা শুনি কহে তবে বেউলা সুন্দরী।
সকল জ্ঞাতির স্থানে হস্ত জোড় করি।।
পদ্মার বাদ খন্ডাইতে আসিলাম মর্ত্ত্য ভুবন।
বাদ খন্ডিলে স্বর্গে করিব গমন।।''[৫৭০]

বেহুলার এই মর্মান্তিক ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের দুঃখের বাণী লিখে পাঠিয়েছে তার মাকে।

''জেন মতে পরিচয় দিলা বিপুলা জতি।
জেন মতে পদ্মারে পূজিলা পুনাই সতি।।
জেন মতে পরীক্ষা দিলা সাতবার।
প্রভু লইয়া বর ক্লেসে য়াইল নিজ ঘর।।
মাস পর্থ্য বঞ্চিতে না দিল সসুর।-
য়াবুধিয়া সধাঘর বুদ্ধি তার ছার।

যামি আসতি হেন জ্ঞান হইল তার।।
একেসর ভাসিয়া গেল দেবের জে দ্বারে।
এথ বাকি সসুরে পরিক্ষা দিল মরে।।
সাত পরিক্ষা আমি লইল একে ২।
সেস পরিক্ষায় আমি উটিলাম যন্তরিক্ষে।।’’[৫৭১]

বেহুলা গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর শাশুড়ি অভিভূতা হয়েছে। আজ সনকার আনন্দাশ্রু ঝড়ছে। আনন্দ-অশ্রুর বারি ধারা কেউই আটকে রাখতে পারছে না। এরপর-

‘‘দেখিয়া শুনিঞা মনে বাড়িল উল্লাস। হাথ বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ।।
দেকিয়া সনকা হৈল পরিতোষ মনে। বেহুলার গলা ধরি কান্দে পরিজনে।।
কহ গ সাবিত্রী সতী কুশল বারতা। নিজ পতি জীয়াইয়া থুয়্যা আইলে কোথা।।
দেখিয়া রাখ প্রাণ তোর জন্ম ধন্যা। এ তিন ভুবনে তুমি পতিব্রতা কন্যা।।’’[৫৭২]

বেহুলা এরপর বলেছে যদি শ্বশুর মহাশয় মনসার পূজা দেয় তবে চৌদ্দ ডিঙ্গা সম্পদ আর ছয় ভাসুরকে জীয়াইয়ে আনতে পারবে। সনকা এই কথা শোনার পর বলেছে সদাগরের চরণে পড়ে সাধুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মনসার পূজা করাবে। শ্বশুর চাঁদ এই সংবাদ নাড়ার কাছে শুনে পূজা দিতে প্রস্তুত হয়েছে। কারণ শ্বশুর চাঁদ নিজের প্রাপ্তি স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করেনি। চাঁদ বণিক সমাজের কর্ণধার। বণিক হারানো সম্পদের লোভকে সংবরণ করতে পারেনি। শুধু সম্পদ নয়, সাত-সাতটি পুত্রকে জীবিত দেখে এবং সর্বোপরি বেহুলার সনির্বন্ধ অনুরোধকে পায়ে ঠেলে দিতে পারেনি। তবুও পুরুষের পৌরুষত্বকে দেখানোর জন্য চাঁদ বলে, যদি-

‘‘চাঁদবাণ্যা বলে আমি তবে পূজি তায়। শুকানেতে চৌদ্দ ডিঙ্গা যদি ঘরে যায়।।
তবে সে পূজিব আমি মনসার বারি। তবে সে জানিব পরতেক বিষহরি।।’’[৫৭৩]

এই কথা গুলির মধ্যে দিয়ে বণিক সমাজের সামগ্রিক মানসিকতা অনেকাংশে ফুটে উঠেছে। বণিকের কাছে পুত্র, পুত্র বধূদের চেয়ে আজ সম্পদ বড় হয়ে উঠেছে। চাঁদ বলেছে তার চৌদ্দ ডিঙ্গা সম্পদ যদি ঘরে যায় তবে মনসার পূজা দেবে। মায়া-মমতার চেয়ে বণিক চাঁদের কাছে সম্পদ বড়। কিন্তু এই চাঁদই আবার নিজের অশ্রুকে আটকাতে পারেনি। যখন বেহুলা মনসার সঙ্গে স্বর্গে গমন করতে উদ্যোগী হয়েছে তখন চাঁদের কঠিন-হৃদয়ে কান্না-বারি ঝড়ে পড়েছে।

‘‘চাঁদ সদাগর কান্দে পুত্রবধূ-মোহে। বসন তিতিয়া গেল লোচনের লোহে।।’’[৫৭৪]

চাঁদের কঠিন হৃদয়ের মধ্যে কোমলতার বাণ ডেকে নিয়ে এসেছে বেহুলাই। বেহুলাই সদাগরের মনোজগতের পরিবর্তনের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ধনসম্পদ, আত্ম-তৃপ্তি কিংবা অহমিকা নয়, আজ চাঁদের হৃদয় বিগলিত হয়েছে পুত্র-পুত্রবধূ-আত্মীয় স্বজনের জন্য। সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যের মত

এখানেও বেহুলা ও লখিন্দর তাদের কাজ সমাপন করে স্বর্গে ফিরে গেছে। কিন্তু অন্যান্য মঙ্গল কাব্য থেকে মনসামঙ্গলের কাহিনির বেহুলা অনেক বেশী মানবিক, হৃদয়বান। হৃদয়ের কোমলতায় সকলকে মুগ্ধ করেছে, নিজের আত্মার আত্মীয় করে নিয়েছে সকলকে। বেহুলা

> ‘‘এক অনমনীয় চরিত্রের অধিকারিণী বেহুলা। সে জীবনে কখনও শক্তি এমন কি দৈবের কাছেও নতি স্বীকার করেনি। তার জীবনের সকল বাধা সব বিঘ্নকে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই সে গ্রহণ করেছে। চরম অপমানকর হলেও সতীত্বের পরীক্ষার ব্যাপারে সে একবারের জন্যও বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেনি, কেননা অন্যথায় তার অসতী ঘোষিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে; শ্বশুরকুলের পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু সমাজের এই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বিবেচনা বর্জিত বিধানকে সে কখনই হৃদয় থেকে মেনে নিতে পারেনি।’’[৫৭৫]

বেহুলা সমস্ত পরীক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করলেও একেবারে শেষ পরীক্ষায় নিজেকে আর নিয়োজিত করতে পারেনি। শেষ পরীক্ষায় বেহুলা নারীর নারীত্বের অপমানের চরম প্রতিবাদ করেই চিরতরে বিদায় নিয়েছে।

‘‘পরিক্ষা লএ বিপুলা সুন্দরি।
দুইভাগ করি কেস   নাই জানি পাপ লেস
সাক্ষি হইয় জয় বিসহরি।।
বোলিলেক চন্দ্রধর   সাপ পরিক্ষা কর
পরিক্ষা লএ সাহের নন্দিনি।
পরম কতোক করি   সাপের মুখেত ধরি
কারি লইল মাথার জে মণি।।
বোলে বেউলা সসুর গোচর।
সর্প পরিক্ষা জিনি   কারি লইল মাথার মণি
আর পরিক্ষা দেঅত সর্থর।।
চান্দে বোলে সুন মাও   কেসের সাঙ্গো হাটি জাও
জস হউক ভুবন বরিয়া।।
কেসের সাঙ্গো খোরের ধারহাটিয়া হইবা পার
আর লইবা অযুত কাঞ্চণে।
জদি লইবা পরিক্ষা   তবে রইব সর্ত্য রক্ষা
জস রাইব এতিন ভুবনে।।
মিলিআ জত পন্ডিত   সুধিল কাঞ্চণ যত

পরিক্ষিতে করিলেক তোলা।
অঙ্গোরি পেলিল তাত   তার মৈধ্যে দিল হাত
ছানিয়া জে তুলিল বিপুলা।।
হরসিত বিপুলা সুন্দরি।
অন্তরিক্ষে দেবগণ   দেখিয়া কৌতুক মন
পদ্মা হাসে রতে বর করি।।
চন্দ্রধরে বোলে হাসি   কহিতে সঙ্কা ভাসি
য়ার এক পরিক্ষা লইবার।
বান্দি চারি হাত পায়   সাগরে হাটিয়া জায়
ভাসে বেউলা জলের উপর।।
সুস্ক পাটের গৌণ ছান্দি   চারি হাত পাও বান্দি
লামে বেউলা সায়রের ঘরে।।
বিপুলারে না দেখিআ   লখাই কান্দে উটিয়া
দু চক্ষুর জল পরে ধারে।।
দুইভাগ হইল জল   বিপুলা জে নহে তল
ছোটিলেক সকল বন্দন।
জলের উপর হাটি পুনি   পাএত না ছোয় পানি
তটেত উটিল ততক্ষণ।।
সর্বলোকে হরি বোলে   বিপুলা উটিল জলে
তারে দেখি হাসে লখিন্দর।
বোলে চম্পকের পতি   সুনরে বেহুলা সতি
জদি সর্ব পরীক্ষা লইতে পার।
লোক মুখে কৌতুক   খন্ডুক মনের দুক
দেখিআ প্রসংসা করুক সকলে।
গন্ধর্ব্বাদি সিদ্ধাগণ   বন্দিলেক চরণ
বসিলেক পরম জে ধ্যানে।।
য়াসনেত পাও দিয়া   রইল বেউলা ধ্যানয় হইয়া
রৈল বেউলা সুর্ণ্যে করি ভর।
সুনকার হাতে ধরি   নানান প্রকার করি

বাহু তোলি নাছে চন্দ্রধর।।
তার শেষে চন্দ্রধর আসিলেক জৌএর ঘর
তাতে বেউলা করিল প্রবেশ।
তৈল ঘৃত দিল ঢালি পুরিলেক অগ্নি জালি
নাহি লএ এক গাছি কেস।।
নিষ্ঠুর বর চান্দ বণ্যিক।
এতেক পরিক্ষা দিআ তব না জোরাইল হিয়া
সেসে দিল তোলা পরিক্ষা।।
সেরকামানি করি এক পাসে তোলা তোলি
য়ার পাসে বিপুলা সোন্দরি।
বেউলা বোলে লক্ষিন্দর পূর্ব্ব কথা মনে কর
এই সমএ চল সুরপুরি।।
অন্তরিক্ষে বোলে মনসা।
মাথার উপরে থাকি বোলিলেক পদ্মা ডাকি
জাটে চল অনরূদ্র উসা।।
নামিয়া পরিলা তোলা ভাসিয়া উটিল বেউলা
সত্যি কন্যা সর্ব্বলোকে বোলে।
নারায়ণ দেবে কএ সুকবি বল্লব হএ
লখাই লইআ বিপুলা জে চলে।।
ধন্দ হইল চম্পকের নাথ।
বেউলা লখাই দুইজন হইলেক অদর্শন
সোনাইর মুন্ডে পরে বজ্রাঘাত।’’[৫৭৬]

কোমল-প্রাণা বেহুলার হৃদয়ে দয়া-মায়া-মমতার আধিক্য বেশী। মর্ত্যবাসী বেহুলার দুঃখের অন্ত নেই। তবুও শেষে যখন স্বর্গারোহণের রথ এসে হাজির হয়েছে, তখন মর্ত্য-জীবনের দুঃখময় আত্মার-আত্মীয়দের আকর্ষণে বেহুলার স্বর্গপথ বারবার রুদ্ধ হয়েছে। মা-বাবার স্নেহের দুলালি বেহুলা পিত্রালয়ে তার শেষ সংবাদ না পৌছে সে স্বর্গ-লোকের অসীম আনন্দ-ধারায় স্নাত হতে চাইল না। বেহুলার মনে হয়েছে স্বর্গের আনন্দের চেয়ে, যে মা দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে তাকে জন্ম দিয়েছে তার প্রতি তার কর্তব্য বেশী। সেই নাড়ীর টানে মায়ের দুঃখ অনুভব করেছে বিবেকবাণ হওয়ার ফলেই। বিবেকবতী বেহুলাকে তার মা প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবেসে সারা জীবনে শুধুই

চিন্তার জাল বিছিয়ে দিয়েছে আর দুঃখ সাগরে মাকে ভাসিয়ে দিয়েছে। তাই আজ বেহুলা মাকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে উঠল। কিন্তু বুদ্ধিমতী বেহুলার তৎক্ষনাৎ মনে হয়েছে শেষ যাত্রার আগে মাকে দর্শন দিলে, পেয়ে হারানোর যন্ত্রণায় মায়ের বেদনা দ্বিগুন হবে। তাই ছদ্মবেশে মা-বাবা-দাদা-ভাই পাড়া প্রতিবেশী, খেলার সাথীদের দেখে চিঠিতে সমস্ত কিছু বর্ণনা করে, আর জানিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। বেহুলার চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার বেদনা মা সহ্য করতে পারবে না বলে বেহুলা মাকে ছয় ভাইয়ের শপথ দিয়ে কান্না করতে নিষেধ করেছে। তবু যে মায়ের মন, সে কী আর সইতে পারে? কিন্তু বেহুলা যে সংবেদনশীলা রমণী। সে মর্মে মর্মে অনুধাবন করেছে মায়ের যাতনা। তাই মাকে আত্ম পরিচয় দিয়ে জানিয়েছে বেহুলা যেহেতু শাপভ্রষ্টা তাই তাকে স্বর্গে ফিরে যেতেই হবে। এই বলার মধ্যেও খুঁজে পাই বেহুলার মমত্ব-বোধের পরিচয়। কারণ মা যখন জানবে বেহুলা শাপভ্রষ্টা অপ্সরী তখন হয়ত ক্ষণিকের জন্য হৃদয়-যাতনা লঘু হবে। তাই মাকে চিঠিতে বেহুলা জানিয়েছে-

‘‘তোমার কন্যা নহি য়ামি কান্দ কি কারণ।
য়ামি জেই জনের কণ্যা সুন দিয়া মন।।
কামের পুত্র লক্ষিন্দর বাণের কন্যা উসা।
ইন্দ্রপুর হোতে দুই য়ানিল মনসা।।
সাপমোচন হইল রহিতে না পারি।
সর্গপুরে জাই আমি রহিতে না পারি।।
বাপ মাও য়াদি করি জত গুরুজন।
প্রণাম করিলা বেউলা সোনাইর চরণ।।
বন্ধু বান্ধবের তরে লেখিছে বার ২।
সকলের চরণে মাগিছে পরিহার।।
পুনি পুনি মায়েরে জানাইছে প্রণাম।
বর দয়ার য়ামি বিপুলা মর নাম।
উধরে ধরিয়া জথ পাইলা জন্ত্রনা।
সে সকল ক্লেস মনে রহিল আপনা।।
ইহ জর্ম্মে তোমা সঙ্গে আর দেখা নাই।
অপরাদ খেম মর সর্গপুরে জাই।।
মায়া বারাইবা বোলি না দিলু পরিচএ।
জুগির বেসে দেখা দিআ জন্মিল বিনএ।।
এই সব বিনএ লেখিল বিপুলা।

পত্র পরি নারঅণ কান্দিতে লাগিলা।।
এথ যুনি সাহে রাজা য়চতন্য হইল।
য়ঝর নাআনে সাহে কান্দিতে লাগিল।।
কান্দি দেবি সোমিত্রাএ হইল মুহিত।
অচতন্য মহাদেবি পরিল ভূমিত।।
সাতপুত্রে সায়রাজা কোলে লইল তুলি।
হের য়াইসে বেউলা রাজা চাহ চক্ষু মেলি।।
দুই চক্ষু প্রকাশিত চাহে চারিভিত।
কথাএ বিপুলা মোর প্রাণের বাঞ্চিত।।
কান্দিয়া সুমিত্রা দেবী ফিরে ঘরে ২।
কথাএ মর বিপুলা দেখাইআ দেয় মোরে।।’’[৫৭৭]

মাকে ক্রন্দন থেকে বিরত থাকবার জন্য বেহুলা তার মাথার দিব্যি দিয়েছে-

‘‘পুনি ২ জননিকে করি নিবেদন।
পরিচএ না দিলাম মায়ার কারণ।।
পরিচএ দিয়া মায়া না কৈল পঞ্চ কথা।
জদিবা ক্রন্দন কর খাও মোর মাথা।।’’[৫৭৮]

বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারায় বেহুলা একটি নতুন সংযোজন। জীবন কামনায় মদিরা বেহুলা কর্মতৎপরা দুঃসাহসিকা। নারী স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে মনসামঙ্গলের বেহুলা দৃঢ় অঙ্গীকার বদ্ধা এক নারী, যে নারী নিজের স্বাধিকার অর্জন করতে কখনও পিছুপা হয়নি। মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে নিজের স্বাধিকারকে ছিনিয়ে নিয়েছে নিজের বুদ্ধিমত্তায়, নিজের আত্মমর্যাদা বোধে। নিজের ব্যক্তিত্বের দাবদাহে বেহুলা নিজেকে যেমন প্রজ্জ্বলিত করেছে তেমনি তৎকালীন এবং আধুনিকা নারী সমাজের অগ্রদূত হিসেবে বেহুলা অগ্র গন্যা। নিজের সতীত্বের বলে সমগ্র শ্বশুর কুলের স্বীয় সম্মানকে উদ্ধার করার পর আবার যখন তৎকালীন সামন্তবাদী সমাজের কর্ণধারেরা তার সতীত্ব পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে তখন বেহুলা নিঃশব্দে তাকে মেনে না নিয়ে, পুরুষ-শাসিত সমাজের কর্ণধারদের স্তম্ভিত করে দিয়ে, মর্ত্য-লোকের মায়া ত্যাগ করে সকলের সম্মুখে সকলের অতিকাঙ্খিত স্বর্গালোকে চলে গেছে। আমাদের

> ‘‘চেনা পৃথিবীর মানুষ এমন এক আদর্শে নিষ্ঠ, ব্রতে সফল, তপস্যায় সার্থক, কাম্যফলবতী নারীকে রচনা করেছে- বাংলার নদী নালা খানা খন্দ কাদা মাটির ঘেরা টোপে তৈরি করেছে

> এক অপরূপা নারী- ভাবলে ভালো লাগে। বাংলার মানুষ ও সাহিত্য সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়-প্রসারিত।’’[৫৭৯] অথবা
>
> ‘‘বেহুলা আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যের যুগাতিক্রমি উজ্জ্বল এক রত্ন- তাকে কোন ব্যক্তি কবি সৃষ্টি করেননি, বেহুলা মধ্যযুগের আসর সাহিত্যের স্বাভাবিক নির্মাণ।’’[৫৮০] এর জন্য অন্য এক সমালোচক বললেন- ‘‘বেহুলা লখিন্দরের কাহিনী জীবনকে খোঁজার কাহিনী। বেঁচে থাকার আশ্চর্য তাগিদে এই কাহিনী গতিময়, প্রাণবন্ত।’’[৫৮১]

মনসামঙ্গল কাব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেহুলা হচ্ছে সেই নারী চরিত্র যার তেজোদীপ্ত মাধুর্যের জন্য সেকালের মত আজকের বাঙালিকে সমানভাবে আকৃষ্ট করে। নারীর পাতিব্রত, ব্যক্তি চরিত্রের উজ্জ্বলতায় বেহুলা রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে। তার বেদনায় সেকালের মত আজকের বাঙালি আজও অঝোর-নয়নে কেঁদে চলেছে। বেহুলার বুদ্ধিমত্তার যে পরিচয় মেলে তাতে সকলে মুগ্ধ হয়ে যায়। বেহুলার আনন্দ-উৎসব, হাস্য-পরিহাস সকলকে প্রসন্ন করেছে। এমনকি বেহুলার সতীত্ব এবং তার পাতিব্রতা দেখে সকলে বিমূঢ় হয়ে গেছে। সকলের প্রশংসায় প্রশংসিত হওয়ার ফলে বেহুলা আজও মনসামঙ্গলের চরিত্র গুলির মধ্যে স্বীয় উচ্চাসনটি নিজের দখলে রেখেছে। চম্পক নগরীর হৃত সর্বস্বকে ফিরিয়ে এনেছে বেহুলাই। তবে এই হৃত-সর্বস্বর সবটুকুকে আত্মসাৎ করে নেবার বিন্দুমাত্র মানসিকতা বেহুলার নেই। বিনা বাক্য ব্যয়ে এই কৃতিত্বের রাজভাগটাই তুলে দিয়েছে শাশুড়ি সনকার হাতে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে বেহুলার অপরিমেয় মানসিক ঔদার্য।

বেহুলার বয়সের পরিণতি না থাকলেও তার ছিল মানসিক পরিণতি। এই মানসিক পরিনতির জন্য সমাজ-বাস্তবতাকে চিনে নিতে বেহুলার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি। কাহিনির প্রথম পর্ব থেকেই বেহুলা শতদলের মত বিকশিত। বেহুলা দৈব-বিধানের প্রতি একান্তভাবে ভক্তিমান। অন্যদিকে নিজের চরিত্রের শুচিতা সম্পর্কেও সচেতনা। বেহুলার মনের গহীন-লোকে ছিল না কোন রকম কোন অপরাধ বোধ বা হীনমন্যতা, তাই পরাজয়ের বশ্যতা তাকে গ্রাস করতে পারেনি। বেহুলা প্রতিবাদ মুখর একজন বলিষ্ঠ চরিত্র হিসেবে মনসামঙ্গলের পাতায় ফুটে উঠেছে। একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই-

> ‘‘আবার একথাও স্বীকার করতে হয় যে বেহুলার আপোসহীন অতন্দ্র সংগ্রাম ভোগ লালসার কামনাতাড়িত ছিল না। তবে প্রেরণা উচ্চকোটির জীবনাদর্শের মধ্যেই সংগুপ্ত ছিল। আবার একথাও ঠিক যে, সেই প্রেরণাই শেষ পর্যন্ত বেহুলাকে ভোগাসক্তির প্রতি বীতস্পৃহ করে তুলেছে। বেহুলা যদি সুখভোগের উদ্দেশ্যে সংসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার স্বপ্ন দেখতেন, তাঁর চারিত্রিক মহিমা অবশ্যই ক্ষুণ্ন হোত।’’[৫৮২]

মনসামঙ্গল কাব্য মধ্যযুগের ফসল। একাব্যের বেহুলা চরিত্র আজকের নারীদের থেকেও আধুনিকা। কারণ আধুনিকতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যদি ব্যক্তি স্বাধীনতা হয়, তবে বেহুলার মধ্যে তা

বিন্দুমাত্র কম ছিল না। আবার যদি বলা হয় আধুনিকতার এক চরম বৈশিষ্ট্য হল প্রতিবাদ মুখরতা। তাও বেহুলার মধ্যে সর্বাংশে রয়েছে। সমাজের চাপিয়ে দেওয়া কোন নীতি তাকে পরাস্ত করতে পারেনি। শুধু সমাজ নয়, দেবতাদের দৈব-বিধানকেও বেহুলা মাথা পেতে নেয়নি। এই বেহুলার মধ্যে স্বাধিকার অর্জনের চরম যে স্পৃহা রয়েছে, তা সকলকে মুগ্ধ করে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখা যায়, প্রজারঞ্জক রাম সীতাকে রাজসভায় দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে প্রজাদের সামনে নিজের শুচিতা প্রতিপালন করার আদেশ দেন। সীতা এই অগ্নিপরীক্ষা না দিয়ে তাঁর মাতা মাধবীর কোলে আশ্রয় নেন। আত্মাহুতি দেন। জনক-নন্দিনী বুঝেছিলেন প্রজারঞ্জক রামের পুরুষ প্রজারা আবার যে কোন দিন তাঁকে সন্দেহ করতে পারে আবার তাকে শুচিতা প্রমাণ করতে হতে পারে। সারাজীবন ধরে যে, রামকে নিজের অধিক ভালোবেসে তিনি তার কোন প্রতিকার না করে বরং সীতাকেই আবার শুচিতা হবার জন্য অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে বলেছেন এর থেকে তো নিজেকে আত্মহুতি দেওয়া ভাল। তাই সীতা নিজের জীবন বলিদান দিয়ে জন্মের মত শুচিতা হয়েছেন। পবিত্রতা ও সতীত্বের ধারনা কাহিনির মধ্যে জিইয়ে রেখে সীতার যন্ত্রণা ও অপমানকে প্রায় প্রত্যেক কবিরা বাড়িয়ে তুলেছেন। ‘রঘুবংশে’ কালিদাস নারীত্বের এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

> ‘‘তার প্রতি অত্যাচার হলে সে প্রত্যাঘাত করে না, আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে অবসান ঘটায় নিজের যন্ত্রণার। নিজের সন্তানদের জন্মের বৈধতা নিঃসংশয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সীতার পাতাল প্রবেশ প্রয়োজন ছিল-এমন এক ব্যাখ্যা সাম্প্রতিককালে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, কারণ আগেকার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পবিত্রতা নিয়ে অপবাদ দেবার মতো কুৎসিৎ মুখগুলো তখনও বন্ধ হয়নি। কি করে তিনি নিঃসংশয় হতে পারতেন যে আর একবার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আগে রামও তাঁকে গ্রহণ করতে রাজি নন, তাই ধরণীর বুকে সীতার প্রবেশ রঘুবংশের ধারা যে নিষ্কলঙ্ক তা নিশ্চিত করল। যাই হোক না কেন, সীতার কাজ আত্মবিলোপ ছাড়া কিছুই নয়, আর বারবার অবমাননার শিকার হলে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করার মধ্য দিয়ে এর সমাধান করার চেষ্টা-নারীর এই পরিচয়ই এর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল।’’[৫৮৩]

রামায়ণের প্রতিটি অনুবাদ ভারতীয় আদর্শ রমণীর ছাঁচকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত হয়েছে। নারীর উপরে একের পর এক-

> ‘‘যদি অপমানের মাত্রা খুব বেশি হয়, তবে দুঃখের নিবৃত্তি ঘটতে পারে ‘সম্মানজনক মৃত্যুর’ মাধ্যমে, কিন্তু সম্মানজনক জীবন তার জন্য নয়।’’[৫৮৪]

আর বিদ্যাসাগর বললেন-

> ‘‘বাল্মীকি, অতিমাত্র হতোৎসাহ হইয়া উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, সীতাকে বলিলেন, বৎসে জানকি! তোমার চরিত্র বিষয়ে প্রালোকের মনে যে সংশয় জন্মিয়া আছে, অদ্যাপি তাহা অপনীত হয় নাই। অতএব তুমি, কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া সকলের অন্তঃকরণ হইতে সেই সংশয়ের অপসারণ কর। সীতা বাল্মীকির দক্ষিণপার্শ্বে দন্ডায়মানা থাকিয়া, নিতান্ত আকুল হৃদয়ে, প্রক্ষণেই পরিগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, শ্রবণমাত্র বজ্রাহতার প্রায় গতচেতন হইয়া, বাতাহতা লতার ন্যায়, ভূতলে পতিতা হইলেন। --- বাল্মীকিও, সীতার চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত অশেষ প্রকারে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াস বিফল হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন, সীতা মানবলীলার সংবরণ করিয়াছে।’’[৫৮৫]

‘‘সীতার বচন যে শুনিল সর্ব্বলোকে।
লজ্জায় কাতর সীতা পৃথিবীকে ডাকে।।

***   ****

করিলেক সীতা পৃথিবীতে এই স্তুতি।
সপ্ত পাতালেতে থাকি শুনে বসুমতি।।

***   ***

ঝি বলিয়া পৃথিবী সীতারে ডাকে ঘনে।
কোলে করি সীতারে তুলিল সিংহাসনে।।’’[৫৮৬]

মনসামঙ্গলের কবিগণ বেহুলার মত আদর্শবতী নারীকে সতীত্বের পরীক্ষায় অবতীর্ণ করিয়েছেন। কিন্তু বেহুলা নারীর এই অপমানকে শিরোধার্য না করে সামন্ততান্ত্রিক পুরুষ-সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজের জীবনকে রূপকচ্ছলে অন্তর্হিতা হয়েছে। মাকে লেখা চিঠিতে শ্বশুর সদাগরকে যে ভাষায় বেহুলা তিরস্কার করেছে তাতে বেহুলার আত্ম-সম্মান বোধের পরিচয় মেলে।

‘‘য়াবুধিয়া সধাঘর বুদ্ধি তার ছার।
য়ামি অসতি হেন জ্ঞান হইল তার।।
একেসর ভাসিয়া গেল দেবের জে দ্বারে।
এথ বাকি সসুরে পরিক্ষা দিল মরে।।

***   ***

সাত পরিক্ষা আমি লইল একে ২।
সেস পরিক্ষায় আমি উটিলাম য়ন্তরিক্ষে।।’’[৫৮৭]

বেহুলা সমস্ত পরীক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করলেও একেবারে শেষ পরীক্ষায় নিজেকে আর নিয়োজিত করতে পারেনি। শেষ পরীক্ষায় বেহুলা নারীর নারীত্বের অপমানের চরম প্রতিবাদ করেই চিরতরে বিদায় নিয়েছে। কারণ লখিন্দরের অকাল মৃত্যু সমগ্র সমাজ যেমন মেনে নিয়েছিল, তেমনি মেনে নিয়েছিল মহাদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত লখিন্দরের পিতা চাঁদ সদাগর। কিন্তু মেনে নিতে পারেনি শুধু মাত্র লখিন্দরের পত্নী বেহুলা। বেহুলার একনিষ্ঠ কর্তব্য আর সতীত্বের জোরেই স্বামী সহ ছয় ভাসুরের প্রাণ এবং সদাগরের হারিয়ে যাওয়া সমস্ত সম্পদকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কাব্য শেষে এসে দেখা যায়, এই বেহুলার প্রতিই তৎকালীন সমাজের পুরুষ কর্ণধরেরা জারি করেছে সতীত্ব নির্ণয়ের পরীক্ষা। এই অপমান নারী হয়ে বেহুলা কোন মতে মেনে নিতে পারেনি। তাই বেহুলা সমস্ত পরীক্ষা দেওয়ার পর শেষ পরীক্ষার সময় হয়েছে অন্তর্হিতা। এরই জন্য আধুনিক কবি জীবনান্দ দাশ ব্যাথাহত চিত্তে লিখলেন-

‘‘বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে-
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়-
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থবট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল, - একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।’’[৫৮৮]

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১। মুখোপাধ্যায়, কনক: বাংলা কাব্যে নারীত্বের রূপায়ণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯, পৃ-৩০

২। করিম, আবদুল: বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, বাংলা একাডেমী ঢাকা, মে ১৯৯৪, প্রথম প্রকাশ, পৃ- ১৫

৩। শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ বাংলা সাহিত্যের কথা দ্বিতীয় খন্ড- মধ্যযুগ, মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা ১১০০, তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা- ১৬৫

৪। ঘোষ, প্রভাতকুমার: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাৎসল্য রস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃ: ১২৩

৫। ভট্টাচার্য, আশুতোষ: বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৬, পৃঃ ২৮৭

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার: ‘প্রাক্‌কথন’, বিষ্ণুপদ পাণ্ডা সম্পাদিত উড়িষ্যার সাধক কবি দ্বারিকাদাসের মনসামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯, প্রথম প্রকাশ, ২৩শে জানুয়ারি, ১৯৮০, পৃঃ ৩খ

৭। মাইতি, প্রদ্যোতকুমার: বাংলার লোকধর্ম ও উৎসব পরিচিতি (পূজাচার ও সন্তান কামনা) পূর্বাদি প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ১৯৮৮, পৃঃ ৩০-৩১

৮। সাহা, জীবন: নারী চরিতাভিধান, সংকলন ও সম্পাদন, দীপ প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০১১ পৃ- ৩৯

৯। সেন, ক্ষিতিমোহন: বাংলায় মনসা পূজা, বঙ্গমানস ও অন্যান্য, সম্পাদনা প্রণতি মুখোপাধ্যায়, পুনশ্চ, ৯এ নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- ২৫ বৈশাখ, ১৪১৩, পৃ- ১৫ (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯)

১০। তদেব, পৃ-১৫ (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯)

১১। তদেব, পৃ-২৩ (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯)

১২। তদেব, পৃ-২৬ (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯)

১৩। তদেব, পৃ-২৮ (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯)

১৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার: কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, (ভূমিকা অংশ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২, পৃ: ২

১৫। তদেব, পৃ: ২

১৬। হালদার, গোপাল: বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা, প্রথম খন্ড, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮০, পৃঃ ৬৪

১৭। ঘোষাল, জগজ্জীবন: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা) রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ- ৫৫

১৮। ঘোষ, প্রভাতকুমার: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাৎসল্য রস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃ: ১২৬

১৯। সেন, দীনেশচন্দ্র: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা ১৩, তৃতীয় মুদ্রণ : আগষ্ট ২০০২/বি, পৃষ্ঠা, ৪৬৪

২০। শহীদুল্লাহ্, ডক্টর মুহম্মদ: বাংলা সাহিত্যের কথা দ্বিতীয় খন্ড- মধ্যযুগ, মাওলা ব্রাদার্স।। ঢাকা ১১০০, তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা- ১৪১-১৪২

২১। ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ: বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ-৮

২২। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ-২১

২৩। তদেব, পৃ-২১-২২

২৪। ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ: বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১,, পৃ-৯

২৫। তদেব, পৃ-৯

২৬। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ-২৩

২৭। তদেব, পৃ-২৩

২৮। ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ: বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ-১১

২৯। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ-২৩

৩০। দেব, নারায়ণ ও জানকীনাথ: পদ্মাপুরাণ ও মনসামঙ্গল, প্রকাশক দিলীপ রায়, ঢাকা, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ- ২৭

৩১। দেব, সুকবি নারায়ণ পদ্মাপুরাণ: শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১,পৃ-২৪

৩২। আচার্য, ড. হরেকৃষ্ণ: পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি পণ্ডিত জানকীনাথ বিরচিত পদ্মাপুরাণ, অক্ষর পাবলিকেশনস্, কলকাতা-১২,বইমেলা, ২০০৮, পৃ-১২৭-১২৮

৩৩। দাস, শ্রী ফণীন্দ্রচন্দ্র ও দাস, শ্রী গিরীশচন্দ্র: ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, সম্পাদিত, শ্রীহট্ট, ১৩৪৩, পৃ- ২৮

৩৪। দেব, নারায়ণ ও জানকীনাথ: পদ্মাপুরাণ ও মনসামঙ্গল, প্রকাশক দিলীপ রায়, ঢাকা, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ- ৫৮

৩৫। ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ: বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ-১১

৩৬। পিপিলাই, বিপ্রদাস: মনসামঙ্গল, শ্রী অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, রত্নাবলী ১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কোলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪০৯, পৃ-১৭

৩৭। ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ: বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ-১৫

৩৮। তদেব, পৃ-১৫

৩৯। তদেব, পৃ-২১

৪০। তদেব, পৃ-২১

৪১। তদেব, পৃ-১২৮

৪২। তদেব, পৃ-২২

৪৩। তদেব, পৃ-২৩

৪৪। পিপিলাই, বিপ্রদাস: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৯ পৃ- ১৭

৪৫। তদেব, পৃ-২৫

৪৬। তদেব, পৃ-২৫

৪৭। তদেব, পৃ-২৫

৪৮। দাস, শ্রী ফণীন্দ্রচন্দ্র ও দাস শ্রী গিরীশচন্দ্র: ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, সম্পাদিত, শ্রীহট্ট, ১৩৪৩, পৃ- ২৭

৪৯। ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ: বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ-২৫

৫০। তদেব, পৃ-২৫

৫১। তদেব, পৃ-২৫-২৬

৫২। তদেব, পৃ-২৬

৫৩। তদেব, পৃ-২৬

৫৪। তদেব, পৃ-২৬

৫৫। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কর্তৃক সম্পাদিত, কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪, পৃ ৮৩-৮৪

৫৬। দাস, শ্রী ফণীন্দ্রচন্দ্র ও দাস শ্রী গিরীশচন্দ্র: ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, সম্পাদিত, শ্রীহট্ট, ১৩৪৩, পৃ- ৩১

৫৭। ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ: বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ-২৭

৫৮। তদেব, পৃ-২৭

৫৯। তদেব, পৃ-২৭

৬০। তদেব, পৃ-২৭

৬১। আচার্য, ড. হরেকৃষ্ণ: পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি পণ্ডিত জানকীনাথ বিরচিত পদ্মাপুরাণ, অক্ষর পাবলিকেশনস্, কলকাতা-১২, বইমেলা, ২০০৮, পৃ-১২৮-২৯

৬২। তদেব, পৃ-১২৯

৬৩। তদেব, পৃ-২৭

৬৪। তদেব, পৃ-২৭

৬৫। তদেব, পৃ-২৮

৬৬। তদেব, পৃ-২৮

৬৭। তদেব, পৃ-২৮

৬৮। তদেব, পৃ-২৮-২৯

৬৯। তদেব, পৃ-২৯

৭০। তদেব, পৃ-২৯

৭১। তদেব, পৃ-২৯

৭২। তদেব, পৃ-২৯

৭৩। তদেব, পৃ- ৩১

৭৪। তদেব, পৃ- ৩১

৭৫। তদেব, পৃ- ৩১

৭৬। ভট্টচার্য্য সুরেন্দ্রচন্দ্র ও দাস আশুতোষ: জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সং-১৯৮৪, পৃ- ৮৬-৮৭

৭৭। কামিল্যা, ডঃ মিহির চৌধুরী: বিপ্রদাসের মনসাবিজয় পুনর্বিচার, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ৭০০০০৯,পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ২০০৮, পৃ- ১৬

৭৮। আচার্য, ড. হরেকৃষ্ণ: পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি পণ্ডিত জানকীনাথ বিরচিত পদ্মাপুরাণ, অক্ষর পাবলিকেশনস্, কলকাতা-১২, বইমেলা, ২০০৮, পৃ-২৮৩

৭৯। তদেব, পৃ- ২৮৪

৮০। তদেব, পৃ- ২৮৪

৮১। তদেব, পৃ- ২৮৪

৮২। তদেব, পৃ- ২৮৬

৮৩। দাস, শ্রী ফণীন্দ্রচন্দ্র ও দাস শ্রী গিরীশচন্দ্র: ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, সম্পাদিত, পৃ- ৪৩

৮৪। সেনগুপ্ত, জয়া: মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী, ক্যাম্প, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ বইমেলা ২০০৪, পৃ- ১২২

৮৫। দাস, শ্রী ফণীন্দ্রচন্দ্র ও দাস শ্রী গিরীশচন্দ্র: ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, সম্পাদিত, পৃ- ৪৪-৪৫

৮৬। ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ: বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৪২-৪৩

৮৭। তদেব, পৃ- ৪৩

৮৮। তদেব, পৃ- ৪৩

৮৯। তদেব, পৃ- ৪৩

৯০। তদেব, পৃ- ৪৪

৯১। তদেব, পৃ- ৪৪

৯২। তদেব, পৃ- ৪৪

৯৩। তদেব, পৃ- ৪৪

৯৪। তদেব, পৃ- ৪৫

৯৫। তদেব, পৃ- ৪৫

৯৬। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ- ৮৯

৯৭। তদেব, পৃ- ৯০

৯৮। তদেব, পৃ- ৯১

৯৯। ঘোষাল, জগজ্জীবন: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), রত্নাবলী কলকাতা ৭০০০০৯, কলকাতা বইমেলা মাঘ ১৪১৬ পৃ- ৫৪

১০০। তদেব, পৃ- ৫৪

১০১। তদেব, পৃ- ৫৪

১০২। তদেব, পৃ- ৫৪

১০৩। আচার্য, ড. হরেকৃষ্ণ: পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি পন্ডিত জানকীনাথ বিরচিত পদ্মাপুরাণ, অক্ষর পাবলিকেশনস্, কলকাতা-১২, বইমেলা, ২০০৮, পৃ-২৮৭

১০৪। কামিল্যা, ডঃ মিহির চৌধুরী: বিপ্রদাসের মনসাবিজয় পুনর্বিচার, মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা ৭০০০০৯, পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ২০০৮, পৃ- ৩৪

১০৫। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), রত্নাবলী কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০২, পৃ- ৬৪

১০৬। তদেব, পৃ- ৪৫

১০৭। তদেব, পৃ- ৪৬

১০৮। তদেব, পৃ- ৪৬

১০৯। তদেব, পৃ- ৪৭

১১০। তদেব, পৃ- ৪৭

১১১। তদেব, পৃ- ৪৭

১১২। তদেব, পৃ- ৪৮

১১৩। তদেব, পৃ- ৪৮

১১৪। তদেব, পৃ- ৪৮

১১৫। তদেব, পৃ- ৪৮

১১৬। তদেব, পৃ- ৪৮

১১৭। লাহা, আদিত্যকুমার: মনসামঙ্গল কাব্য জীবনদৃষ্টির বিচিত্র দর্পণে, কল্যাণী পাবলিকেশন, পরিবেশক: একুশ শতক, কলকাতা- ৭০০০৭৩ পৃ- ১২৯

১১৮। ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ: বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৪৯

১১৯। তদেব, পৃ- ৪৯

১২০। তদেব, পৃ- ৫০

১২১। তদেব, পৃ- ৫০

১২২। তদেব, পৃ- ৫০

১২৩। তদেব, পৃ- ৫০

১২৪। তদেব, পৃ- ৫১

১২৫। তদেব, পৃ- ৫০

১২৬। তদেব, পৃ- ৫১

১২৭। তদেব, পৃ- ৫০

১২৮। তদেব, পৃ- ৫১

১২৯। তদেব, পৃ- ৫১

১৩০। তদেব, পৃ- ৫১

১৩১। তদেব, পৃ- ৫২

১৩২। তদেব, পৃ- ৫২

১৩৩। তদেব, পৃ- ৫২

১৩৪। তদেব, পৃ- ৫২

১৩৫। তদেব, পৃ- ৫২

১৩৬। তদেব, পৃ- ৫২

১৩৭। তদেব, পৃ- ৫২

১৩৮। তদেব, পৃ- ৫২

১৩৯। তদেব, পৃ- ৫২

১৪০। তদেব, পৃ- ৫২

১৪১। তদেব, পৃ- ৫২

১৪২। তদেব, পৃ- ৫২

১৪৩। তদেব, পৃ- ৫২

১৪৪। তদেব, পৃ- ৫২

১৪৫। তদেব, পৃ- ৫২

১৪৬। তদেব, পৃ- ৫২

১৪৭। তদেব, পৃ- ৫২

১৪৮। তদেব, পৃ- ৫৩

১৪৯। তদেব, পৃ- ৫৩

১৫০। তদেব, পৃ- ৫৩

১৫১। তদেব, পৃ- ৫৪

১৫২। তদেব, পৃ- ৫৪

১৫৩। তদেব, পৃ- ৫৪

১৫৪। তদেব, পৃ- ৫৪

১৫৫। তদেব, পৃ- ৫৪

১৫৬। তদেব, পৃ- ৫৫

১৫৭। তদেব, পৃ- ৫৭

১৫৮। তদেব, পৃ- ৫৬

১৫৯। ঘোষাল, জগজ্জীবন: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা) রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ- ৫৫

১৬০। তদেব, পৃ- ৫৪

১৬১। তদেব, পৃ- ৫৫

১৬২। তদেব, পৃ- ৫৫

১৬৩। তদেব, পৃ- ৫৫

১৬৪। তদেব, পৃ- ৫৫

১৬৫। তদেব, পৃ- ৫৫

১৬৬। তদেব, পৃ- ৫৬

১৬৭। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ- ৮৯

১৬৮। সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ২৭

১৬৯। কামিল্যা, ডঃ মিহির চৌধুরী: বিপ্রদাসের মনসাবিজয় পুনর্বিচার, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ৭০০০০৯,পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ২০০৮, পৃ- ৪৮

১৭০। তদেব, পৃ- ৪৮-৪৯

১৭১। তদেব, পৃ- ৪৯

১৭২। তদেব, পৃ- ৫০

১৭৩। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া পৃ- ৯৫

১৭৪। ঘোষাল, জগজ্জীবন: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা) রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ- ৫৬

১৭৫। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯, পৃ- ৩৪-৩৫

১৭৬। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ- ১০৯

১৭৭। তদেব, পৃ- ১১০

১৭৮। কামিল্যা, ডঃ মিহির চৌধুরী: বিপ্রদাসের মনসাবিজয় পুনর্বিচার, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ৭০০০০৯,পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ২০০৮, পৃ- ৩৩

১৭৯। তদেব, পৃ- ৩৩

১৮০। তদেব, পৃ- ৩৪

১৮১। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, কলিকাতা,প্রথম সংস্করণ, নাগ পঞ্চমী, ১৩৮৪ পৃ- ৬৬

১৮২। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯, পৃ- ৩৭

১৮৩। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ- ১১০

১৮৪। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব সম্পাদিত, লেখাপড়া, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, নাগ পঞ্চমী, ১৩৮৪ পৃ- ৬৭-৬৮

১৮৫। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ- ১১০

১৮৬। তদেব, পৃ- ১১০

১৮৭। কামিল্যা, ডঃ মিহির চৌধুরী: বিপ্রদাসের মনসাবিজয় পুনর্বিচার, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ৭০০০০৯, পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ২০০৮, পৃ- ৩৪

১৮৮। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ- ১১০

১৮৯। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯, পৃ- ১৩০-১৩১

১৯০। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র: জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল, কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১ পৃ- ১০৪

১৯১। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, শ্রী যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯, পৃ- ১৩৩-১৩৪

১৯২। আচার্য, ড. হরেকৃষ্ণ: পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গলের কবি পণ্ডিত জানকীনাথ বিরচিত পদ্মাপুরাণ, অক্ষর পাবলিকেশনস্, কলকাতা-১২, বইমেলা, ২০০৮, পৃ-১৩০

১৯৩। তদেব, পৃ-১৩০

১৯৪। তদেব, পৃ-১৩০

১৯৫। তদেব, পৃ-১৩০

১৯৬। তদেব, পৃ-১৩০

১৯৭। তদেব, পৃ-১৩০

১৯৮। তদেব, পৃ- ৫৬

১৯৯। তদেব, পৃ- ৫৬

২০০। তদেব, পৃ- ৫৬

২০১। তদেব, পৃ- ৬৪

২০২। তদেব, পৃ- ৬৫

২০৩। তদেব, পৃ- ৬৫

২০৪। তদেব, পৃ- ৬৫

২০৫। কামিল্যা, ডঃ মিহির চৌধুরী: বিপ্রদাসের মনসাবিজয় পুনর্বিচার, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ৭০০০০৯, পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ২০০৮, পৃ- ৬১

২০৬। তদেব, পৃ- ৬১

২০৭। তদেব, পৃ- ৬১

২০৮। তদেব, পৃ- ৬৪

২০৯। তদেব, পৃ- ৬৫

২১০। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ- ১৮৭

২১১। তদেব, পৃ- ১৮৭

২১২। তদেব, পৃ- ১৮৮

২১৩। তদেব, পৃ- ১৮৯-৯০

২১৪। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ১০৫

২১৫। তদেব, পৃ- ১০৬

২১৬। তদেব, পৃ- ১০৭

২১৭। তদেব, পৃ- ১০৮-০৯

২১৮। তদেব, পৃ- ১০৯

২১৯। তদেব, পৃ- ১১৮

২২০। তদেব, পৃ- ১১৯

২২১। তদেব, পৃ- ১৩০

২২২। তদেব, পৃ- ১৩০

২২৩। তদেব, পৃ- ১৩০

২২৪। তদেব, পৃ- ১৩২

২২৫। তদেব, পৃ- ১৩২

২২৬। তদেব, পৃ- ১৩২

২২৭। তদেব, পৃ- ১৩৪

২২৮। তদেব, পৃ- ১৪২

২২৯। তদেব, পৃ- ১৪২

২৩০। তদেব, পৃ- ১৪২

২৩১। তদেব, পৃ- ১৪৩

২৩২। তদেব, পৃ- ১৪৭

২৩৩। তদেব, পৃ- ১৪৯

২৩৪। তদেব, পৃ- ১৪৯

২৩৫। ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ: বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১১, পৃ-১১৯

২৩৬। তদেব, পৃ-১১৯

২৩৭। তদেব, পৃ-১১৯

২৩৮। তদেব, পৃ-১২০

২৩৯। তদেব, পৃ-১২৩

২৪০। তদেব, পৃ-১২৩

২৪১। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়পর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ-১৫৭

২৪২। তদেব, পৃ-১৫৮

২৪৩। তদেব, পৃ-১৫৮

২৪৪। তদেব, পৃ-১৫৯

২৪৫। তদেব, পৃ-১৬০-১৬১

২৪৬। তদেব, পৃ-১৬১

২৪৭। তদেব, পৃ-১৬২

২৪৮। তদেব, পৃ-১৬৪

২৪৯। তদেব, পৃ-১৮৪

২৫০। তদেব, পৃ-১৮৪

২৫১। কামিল্যা, ডঃ মিহির চৌধুরী: বিপ্রদাসের মনসাবিজয় পুনর্বিচার, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ৭০০০০৯, পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ২০০৮, পৃ- ৬৮

২৫২। তদেব, পৃ- ৬৯

২৫৩। তদেব, পৃ- ৯২

২৫৪। তদেব, পৃ- ৯২

২৫৫। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ১৪৬

২৫৬। তদেব, পৃ- ১৪৬-৪৭

২৫৭। তদেব, পৃ- ১৫১

২৫৮। তদেব, পৃ- ১৫২

২৫৯। তদেব, পৃ- ১৫৩

২৬০। তদেব, পৃ- ১৫৪

২৬১। তদেব, পৃ- ১৫৪

২৬২। তদেব, পৃ- ১৫৪

২৬৩। তদেব, পৃ- ১৫৫

২৬৪। তদেব, পৃ- ১৫৭

২৬৫। তদেব, পৃ- ১৫৭

২৬৬। তদেব, পৃ- ১৫৮

২৬৭। তদেব, পৃ- ১৫৮

২৬৮। তদেব, পৃ- ১৫৯

২৬৯। তদেব, পৃ- ১৬১

২৭০। তদেব, পৃ- ১৬১

২৭১। তদেব, পৃ- ১৬৩

২৭২। তদেব, পৃ- ১৬৩

২৭৩। তদেব, পৃ- ১৭৫

২৭৪। তদেব, পৃ- ১৭৮

২৭৫। তদেব, পৃ- ১৮০

২৭৬। তদেব, পৃ- ১৮১

২৭৭। তদেব, পৃ- ১৮২

২৭৮। তদেব, পৃ- ১৮৩

২৭৯। তদেব, পৃ- ১৮৩

২৮০। তদেব, পৃ- ১৮৩

২৮১। তদেব, পৃ- ১৮৩

২৮২। তদেব, পৃ- ১৮৪

২৮৩। তদেব, পৃ- ১৮৫

২৮৪। তদেব, পৃ- ১৮৫

২৮৫। তদেব, পৃ- ১৮৫

২৮৬। তদেব, পৃ- ১৮৬

২৮৭। তদেব, পৃ- ১৮৬

২৮৮। তদেব, পৃ- ১৮৭

২৮৯। তদেব, পৃ- ১৮৭

২৯০। তদেব, পৃ- ১৮৭

২৯১। তদেব, পৃ- ১৮৭

২৯২। তদেব, পৃ- ১৮৭

২৯৩। তদেব, পৃ- ১৮৮

২৯৪। তদেব, পৃ- ১৮৮

২৯৫। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ-২০৬

২৯৬। তদেব, পৃ-২০৭

২৯৭। তদেব, পৃ-২০৮

২৯৮। তদেব, পৃ-২১৩-১৪

২৯৯। তদেব, পৃ-২১৯

৩০০। তদেব, পৃ-২১৯

৩০১। তদেব, পৃ-২২০

৩০২। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ-২৩০

৩০৩। ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, শ্রী ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস ও শ্রী গিরীশচন্দ্র দাস সম্পাদিত, শ্রীহট্ট, ১৩৪৩, পৃ-৮১

৩০৪। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ১৯২-৯৩

৩০৫। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ- ২৪৯

৩০৬। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ২০৪-০৫

৩০৭। ভট্টাচার্য্য সুরেন্দ্রচন্দ্র ও দাস আশুতোষ: জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সং-১৯৮৪, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-১৪১

৩০৮। ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, শ্রী ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস ও শ্রী গিরীশচন্দ্র দাস সম্পাদিত, শ্রীহট্ট, ১৩৪৩, পৃ-৯৪

৩০৯। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়পণর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ-২৭৯

৩১০। তদেব, পৃ-২৭৯

৩১১। তদেব, পৃ-২৮১

৩১২। তদেব, পৃ-২৮৮

৩১৩। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ২৪১

৩১৪। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৩২

৩১৫। দাস, আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল, কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-১৪৬

৩১৬। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ২৪১

৩১৭। তদেব, পৃ- ২৪২

৩১৮। তদেব, পৃ- ২৪২

৩১৯। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৩২

৩২০। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়পর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ-২৮৯

৩২১। তদেব, পৃ-২৯০

৩২২। তদেব, পৃ-২৯০

৩২৩। তদেব, পৃ-২৯০

৩২৪। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৩২

৩২৫। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ২৪৩

৩২৬। তদেব, পৃ- ২৪৩

৩২৭। তদেব, পৃ- ২৪৩

৩২৮। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৩২

৩২৯। তদেব, পৃ- ২৩৩

৩৩০। পিপিলাই, বিপ্রদাস: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪০৯ পৃ- ১৫১-৫২

৩৩১। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৩৩

৩৩২। তদেব, পৃ- ২৩৫

৩৩৩। তদেব, পৃ- ২৩৫

৩৩৪। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪,লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৩৬

৩৩৫। তদেব, পৃ- ২৩৬

৩৩৬। তদেব, পৃ- ২৩৬

৩৩৭। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়পর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ-২৯২

৩৩৮। তদেব, পৃ-২৯৫

৩৩৯। তদেব, পৃ-২৯৫

৩৪০। ঘোষাল, জগজ্জীবন: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা) রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ- ১৪৭

৩৪১। তদেব, পৃ- ১৪৭

৩৪২। তদেব, পৃ- ১৪৭

৩৪৩। তদেব, পৃ-১৪৮

৩৪৪। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়পর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ-৩০৫

৩৪৫। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ২৫৪

৩৪৬। তদেব, পৃ- ২৬৫

৩৪৭। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৩৯-৪০

৩৪৮। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ২৬১

৩৪৯। তদেব, পৃ- ২৬১-৬২

৩৫০। তদেব, পৃ- ২৬৪-৬৫

৩৫১। পিপিলাই, বিপ্রদাস: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৯ পৃ- ১৫৬-৫৭

৩৫২। দাস, আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল,কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-১৫৯

৩৫৩। তদেব, পৃ-১৬১

৩৫৪। তদেব, পৃ-১৬১-৬২-৬৩

৩৫৫। তদেব, পৃ-১৬৩

৩৫৬। তদেব, পৃ-১৬৬-৬৭

৩৫৭। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ২৮৪

৩৫৮। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ- ৩২২

৩৫৯। তদেব, পৃ- ৩২৩

৩৬০। দাস, আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল,কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-১৬৯-৭০

৩৬১। তদেব, পৃ-১৭০

৩৬২। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ২৮৬-৮৭

৩৬৩। পিপিলাই, বিপ্রদাস: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৯ পৃ- ১৬০

৩৬৪। দাস, আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল,কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-১৭২

৩৬৫। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৪৪-৪৫

৩৬৬। তদেব, পৃ- ২৪৬

৩৬৭। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৭৫-৭৬

৩৬৮। তদেব, পৃ- ৮৭-৮৮

৩৬৯। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৫৭

৩৭০। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়পর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ-৪২২

৩৭১। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৮৮

৩৭২। পিপিলাই, বিপ্রদাস: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৯ পৃ- ১৮৭

৩৭৩। দাস, আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল,কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-২২৭

৩৭৪। তদেব, পৃ-২৫৩

৩৭৫। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ- ৪৪৬

৩৭৬। তদেব, পৃ- ৪৪৮

৩৭৭। তদেব, পৃ- ৪৪৮

৩৭৮। তদেব, পৃ- ৪৪৬

৩৭৯। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৭৪-৭৫

৩৮০। তদেব, পৃ- ২৭৫

৩৮১। তদেব, পৃ- ২৭৫-৭৬

৩৮২। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ১৬১-৬২

৩৮৩। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ- ৪৮৯

৩৮৪। পিপিলাই, বিপ্রদাস: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪০৯ পৃ- ২০৩

৩৮৫। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ১৬৪

৩৮৬। তদেব, পৃ- ১৬৪

৩৮৭। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৭৬

৩৮৮। দাস, আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল, কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-৩০৮

৩৮৯। তদেব, পৃ-৩০৯

৩৯০। তদেব, পৃ-৩০৯

৩৯১। তদেব, পৃ- ৩১০

৩৯২। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ-৩১৫

৩৯৩। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৭৮-৭৯

৩৯৪। তদেব, পৃ- ২৮০

৩৯৫। দাস, আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল,কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-৩২২

৩৯৬। তদেব, পৃ-৩২৫

৩৯৭। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৮৯

৩৯৮। তদেব, পৃ- ২৮৯

৩৯৯। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৩৩৩

৪০০। তদেব, পৃ- ৩৩২

৪০১। পিপিলাই, বিপ্রদাস: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪০৯ পৃ- ২১৪

৪০২। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৯১

৪০৩। তদেব, পৃ- ২৯২

৪০৪। গুপ্ত, বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়পর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ-১৪৫-৪৬

৪০৫। তদেব, পৃ-১৪৬

৪০৬। তদেব, পৃ-১৪৭

৪০৭। তদেব, পৃ-১৪৮

৪০৮। তদেব, পৃ-১৪৮-৪৯

৪০৯। তদেব, পৃ-১৪৯

৪১০। তদেব, পৃ-১৫০

৪১১। তদেব, পৃ-১৪৯

৪১২। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ১৪৮

৪১৩। তদেব, পৃ- ১৪৯

৪১৪। কামিল্যা, ডঃ মিহির চৌধুরী: বিপ্রদাসের মনসাবিজয় পুনর্বিচার, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ৯, পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ২০০৮, পৃ- ৬৫

৪১৫। তদেব, পৃ- ৬৬

৪১৬। তদেব, পৃ- ৬৬

৪১৭। তদেব, পৃ- ৬৬

৪১৮। তদেব, পৃ- ১৪৯

৪১৯। তদেব, পৃ- ১৪৯

৪২০। তদেব, পৃ- ১৬৪-৬৫

৪২১। তদেব, পৃ- ১৮৭

৪২২। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়পর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ-১৮৫

৪২৩। তদেব, পৃ-১৮৫-৮৬

৪২৪। কামিল্যা, ডঃ মিহির চৌধুরী: বিপ্রদাসের মনসাবিজয় পুনর্বিচার, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ৯, পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ২০০৮, পৃ- ৯৩

৪২৫। তদেব, পৃ- ৯৩

৪২৬। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: মনসামঙ্গল, (সম্পাদিত), কবি জগজ্জীবন-বিরচিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪, পৃ-১১৭

৪২৭। কামিল্যা, ডঃ মিহির চৌধুরী: বিপ্রদাসের মনসাবিজয় পুনর্বিচার, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ৯, পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ২০০৮, পৃ- ৯৩

৪২৮। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ১৭৯

৪২৯। তদেব, পৃ- ১৮২-৮৩

৪৩০। তদেব, পৃ- ১৮২

৪৩১। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: মনসামঙ্গল, (সম্পাদিত), কবি জগজ্জীবন-বিরচিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪, পৃ- ১৮৩

৪৩২। তদেব, পৃ-১২০

৪৩৩। তদেব, পৃ-১২২

৪৩৪। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়পর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ-২৪০

৪৩৫। পিপিলাই, বিপ্রদাস: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৯ পৃ- ১৩২

৪৩৬। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ২৬৯

৪৩৭। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: মনসামঙ্গল, (সম্পাদিত), কবি জগজ্জীবন-বিরচিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪, পৃ-১৬৭

৪৩৮। তদেব, পৃ-১৬৭

৪৩৯। তদেব, পৃ-১৬৮

৪৪০। তদেব, পৃ-১৬৮

৪৪১। তদেব,, পৃ-১৬১

৪৪২। তদেব, পৃ-১৬১

৪৪৩। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৩০৯-১০

৪৪৪। তদেব, পৃ- ৯৬-৯৭

৪৪৫। বিপ্রদাসের মনসাবিজয় পুনর্বিচার, ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা ৯, পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ২০০৮, পৃ- ১৪০

৪৪৬। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৫৯

৪৪৭। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৯৮

৪৪৮। তদেব, পৃ- ৯৭

৪৪৯। তদেব, পৃ- ২৫৯

৪৫০। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ-৪৩৩

৪৫১। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ১০০

৪৫২। তদেব, পৃ- ৯৯-১০০

৪৫৩। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৬০-৬১

৪৫৪। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৩২৬

৪৫৫। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৬১

৪৫৬। তদেব, পৃ- ২৬১

৪৫৭। তদেব, পৃ- ২৮৯

৪৫৮। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৩৪৩

৪৫৯। তদেব, পৃ- ৩৪২-৪৩

৪৬০। ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ: বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ২৬৮

৪৬১। হালদার, গোপাল: বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৬, তৃতীয় মুদ্রণ ১৪০৭, পৃ- ৬১

৪৬২। সেন, শ্রীদীনেশ চন্দ্র: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১, কলকাতা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট্, কলকাতা, পৃ-৩৯৬

৪৬৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: সবলা, মহুয়া, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃ-৬৩১

৪৬৪। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৯৫

৪৬৫। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪ লেখাপড়া, কলকাতা- ৭৩ পৃ- ২৪২

৪৬৬। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ- ৩২৩-২৪

৪৬৭। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ২৮৪

৪৬৮। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ- ৩২২

৪৬৯। তদেব, পৃ- ৩২৩

৪৭০। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল (সম্পাদিত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪ পৃ-১৬৯-৭০

৪৭১। তদেব, পৃ-১৭০

৪৭২। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ২৮৬-৮৭

৪৭৩। পিপিলাই, বিপ্রদাস: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৯ পৃ- ১৬০

৪৭৪। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল (সম্পাদিত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-১৭২

৪৭৫। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪,লেখাপড়া, কলকাতা- ৭৩ পৃ- ২৪৪-৪৫

৪৭৬। তদেব, পৃ- ২৪৫

৪৭৭। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ- ৩২৬-২৭

৪৭৮। তদেব, পৃ-৩২৮

৪৭৯। তদেব, পৃ-৩২৯

৪৮০। তদেব, পৃ-৩২৯

৪৮১। তদেব, পৃ-৩২৯-৩০

৪৮২। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ২৯২-৯৩

৪৮৩। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭৩ পৃ- ২৪৫

৪৮৪। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৪২

৪৮৫। তদেব, পৃ- ৪২

৪৮৬। তদেব, পৃ- ৬২-৬৩

৪৮৭। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়পর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ- ৪১৬-১৭

৪৮৮। তদেব, পৃ- ৪১৭

৪৮৯। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭৩ পৃ- ২৫৫-৫৬

৪৯০। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৭৫-৭৬

৪৯১। তদেব, পৃ- ৮৮

৪৯২। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা- ৭৩ পৃ- ২৫৭

৪৯৩। তদেব, পৃ- ২৫৭-৫৮

৪৯৪। তদেব, পৃ- ২৫৯

৪৯৫। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৯৭

৪৯৬। তদেব, পৃ-৪৩৩

৪৯৭। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৯৭

৪৯৮। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়পর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ- ৪৩৩-৩৪

৪৯৯। ঘোষাল, জগজ্জীবন: মনসামঙ্গল- অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা) রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ- ১৩৮

৫০০। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৯৫

৫০১। পিপিলাই, বিপ্রদাস: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪০৯ পৃ- ১৩৭

৫০২। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা- ৭৩ পৃ- ২৬০

৫০৩। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়পর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ-৪৩৭-৩৮

৫০৪। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ১০৭

৫০৫। ষষ্ঠীবর, পদ্মাপুরাণ, শ্রী ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস ও শ্রী গিরীশচন্দ্র দাস সম্পাদিত, শ্রীহট্ট, ১৩৪৩, পৃ- ১৩৫

৫০৬। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা- ৭৩ পৃ- ২৬২

৫০৭। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ১০৭

৫০৮। তদেব, পৃ- ১০৮

৫০৯। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়পর্মুদ্রণ, ২০০৯, পৃ-৪৪২-৪৩-৪৪

৫১০। আচার্য, ড. হরেকৃষ্ণ: জানকীনাথ বিরচিত পদ্মাপুরাণ, (পাঠ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন) অক্ষর পাবলিকেশনস্‌, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, কলকাতা-১২, পৃ-৪৩৯

৫১১। তদেব, কলকাতা-১২, পৃ-১২২

৫১২। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ১১১

৫১৩। তদেব, পৃ- ১১১

৫১৪। আচার্য, ড. হরেকৃষ্ণ: জানকীনাথ বিরচিত পদ্মাপুরাণ, (পাঠ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন) অক্ষর পাবলিকেশনস্, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, কলকাতা-১২, পৃ-৪২২

৫১৫। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ১০৫-০৬

৫১৬। তদেব, পৃ- ১০৭

৫১৭। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল (সম্পাদিত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪ পৃ-২৫৮-৫৯

৫১৮। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা- ৭৩ পৃ- ২৬৪

৫১৯। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ১০৭

৫২০। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল (সম্পাদিত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-২৬৪

৫২১। তদেব, পৃ-২৬৫

৫২২। ঘোষাল, জগজ্জীবন: মনসামঙ্গল- অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা) রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ- ১৫১

৫২৩। তদেব, পৃ-২৬৭

৫২৪। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা- ৭৩ পৃ- ২৬৬-৬৭

৫২৫। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল (সম্পাদিত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-২৭১

৫২৬। তদেব, পৃ-২৭২

৫২৭। তদেব, পৃ-২৭২-৭৩

৫২৮। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ১২২

৫২৯। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭৩ পৃ- ২৬৮

৫৩০। তদেব, পৃ- ২৬৮

৫৩১। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা- ৭৩ পৃ- ২৬৮

৫৩২। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল (সম্পাদিত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-২৭৭

৫৩৩। তদেব, পৃ-২৮১

৫৩৪। তদেব, পৃ-২৮২

৫৩৫। তদেব, পৃ- ২৮৪

৫৩৬। তদেব, পৃ- ২৮৪

৫৩৭। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা- ৭৩ পৃ- ২৬৮

৫৩৮। তদেব, পৃ- ২৭১-৭২

৫৩৯। তদেব, পৃ- ২৭২-৭৩

৫৪০। তদেব, পৃ- ২৭৩

৫৪১। তদেব, পৃ- ২৭৪

৫৪২। তদেব, পৃ- ২৭৪

৫৪৩। তদেব, পৃ- ২৭৪

৫৪৪। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ১৪০-৪১

৫৪৫। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল (সম্পাদিত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-২৯৪

৫৪৬। তদেব, পৃ-২৯৭-৯৮

৫৪৭। পিপিলাই, বিপ্রদাস: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৯ পৃ- ২০১-০২

৫৪৮। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল (সম্পাদিত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-২৯৮

৫৪৯। তদেব, পৃ-২৯৮

৫৫০। তদেব, পৃ-৩০২-০৩

৫৫১। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭৩ পৃ- ২৭৫

৫৫২। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ১৬১-৬২

৫৫৩। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল (সম্পাদিত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-৪৮৮

৫৫৪। পিপিলাই, বিপ্রদাস: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), রত্নাবলী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৯ পৃ- ২০৩

৫৫৫। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ১৬৪

৫৫৬। তদেব, পৃ- ১৬৪

৫৫৭। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭৩ পৃ- ২৭৬

৫৫৮। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল (সম্পাদিত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-২৫৩

৫৫৯। তদেব, পৃ-৩০৯

৫৬০। দাস, ডঃ আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র: কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল (সম্পাদিত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৪, পৃ-৩১১-১২

৫৬১। তদেব, পৃ-৩১৪

৫৬২। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৮০

৫৬৩। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ-৩২২

৫৬৪। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৭৯

৫৬৫। তদেব, পৃ- ২৮০

৫৬৬। গুপ্ত, কবি বিজয়: পদ্মাপুরাণ, শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৯, পৃ- ৫১৯

৫৬৭। তদেব, পৃ- ৫২০

৫৬৮। তদেব, পৃ- ৫২৪

৫৬৯। তদেব, পৃ- ৫৪১-৪২

৫৭০। তদেব, পৃ- ৫৪২

৫৭১। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১,, পৃ- ৩৪৯

৫৭২। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, লেখাপড়া, কলকাতা-৭০০০৭৩ পৃ- ২৮৮

৫৭৩। তদেব, পৃ- ২৮৯

৫৭৪। তদেব, পৃ- ২৯৬

৫৭৫। সেনগুপ্তা, জয়া: মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী, ক্যাম্প, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ-২০০১, পৃ- ২৭৪

৫৭৬। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৩৪০-৪১-৪২

৫৭৭। তদেব, পৃ- ৩৫১

৫৭৮। তদেব, পৃ- ৩৫০

৫৭৯। ঘোষাল, জগজ্জীবন: মনসামঙ্গল- অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা) রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ- ১৪৫

৫৮০। পিপিলাই, বিপ্রদাস: মনসামঙ্গল, অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৪০৯ পৃ- ৮৯

৫৮১। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস: মনসামঙ্গল জীবন বীক্ষার আলোকে, মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ-৯২

৫৮২। দাস, উড়িষ্যার সাধক কবি দ্বারিকা: মনসামঙ্গল, শ্রীবিষ্ণুউপদ পান্ডা (সম্পা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯, পৃ-৩০

৫৮৩। চক্রবর্তী, উমা: অনুবাদ: অম্লান ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ব্রাত্যজনের চোখে, সেতু,কলকাতা-৬, পৃঃ- ১৫৬

৫৮৪। তদেব, পৃঃ- ১৫৬

৫৮৫। বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র: বিদ্যাসাগর রচনাবলী, দেবকুমার বসু সম্পাদিত, তৃতীয় খন্ড, পৃ- ১৮৯-৯০

৫৮৬। পন্ডিত, কৃত্তিবাস: সপ্তকান্ড রামায়ণ, শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত ভূমিকা সম্বলিত শ্রী অনিলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, উত্তরাকাণ্ড, পৃ-৬২৯-৩০

৫৮৭। দেব, সুকবি নারায়ণ: পদ্মাপুরাণ, শ্রীতমোনাশ দাশ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০১১, পৃ- ৩৪৯

৫৮৮। দাশ, জীবনানন্দ: কাব্যগ্রন্থ; বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি.; কলকাতা; প্রথম খন্ড, তৃতীয় মুদ্রণ- ১৩৭৯,, পৃ- ২১৭